বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ

মৈত্রেয়ী দেবী

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
73457
8/8/81

ওরিয়েণ্ট লংম্যান

VIŚVASABHAY RABINDRANATH
by
MAITRAYE DEVI

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫১
প্রথম ওরিয়েণ্ট লংম্যান সংস্করণ : ১৯৫২
© ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড ১৯৫২

ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস :
৫০, সুন্দরনগর, নয়াদিল্লী ৩

আঞ্চলিক অফিস :
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই ১
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩
৩৬এ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ২
৩/৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১

প্রকাশক : শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ,
ওরিয়েণ্ট লংম্যান লিমিটেড,
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

মুদ্রক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস,
জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট
লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩]

পনের টাকা

উৎসর্গ

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে—

এই গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। গত চল্লিশ বৎসরের 'মডার্ন রিভিউ' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তোমার গভীর শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম ভালবাসার কোনো তুলনা পাই নাই।

তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার বাল্যকালে ও তোমার জীবনসায়াহ্নে দুই অসমবয়সীর মধ্যে আশ্চর্য সখ্য হইয়াছিল। স্কুলের শেষে, বাড়ির পথে আগেই তোমার কাছে ছুটিতাম। তুমিও প্রাতর্ভ্রমণের শেষে লাঠি হাতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতে। কত অপটু রচনা, স্খলিতছন্দ কবিতা তুমি স্নেহভরে নিজহাতে লইয়া যাইতে—তখন তার তাৎপর্য বুঝিতাম না, বুঝিতাম না বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ পত্রিকার প্রাজ্ঞ সম্পাদক বালিকার রচনা স্বয়ং পকেটে করিয়া লইয়া যাইতেছেন—সে কত বড় সৌভাগ্য। ছাপিতে একমাস দেরি হইলে অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিতাম—যেন প্রবাসীর জন্মকালে তাহার সহিত আমার রচনা ছাপিবার চিরশর্ত হইয়াছিল।

সমগ্র জীবনস্মৃতি, কবির জীবনের ছোটবড কত ঘটনা তুমি আমাকে বলিতে। শোনা গল্প বার বার করিয়া শুনিতাম—যখন তাঁকে কিছুই জানি নাই, তখন তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদ্ভাসের ভিতর দিয়া সেই আশ্চর্য সূর্যালোক আমার ক্ষুদ্র জীবনের যাত্রাপথ আলোকিত করিয়াছিল।

আজ বুঝিতে পারি তোমাব সেই গল্প বলার মধ্য দিয়া মানবসম্বন্ধের একটি মহত্তর দিক আমার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বার্থশূন্য নিষ্কাম আত্মার সম্পর্ক যে সম্ভব প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে তোমার মধ্যে তা দেখিবার সৌভাগ্য আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

১৯৪১ সালের শ্রাবণের শেষদিনে আমাদের বাড়িতে উপাসনান্তে তুমি গেটের কাছে দাঁড়াইলে। গাছের ছায়ার নিচে অন্ধকার সন্ধ্যায় তোমার সেই অপসৃয়মাণ শোকাহত মূর্তি আজও মনে ভাসিতেছে। এক পদ অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার মাথায় তোমার স্নেহহস্ত রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে

বলিয়াছিলে,—মৈত্রেয়ী, তোমাদের বয়স অল্প, তোমরা ভুলিয়া যাইবে। যৌবনের শক্তির কাছে শোক পরাভূত হইবেই—কিন্তু আমি তো তাঁর আগে যাইতে পারিতাম।—

আজ আমি তোমাকে তোমারই জানিত কথিত প্রিয় কাহিনী শুনাইতে আসিয়াছি—

হে পিতৃলোকবাসী পিতামহ, তোমরা কি কোথাও আছ? আমাদের ভক্তি ভালবাসা তোমাদের স্পর্শ করে কি? তবে, বাল্যকালের মত স্নেহভরে গ্রহণ করিও।

প্রণতা
মৈত্রেয়ী

ভূমিকা (প্রথম সংস্করণ)

‘পথে ও পথের প্রান্তে’ নামে পত্রধারার ভূমিকায় কবি লিখেছেন : “কিন্তু য়ুরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।”

এই কথাটি বরাবর আমাদের মনকে জিজ্ঞাসু করত। তার কারণ আমাদের কাছে দেশে বিদেশে এই পরমপ্রিয় মহামানবের অভ্যর্থনার সমারোহ-সংবাদ দূর জগতের বিস্মৃত স্বপ্নের মত কিছু কিছু কানে ভেসে এসেছে। ভাল করে জানবার সুযোগ হয়নি। এখানে দু-চারজন সৌভাগ্যবান যাঁদের তাঁর সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁরা ছাড়া প্রায় সব বাঙালী পাঠককেই “আমাদের” শব্দের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি।

এর জন্য দায়ী দুই পক্ষ। এক, আমরা নিজেরা যারা যথাসময়ে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হতে পারিনি, আর রবীন্দ্রনাথ নিজে। তিনি নিঃসক্ত মন নিয়ে চলেছেন বিশ্বের পথে, আর মানুষের মনে মনে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন ভাবনার দীপ্তি—যেমন করে উদাসীন সূর্য চলে কালের কক্ষপথে আর তরুর প্রাণমূলে রেখে যায় অগ্নির সম্পদ—‘স্বাক্ষর দিয়ে দাবি’ করে না। এই ইতিহাস নিপুণভাবে রক্ষা করবার জন্য যে অধ্যবসায় প্রয়োজন ছিল সে দাবি তিনি কারও উপর করেননি বলেই আজ ঘূর্ণমান কালচক্রে তা খুচরো কাগজের হলদে পাতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে স্মৃতি থেকে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ এ ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজন ছিল। শেষের দিকে সে কথা তাঁর মনে জাগত। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা এত দীর্ঘকাল পরে লেখা অনুচিত মনে করি, তাই শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত দু-তিনখানি চিঠি থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম।

“সেই এক সময় গিয়েছে যখন য়ুরোপের উত্তর প্রান্ত থেকে পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত জনমনে আমাকে উপলক্ষ্য করে যে একটি বিস্ময় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা অভাবনীয়। বোধ হয় ঐ মহাদেশে সে যুগে কোনো কৃতী পুরুষ এমন প্রভূত সমাদরের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করতে পারেননি। তখনকার মহাযুদ্ধের পরবর্তী য়ুরোপে মনোবৃত্তির মধ্যে যে একটি সর্বজনীন আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, প্রাচ্য দেশের এই কবির অভ্যর্থনার ভূমিকা ছিল তাই, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ যাই হোক, ঘটনাটা ছিল অচিন্তনীয়; সুতরাং নিজের মুখে তার আভাসমাত্র দেওয়া অত্যন্ত সংকোচজনক। এই আশ্চর্য ইতিহাসটিকে লিপিবদ্ধ করবার জন্য বাইরের সাক্ষ্যর

প্রয়োজন আছে।...আর আমার অন্য স্বদেশবাসী যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও উন্মুক্ত হৃদয়ের যে অভ্যর্থনা য়ুরোপের সর্বত্র লাভ করেছিলেন তাও আর কোনো ভারতবাসী এত অন্তরঙ্গভাবে করতে পারেননি। উপযুক্ত সাক্ষ্য সমর্থনের অভাবের মধ্যে চুপ করে থাকাই শোভন মনে করেছি...

অতএব একদিন কোন মহালগ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই যে মিলন ঘটেছিল তার ইতিহাস বা বিবরণ অকথিত থেকে গেল।......

আপনাদের—
রবীন্দ্রনাথ"
—২৩শে চৈত্র ১৩৪৭।
(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮)

এই সূত্রে কয়েকটি চিঠিপত্র লেখা হয়। আমি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

..."এই ভ্রমণ ব্যাপারে আমার সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাক্ষ্য দিতে পারতেন এবং দিলে সেটা শোভনও হত। আজ পর্যন্ত দেননি। কিন্তু আমি অনুশোচনা করতে লজ্জাবোধ করি।...অদৃষ্টের একমাত্র মূল্যবান দান ভালবাসা।...এই যথার্থ ভালবাসা আমি সমস্ত ইয়োরোপ থেকে ও আমার ভ্রমণসঙ্গীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত লাভ করেছি। এই কৃতজ্ঞতা স্থায়িভাবে আমার মনে রয়ে গেল।...

নিজের অঙ্গুলি চালনা করতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, এইজন্য আজ দৈবক্রমে কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীকে নিকটে পেয়ে তার হাত দিয়ে আমার যা জানাবার কথা আপনাকে জানালুম...

শান্তিনিকেতন। ১০ই এপ্রিল ১৯৪১
আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

দুই মাস পরে এই প্রসঙ্গে লেখা আর-একখানি চিঠি প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

"আমার পাশ্চাত্ত্য মহাদেশ ভ্রমণকালে যাঁরা আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী ছিলেন তাঁরা অনবধান বা ঔদাসীন্যবশত সাধারণের অবগতির জন্য আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রক্ষা করেননি এমন একটি অন্যায় অপবাদ প্রবাসীতে আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে—এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। আমি আবিষ্কার করলাম তাঁরা সমস্ত বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে কোনো কারণে হোক এতদিন পর্যন্ত সেই বিস্তারিত রিপোর্ট অগোচরে রয়ে গেছে।. আজ তার

আবিষ্কার হওয়াতে আমি আমার ভ্রমণ-সহচরদের নিকট আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখন তাঁদের এই সংগৃহীত বিবরণের যথোচিত ব্যবহার হতে কোনো বাধা ঘটবে না। ইতি—

২৪/৬/৪১ আপনাদের
উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ—"

(প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৪৮)

২৪/৬/৪১ তারিখ থেকে অনুমান হবে এই "পাবলিক অ্যাপলজি" মৃত্যুশয্যা থেকে লিখিত। কাজেই কাগজপত্র দেখে তিনি নিজে কিছু আবিষ্কার করেননি। অন্য কেউ তাঁকে এ-কথা বলে থাকবেন। হয়ত বা কাগজপত্র দেখিয়ে প্রমাণও করে থাকবেন। তাছাড়া স্বজনের মুখের কথাই তাঁর কাছে প্রমাণ। আজ তারপর বিশ বৎসর কেটে গেল, আমাদের যতদূর বিশ্বাস 'সাধারণের অবগতির' জন্য আজও সেগুলির 'যথোচিত ব্যবহার' হয় নি। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্প পরেই বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত তিন-চারখানি বুলেটিন ছিল, তাও অদ্যাবধি out of print হয়ে দুষ্প্রাপ্য হয়ে আছে। সেই বুলেটিনগুলির মধ্যে কিছু কিছু তথ্য খাটো পোশাকে আঁট হয়ে আছে, তারা কিছু খবর দিচ্ছে বটে কিন্তু সেই দিগ্বিজয়ী শোভাযাত্রার প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ দিচ্ছে না। এই বুলেটিনগুলিই হয়ত তাঁকে আবিষ্কার করতে দেওয়া হয়ে থাকবে।

বহুদিন থেকে এই কথা আমার মনে বিদ্ধ হয়েছিল, বিশেষত অনুচিত-ভাবে প্রিয়জনের মনে কষ্ট দিয়ে ফেলেছেন মনে করে রোগশয্যায় শায়িত সেই মহারথীর মনঃপীড়া আমি দেখেছিলাম। কিন্তু আমার মত অর্বাচীনের দ্বারা এ কাজ কী করেই বা হতে পারে মনে করে সে দুঃসাহসকে আমলই দিইনি।

তারপর অল্প কিছুদিন আগে বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য তখন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের অভিপ্রায় জানালে তিনি বিজ্ঞানীর উপযুক্ত উদার সহৃদয়তায় রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত কাগজপত্র দেখতে সম্মতি দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। পুরানো কাগজপত্র মন্থন করে অনেক আশ্চর্য সুন্দর জ্ঞাতব্য তথ্য পেলাম, অনেক শোনা বিষয় ছবি হয়ে মনের সামনে এল—ভরসা হল আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার। একান্ত আগ্রহে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ শুরু করলাম। সে সময়ে একসঙ্গে মাস দেড়েকের বেশী কাজ করবার সুবিধা হল না—প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে কাজ করেও ঐ সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত বিবরণ সংগৃহীত হয়ে উঠল না।

কারণ বিঘ্ন অনেক। খবরের কাগজে যা থাকে তার অনেকটাই গ্রহণীয় নয়। কবির বক্তব্য ও বাণী সাংবাদিকের স্থূলহস্ত-অবলেপনে ক্রমাগতই ম্লান হয়ে যায়। কবি নিজেই লিখছেন, "আজ পর্যন্ত আমার বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিকমত হলই না—নিজের গান আমাকে শুনতে হবে দলিত অবস্থায়। নিজের কথা আমায় পড়তে হবে বিকৃত ভাষায়। এ আমার ললাটের লিখন। আমি জানি এ সম্বন্ধে আমার নিজের বিশেষ ভাষা ও ভঙ্গীই আমার প্রধান শত্রু।" এ ছাড়া ঘটনার বিবৃতিতেও ভুল থাকে। তাই যে-সব কাহিনী, কথাবার্তা, ঘটনা-সংস্থানের আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য সঠিকভাবে মিলিয়ে নিতে পারা যায় সেগুলিই মাত্র সত্যানুসন্ধানীর ধর্তব্য। বহুবিধ জঞ্জাল সরিয়ে, বুদ্ধি জাগ্রত রেখে, তারই সন্ধান করতে হয়। দেড় মাসের মধ্যে তাই খুব বেশী লিপি জোগাড় করে উঠতে পারিনি। তারপর শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বভারতী পরিত্যাগের পর বিশ্বভারতীর কাছ থেকে আর কোনো সাহায্য পাইনি।

এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিনা সাহায্যে কেন এই কাজে স্বেচ্ছায় নিযুক্ত হয়ে অবিরত বাধার নিষ্ঠুর আঘাতে ক্লিষ্ট হয়েছি তার কোনো সদুত্তর যদি এই গ্রন্থের মধ্যে পাঠকরা পান তবে আমরা ধন্য হব। আজকের দিনে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়া এজাতীয় কাজ করে তোলা যায় না। আমাদের মত সামান্য শক্তিসহায়সম্বলহীন মানুষের পক্ষে তাই বর্তমান গ্রন্থখানি সুসম্বদ্ধ করা কত কঠিন তা অনুমান করে পাঠকেরা ত্রুটিগুলি ক্ষমা করে নেবেন; কারণ জানি এ গ্রন্থে অনেক ভুল থাকবেই। আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাহিরের ঘটনা, কেবলমাত্র ইতস্তত বিভিন্ন লোকের ইচ্ছামত রক্ষিত খবরাখবর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ঐ ঘটনার কালাভিজ্ঞ ধীমান কোনো ব্যক্তি আমাকে পথ প্রদর্শন করেননি। কাজেই ছোটবড় ত্রুটিবিচ্যুতিতে হয়ত এ গ্রন্থ পূর্ণ হয়ে আছে। আমাদের পরিচয়ের পরিধির বাইরে নিশ্চয় এমন অনেক সহৃদয় রবীন্দ্রানুরাগী আছেন যাঁরা বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতার সম্পদে, আমার ভুলত্রুটির বিচার করে, জানাতে পারবেন ও নূতন তথ্য দিতে পারবেন। তাঁদের কাছে আমার সকৃতজ্ঞ প্রার্থনা জানানো রইল।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই মিলনের একটা ছবি মনের কাছে স্পষ্ট করা আজ বড় প্রয়োজন। দুই মহাযুদ্ধ পার করে এসে কবির এই মিলনপ্রচেষ্টা দেশে বিদেশে কি কোনো মূল বিস্তার করেনি? এমনকি আজকের রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বদৃশ্যে সভ্যতার মিলনের যে উদ্দেশ্য ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে তার মধ্যে কি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের পরাধীন ভারতের অখ্যাত এক ভাষার কবির ধর্মবিজয়ের কেতন ওড়েনি?

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার পূর্বে, অর্থাৎ ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের কিছু কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা উদ্ধার করা সহজ নয়—সেজন্য আমরা তাতে পাইনি বিভিন্ন দেশের মনীষীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার নির্ভরযোগ্য বৃত্তান্ত। আজও অকথিত রয়ে গেল রবীন্দ্রপ্রতিভার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য প্রতিভার রাসায়নিক মিলনের কাহিনী।

১৯৬১ সালে য়ুরোপ ভ্রমণকালে সেখানকার কয়েকটি দেশে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন তাঁদেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা যেমন শুনেছিলাম এখানে নূতন একটি অধ্যায়ে তেমনি নিবদ্ধ করা গেল।

মৈত্রেয়ী দেবী

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ... ১
গীতাঞ্জলি ... ৬
নোবেল প্রাইজের পূর্বে ... ১৩
কাব্য ও কবি ... ১৭
ন্যাশনালিজম ... ৩৬
আমেরিকায় ... ৫১
ইংল্যান্ডে ... ৮৬
সংগীত ... ৯৮
চিত্রা ও রঙ্গমঞ্চ ... ১১৩
উপাধি-প্রসঙ্গ ... ১১৯
জার্মানি ... ১২৬
ফ্রান্স ... ১৫৩
ইটালি ... ১৬২
ক্যানাডা ... ১৭৪
বিদেশে চিত্রপ্রদর্শনী ... ১৯৩
পূর্ব ইয়োরোপে ... ২২৫
সমাপ্তি ... ২৪৩

প্রস্তাবনা

কবি বলেছেন, মহাশিল্পী তাঁর আপন সৃষ্টির পরে উদাসীন, নির্মম—নিজের রচনা মুছে ফেলতে তাঁর দ্বিধা নেই, নিজের তবিল তিনি নিজেই ভাঙেন। কিন্তু এর মধ্যে বড় বেদনা আছে। অনেক সময় তাই মনে করেছি এমন যে একটি আশ্চর্য জীবন আমরা দেখেছিলাম—রূপে, রসে, জ্ঞানে, আনন্দে, উজ্জ্বল শোভায় সমস্ত জগৎকে আনন্দিত চমৎকৃত করে বর্তমান ছিল, কোনো রকমেই কি তার একটি প্রতিচ্ছবি ধরে রাখা যায় না? অনেকেই অনেক রকমে চেষ্টা করেছেন এবং তার অতি সামান্য একটি খণ্ডিত চিহ্ন আঁকতে পেরেছেন কিন্তু সে অনির্বচনীয়তা ধরা পড়েনি। জীবনের ফোটোগ্রাফ হয় না, কাব্য বা শিল্প কিছুই জীবনের true copy নয়। সে জীবন থেকে উদ্ভূত স্বতন্ত্র সৃষ্টি। যতই দিন যাচ্ছে, যতই সেই ব্যক্তি-সত্তার জ্যোতির্ময় আকৃতি স্মৃতি থেকে বিস্মৃতিতে অন্তর্ধান করছে, এই ক্ষতি একটি অশ্রুস্নাত শোকের মত তাঁর পরিচিত প্রিয়জনের মনে বিদ্ধ হয়ে আছে। অনেক সময়ে ভেবেছি যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের মনের মধ্যে কী ছবি বিধৃত আছে জেনে নেব; সেই মহিমান্বিত প্রকাশের সমুজ্জ্বল ছবি ভবিষ্যৎ মানুষের চিত্তাকাশে বিলম্বিত করবার চেষ্টা করব; কোনো একজনের দ্বারা এ সম্ভব নয়। তাঁর বহুমুখী বিচিত্র ভাবের দ্যুতিলীলা সমগ্রভাবে প্রতিফলিত হবার মত একটি উপযুক্ত চিত্ত-ভূমি দুর্লভ। তাই অনেক জনের অনেক অভিজ্ঞতার একটা মালা গাঁথবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। বিঘ্ন অনেক। প্রথম স্মৃতি দুর্বল, স্মৃতি সত্যের অনুকল্প নয়। স্মৃতি যে-মানুষের স্মৃতি তারই মনের মিশ্রণে তৈরি। সেই মনের আকৃতি অনুসারে তারও আকৃতি। অনুসন্ধান করতে গিয়ে এও দেখেছি, অনেকেই, এমন কি শিক্ষিত, বিচক্ষণ, বিশিষ্ট খ্যাতিমান ব্যক্তিরাও নিজের মনের ধারণাগুলি স্পষ্ট করে আকার দিতে পারেন না—স্মৃতি তাঁদের আবছায়ার অন্ধকারে ঘোমটা পরান, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা নেই। একবার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা; বহুদিন ধরেই তিনি কবিকে দেখেছিলেন, তাঁর জীবিতকালে ইনি বয়স্ক, শিক্ষিত ও সমাজের উপরের তলায় সম্মানের আসনেই ছিলেন, কিন্তু তবু তিনি কবির সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করে স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি বল্লেন, আমার মনে পড়ে ১৯২১ সালে (১৯২০?) কবি তখন সাউথ

কেনসিংটন-এ থাকতেন, তখন আমি আর অমুক বাবু প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি কী বলতেন, তা আমার কিছুই মনে নেই, শুধু এইটুকু মনে আছে যে বিশ্বভারতীর কল্পনাই তখন তাঁর মন ভরে ছিল। সর্বদা সেই কথাই কেবল বলতেন। বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ ছবি তাঁর কাছে স্পষ্ট বাস্তব ও সত্য ছিল খুব। তিনি ঐ বিষয় ছাড়া আর কিছুই যেন বলতেন না। কিন্তু আমরা তখন সে কথা খুব আগ্রহভরে শুনতাম না, আমাদের কাছে সে একটি কল্পনাবিলাস বলে মনে হত। ভারতবর্ষের এক গণ্ডগ্রাম বোলপুর, সেখানে এমন একটা জায়গা হবে যে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা আসবেন—ইয়োরোপের এই সব জ্ঞানী-গুণীরা সেই মরুভূমির প্রান্তরে, মাটির ঘরে গিয়ে বোলপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবেন ও পড়বেন এ সব কথা এতই অবাস্তব মনে হত যে আমরা হাসতাম। কবির এই কল্পনার ছায়া-ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতাম না। বাড়ি ফেরবার পথে আমরা আলোচনা করতাম কবির সে অসম্ভব কল্পনার কথা। সেই জন্যই তিনি ঠিক যে কী বলতেন তা আর আজ স্পষ্ট করে মনে করতে পারব না।

এ রকম আরো বহু লোকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে অনেক উজ্জ্বল তথ্য একেবারে ঢাকা পড়ে রয়েছে এবং নিজের চিন্তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে তাৎপর্য-ভ্রষ্ট হয়েছে। তখন এই উঞ্ছবৃত্তি পবিত্যাগ করলাম। দেখলাম এ উপায়ে তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারণা পরিষ্কার হবে না। উপরন্তু ভুল ঘটবার সম্ভাবনা।

যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তা বলতেন সে ভাষায় আজ পর্যন্ত সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণী কাউকেই কথা বলতে শুনিনি। অথচ সে বাংলাভাষাই, ঘরোয়া ভাষাই, বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সুন্দর, সুকণ্ঠে মধুর। ভাবই যে ভাষার রূপকার তাতে আর সন্দেহ থাকত না। সূক্ষ্ম অনুভূতি, আলো ঝলমল কৌতুকোজ্জ্বল ভাষার দ্যুতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করে তুলত। কারো সাধ্য নেই তার যথাযথ অনুলেখন বা স্মৃতিলেখন করে। সেজন্য তাঁর জীবিতকাল থেকেই দেখেছি অধিকাংশ সময়েই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার যেসব স্মৃতিলেখন প্রকাশিত হত সেগুলি লেখকের ভোঁতা কলমে মোটা হয়ে গেছে। তা তথ্য হলেও তাই সত্য নয়—ভাষা ও ভাবের সূক্ষ্ম বর্ণচ্ছটা, স্থূলহস্ত-অবলেপনে ম্লান। তবুও এ-চেষ্টার মূল্য আছে। তাঁর চারপাশের মনকে তিনি কিভাবে স্পর্শ করতেন তারই নানা প্রকাশের মধ্যে সেই আশ্চর্য ব্যক্তিস্বরূপের একটি প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। তার প্রকাশ স্বচ্ছ না হলেও, বিস্মৃতির ঘন অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে স্মৃতির দীপ জ্বালান চলে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নতার মধ্যে চিহ্ন রেখে যায়; মনে করায় শুধু কবি নয়, শিল্পী নয়, ভাবুক নয়, দার্শনিক নয়—একজন

মানুষ ছিলেন যাঁর সেই মনুষ্যত্বটুকুই স্মরণীয়, বিস্ময়কর! পরম সুন্দর!

কবির মনে একটি ক্ষোভ ছিল যে বিদেশে তিনি যা দিয়েছেন, যা পেয়েছেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে কেমন করে দূর নিকটবন্ধু হয়েছে, পর ভাই হয়েছে, তার কোনো যথাযথ ধারাবাহিক বিবরণ রাখা হয়নি। যখন তিনি প্রথম দেশ-বিদেশে ভারতবর্ষের বাণী বহন করে যাত্রা শুরু করেন তখন আজকের মত ঘর ও বাহির একাকার হয়ে যায়নি। বিদেশী শাসনের বাধা, ঘরের বাধা, নানা বাধায় তখন ভারতবর্ষ বাহির বিশ্বের চেয়ে ছিল দূরে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইয়োরোপ তখন কোনো খববই রাখত না। যদি বা কিছু খবর রটত তা ভুল এবং আমাদের ভারতীয় মহামান্য সরকার বাহাদুরের চেলাচামুণ্ডার মিথ্যা প্রচার। নিতান্ত দু-চারজন ভারত-প্রেমিক, প্রাচ্য-বিদ্যার চর্চায় রত পণ্ডিত ছাড়া এদেশের শিক্ষা. জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতির খবর সারা ইয়োরোপে কিছুই জানা ছিল না। একমাত্র মোক্ষমূলারই সংস্কৃতভাষাতত্ত্ব, বেদবাণী ও ভারতীয় আর্যত্বের জয়ধ্বনি ইয়োরোপের উদাসীন ও অনিচ্ছুক কানে প্রবেশ করাচ্ছিলেন! কিন্তু বৈদিকভারত. ইংরেজের পদানত সর্বরকমে লাঞ্ছিত ও জড়ত্বপ্রাপ্ত ভারতের চেয়ে এতই পৃথক ও দূরের ছিল যে, মোক্ষমূলারের ওকালতিতেও খুব সুবিধা হয়নি।

প্রথম যখন নোবেল প্রাইজের খবর প্রকাশিত হয়. তখন সারা ইয়োরোপ এত বিস্মিত হয়েছিল যে. নানারকম কার্টুনে কাগজপত্রে তার উচ্ছ্বাস দেখা যেত। জার্মানিতে একটা নক্সা বেরিয়েছিল. একটা তালগাছের উপর পাগড়ি-বাঁধা একটি 'হিন্দু' বসে আছে তার হাতে নোবেল পুরস্কার-পত্র! ভারতীয়রা অর্ধ-নগ্ন বর্বর এক জাতি যাদের মানুষ করবার গুরুভার সদাশয় ইংরেজ নিজের কাঁধে নিয়েছে, এইটুকুই সাধারণ লোকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খবর পেয়েছে। তার উপর ছিল কবি কিপলিং-এর কাব্য। কিপলিং তাঁর কাব্যে ভারতীয়দের বিশেষত বাঙালীর যে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন তার বহুল প্রচার হয়েছিল। তার প্রধান কারণ কিপলিং সুলেখক। তাঁর কৌতুক ও হাস্যপরিহাসের খোঁচায় বাঙালীর যে চিত্র জ্বল জ্বল করে উঠত তা কাব্য হিসাবে উপভোগ্য কিন্তু বাঙালীর পক্ষে অসম্মানজনক।

এই রকম এক অন্ধকার যবনিকার উপর রবীন্দ্রনাথ দর্শন দিলেন ইয়োরোপে। যাঁরা তাঁকে. তাঁর দেশকে. তাঁর জীবনের পটভূমি বা কীর্তি কিছুই জানত না তারাও প্রথম দর্শনেই কি প্রভাব অনুভব করল তার নানা খবর সমসাময়িক কাগজপত্রে দেখে বিস্ময় বোধ হয়। নোবেল পুরস্কার ইয়োরোপে বহু লোক পেয়েছে--কিন্তু ঐ বহুমানিত পুরস্কার একজন ভারতীয় বা তৎকালীন পরিভাষায় 'হিন্দু পোয়েট' পাওয়াতে হয়ত বিস্মিত ইয়োরোপের জনসাধারণের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু

দৃষ্টিপাতমাত্রই তারা যা দেখেছে তার আনন্দ ও বিস্ময় ফুরাতে চায়নি। যে কারণে পরবর্তী যুগে একজন বিদেশী বলেছিলেন :

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! এই নাম ভূড্‌কা প্রিয় রুশের স্থূল জিহ্বায় উচ্চারিত হয়েছে, প্রার্থনারত চীনবাসী ঐ নামে থমকে দাঁড়িয়েছে। ঐ নামে আবেগপ্রবণ ল্যাটিন জাতি মদের গ্লাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে—ঐ নামের মহিমায় জার্মানিতে শিশুরা খেলা ভুলে গিয়েছে, সুইজারল্যাণ্ডে শীতের সন্ধ্যায় বুড়োরা ঘরের কোণের আগুনের আরাম ছেড়ে বাইরে ছুটে এসেছে—মানুষের ইতিহাসের আরম্ভ থেকে, হাত থেকে কলম খসে যাবার বহু পরে ছাড়া এশিয়ার কোনো কবিই তাঁর জীবিতকালে এমন সম্পূর্ণ বিশ্ব জয় করতে পারেন নি।'

আমার এ কথা অনেক সময়ে মনে হয়েছে এবং হয়ত এ কথা আরও কেউ অন্যত্র লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভাব কোনো যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখত না। তিনি কী করেছেন, কী লিখেছেন, তাঁর মতামত যুক্তিসহ কি নয়, গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, ভালো কি মন্দ কিছুই জানা না থাকলেও শুধু তাঁর উপস্থিতিই যে জ্যোতি বিকীর্ণ করত অতিপ্রত্যক্ষ ছিল তার অনুভব। বস্তুত আমরা অনেকেই যখন তাঁকে দেখে অভিভূত বোধ করেছি তখন তাঁর কাব্য প'ড়ে পারদর্শী হইনি। আলো যেমন সকল প্রশ্নের অতীতরূপে নিঃসংশয়ে চক্ষুষ্মানের চোখের সামনে উদ্ভাসিত, তেমনি তাঁর প্রতিভার ইন্দ্রিয়ানুভব সহজ ও নিঃসংশয় ছিল। সে তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য নয়, কারণ বাঙালীর মধ্যে সুপুরুষ সুলভ না হলেও অন্য জাতির মধ্যে যথেষ্ট আছে—ইহুদি, ল্যাটিন, নর্ডিক জাতির মধ্যে সুপুরুষের অভাব নেই—কিন্তু নিখুঁত দৈহিক সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে প্রতিভার প্রবল উদ্ভাস এ যুগে এমন আর কখনো ঘটেনি।

ইয়োরোপের জনসাধারণ, শুধু বিদ্বৎসমাজ নয়, সাধারণ মানুষ তাঁকে কেমন করে দেখেছে সে খবর তাই জানতে ইচ্ছে করে—যদিও কবির সহযাত্রী ও নিকটবর্তী আমাদের স্বদেশীয় কেউই তার কোনো বিবরণ লিখে রাখেননি, কিংবা লিখে থাকলেও প্রকাশ করেননি, তবুও পুরানো কাগজপত্রে ইতস্তত ছড়ানো তৎকালীন বিভিন্ন লোকের মতামত ও ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার খবর পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিদেশের কথাই বিশেষ করে মনে করেছি এ জন্য যে সম্পূর্ণ বিপরীতস্বভাব ভিন্নভাষাভাষী অপরিচিত জগতে তাঁর আবির্ভাব কী প্রভাব বিকীর্ণ করেছিল তা জানবার মতো। বিশেষত এদিকটা বাঙালীর কাছে অজ্ঞাত।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে কবি গীতাঞ্জলির অনুবাদ নিয়ে ইংলণ্ডে যান—দার্শনিক ব্রজেন্দ্র

শীল ও আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের নিমন্ত্রণে। সেই সময় থেকেই আমার এই আখ্যায়িকা শুরু করব। নানা জায়গায় নানা লোকের প্রবন্ধে, আলোচনায় এ সব খবর পেয়েছি ও কিছু সমসাময়িক ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি। বলা বাহুল্য এ সময়ের কিছুই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নেই, তার সহজ কারণ ১৯১৩ সালে আমি জন্ম গ্রহণ করিনি। অতএব স্থান কাল ইত্যাদি সম্বন্ধে অল্প-স্বল্প গোলমাল হতেও পারে! যদিও যথাসাধ্য তার সঠিক খবর জোগাড় করবার চেষ্টা করেছি। আর-একটা কথাও এখানে বলতে হবে যে এ রচনা জীবনচরিত নয়। রবীন্দ্র-জীবনী বিস্তারিতভাবে প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, সেখানে ধারাবাহিকভাবে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলির তালিকা পাওয়া যাবে। আমার এই সংগ্রহে পারম্পর্য ঠিকমত রক্ষিত হয়নি, এ রচনার জন্য তার প্রয়োজনও নেই—এ তাঁর জীবনবৃত্তান্ত নয়—সমসাময়িক মানুষের চোখে রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তির অনুসন্ধান।

প্রখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যরসিক রোটেনস্টাইন ইংলন্ডের সুধীসমাজে প্রধান। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'মডার্ন রিভিউতে একটি গল্প পড়লাম, পড়ে মুগ্ধ হলাম, লেখকের নাম দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জোড়া-সাঁকোয় জিজ্ঞাসা করে লিখলাম, এ রকম গল্প আর পাওয়া যায় কি? কিছুদিন পর একটি খাতা এসে পেঁাছল, রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার অনুবাদ—অনুবাদক বোলপুর স্কুলের একজন শিক্ষক, অজিত চক্রবর্তী। অনুবাদ যদিও কাঁচা রকমের তবু গভীর ভাবপূর্ণ এবং গল্পের চেয়েও আমার বেশি ভালো লাগলো।...এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের সাধু-চরিত্র প্রমথলাল সেনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়—তিনি ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে আমার বাড়ি নিয়ে আসেন। ডাক্তার শীল তখন এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি দার্শনিক, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, আর শিশুর মত সরল মানুষ—তাঁরা দুজনেই কবিকে লন্ডনে আসার জন্য অনুরোধ করে লিখলেন।'

কবি লন্ডনে পেঁাছে একটি খাতায় হাতের লেখায় কয়েকটি কবিতার অনুবাদ রোটেনস্টাইনকে দিলেন। সেই শুভমুহূর্ত থেকে তাঁর দিগ্বিজয়ের শুরু।

গীতাঞ্জলি

রোটেনস্টাইনের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী ও কাব্যরসিকের কাছে গীতাঞ্জলি পড়া হল। কবির সেদিনকার অভিজ্ঞতা অন্যত্র নানা স্থানে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তাঁর মন দ্বিধা ও সংশয়ে পূর্ণ ছিল। কিন্তু উপস্থিত সকলেই কী গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন পরে তা জানতে পেরে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। অহমিকাশূন্য সপ্রশংস দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন সেই বিদ্বৎসমাজকে, তাঁকে দেখে যে তাঁদের কী বিস্ময় জাগতে পারে বা তাঁর কাব্যে তাঁরা কতটা আনন্দ পেতে পারেন সে সম্বন্ধে কোনো আত্মগরিমা তো ছিলই না, ছিল প্রবল সংকোচ।

মিস সিনক্লেয়ার সেই সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইনের বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখছেন : 'সেদিন সন্ধ্যায় কবি ইয়েট্‌স প্রায় বারোজন শ্রোতার সামনে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন, সেই আবৃত্তি যেন সেই সন্ধ্যায় বৈঠকখানা ঘরটিকে মন্দিরে পরিণত করল।'

বর্তমানকালে অনেকেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ তাঁর কাব্যকে ম্লান করেছে। সাহিত্য হিসাবে এ কথার মূল্য নির্ধারণ বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু ভাবের দিক থেকে, অনুভবের প্রত্যক্ষ স্পর্শে, তাঁর বাণী যে সেই ভিন্নভাষাভাষী মানব-চিত্তকে স্পর্শ করেছিল সেইখানেই কাব্যের এক চরম সার্থকতা। অনূদিত গীতাঞ্জলি কবি ইয়েট্‌সকে কী রকম অভিভূত, আনন্দ-চঞ্চল করেছিল তার নানা বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকের কাছে পরিচিত। ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকায় কবি ইয়েট্‌সের মনের আবেগ অপূর্ব সাহিত্যের রূপ নিয়েছে। তিনি বহুবার বলেছেন, 'আমি আমাদের যুগের এমন কোনো মানুষের কথাই জানি না যিনি ইংরেজি ভাষায় এমন কিছু লিখেছেন যা রবীন্দ্রনাথের গীতি-কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।'

আমরা শুনেছি কবি ইয়েট্‌স পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের উপর বিরূপ হয়েছিলেন। অবশ্য সেজন্য তাঁর পূর্ব-জীবনের অনুভূতি ও অনুরাগ মিথ্যা প্রমাণ হয় না। মানবচরিত্র পরিবর্তনশীল, এক জীবনেই জন্ম-জন্মান্তর ঘটে। বস্তুত, 'সার' উপাধি ত্যাগের পর থেকে ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠতে শুরু করা থেকেই ইংলন্ড কবির প্রতি বিমুখ হতে শুরু করে। ইয়েট্‌স-এর শুধু মত-পরিবর্তন নয়, চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু সে সময়ে গীতাঞ্জলি পড়ে ইয়েট্‌স যে কী পরিমাণে উচ্ছ্বসিত হয়ে-

ছিলেন ১৯১৬ সালে জেমস কাসিন্স-এর লেখা একটি প্রবন্ধে তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৯১২ সালের আগস্ট মাসে জেমস কাসিন্স ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি নরমেন্ডির কাছে একটা ছোট শহরে বর্ষার উৎপাতে অস্থির হচ্ছিলেন, এমন সময়ে কাগজে একটি ছোট্ট লাইন পড়লেন 'কবি ইয়েট্‌স এখানে আছেন।' অধ্যাপক কাসিন্স অপ্রত্যাশিতভাবে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবির সাক্ষাৎ পাবার সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি হলেন। কাসিন্স লিখেছেন : 'আমরা স্বপ্নেও জানতাম না আমাদের ভাগ্য এত প্রসন্ন। একজন কবির পরিবর্তে দুজনের সঙ্গে দেখা হল, একজনকে দেখলুম দেহে—দীর্ঘদেহ পুরুষ, আইরিশ সাহিত্য ও নাটকের অভ্যুত্থানের নেতা—আরও একজনকে দেখলাম, দেহে নয়, দেখলাম তাঁর আত্মাকে—সদ্য-প্রকাশোদ্যত অবস্থায়—ইংরেজি সাহিত্যে জন্ম নেবার জন্য অপেক্ষা করে আছেন, আছেন কিন্তু রাজকীয়ভাবে, প্রাণপূর্ণভাবে, আর-একজনের কল্পনায় অপূর্ব হয়ে, আর-একজনের আনন্দ উদ্বেলিত করে।...একজন কবি আর-একজন সখা কবির প্রতিভার ঐশ্বর্য সামান্য সুযোগ পেলেই সর্বোচ্চ চূড়া থেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, এ দৃশ্য মনকে অভিভূত করে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের নাম ইংলন্ডের সুধীসমাজে পরিচিত ছিল না...শুধু দু-একজন সাহিত্য-জগতের মধ্যমণি এই নূতন অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা জানতেন। ইয়েট্‌স রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি হাতে-লেখা খাতা নিয়ে ঘুরতেন—তিনি তখন গীতাঞ্জলি ইন্ডিয়া হাউসের সংস্করণটির জন্য ভূমিকা লিখছিলেন। তিনি ঐ কবিতাগুলির প্রত্যেকটি আবৃত্তি করতেন—সে রকম আবৃত্তি তিনিই শুধু করতে পারতেন—স্তব পাঠের মত, তাঁর কণ্ঠে ঐ কবিতার নিজস্ব মহিমার সঙ্গে যোগ হত সুর, যোগ হত ব্যাখ্যা। কালের প্রভাবে কান থেকে হয়ত সে ধ্বনি মুছে গেছে, কিন্তু ঐ ছোট ছোট এক-একটি ছন্দিত গদ্যর টুকরো যে আত্মার এক শাশ্বত বাণী—এবং তারা যে ইংরেজি সাহিত্যে শুভ পরিবর্তন ঘটাবে সে বিশ্বাস আজও স্থির আছে, কারণ এ কবিতাগুলি ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করেছে পরিশুদ্ধ সুগীত ভাষায়—সৃষ্টির পূর্ণতা নিয়ে, অনুবাদের মত অসম্পূর্ণভাবে নয়—তার ঔজ্জ্বল্য পশ্চিমের কাছে নূতন অথচ তার সঙ্গে সর্বযুগের দ্রষ্টাদের উচ্চারিত শাশ্বত বাণীর আশ্চর্য মিল আছে।...'

অতএব অনুমান করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা অনুবাদ বলে নয়—ইংরেজি ভাষারই প্রকাশ বলে সে সময়ে সাহিত্যিকরা গ্রহণ করেছিলেন, যদিচ কবির নিজের সংকোচের অন্ত ছিল না। চিরদিন যাঁর সুকণ্ঠের আবৃত্তি সকলকে চমৎকৃত করেছে, প্রথম দিন যখন সুধী-সভায়

গীতাঞ্জলি পাঠ হল আমরা দেখছি সেদিন তাঁর নিজে পড়বার ভরসা নেই। এক জায়গায় তিনি নিজে লিখছেন : 'ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নেই; আমাকে কেবলি বেড়া ডিঙিয়ে চলতে হয়—তেমন করে পথ চলা একটা ব্যায়াম'। কিন্তু ওদেশে বহু জ্ঞানী-গুণী কবির স্বচ্ছন্দগতি অনায়াস ইংরেজিকে অক্সফোর্ডের উচ্চারণ বলে বর্ণনা করেছেন। বিস্মিত হয়ে বলেছেন, 'এই কি সেই ইংরেজি ভাষা, এই 'মিক্সাক্ল অফ এক্সপ্রেশন' কি আমাদের ভাষার, যা আমাদের বহু লোকের মুখেই 'অপ-ভাষায়' পরিণত হয়েছে।'

হঠাৎ যখন নোবেল প্রাইজের খবর প্রকাশিত হল তখন নানা কাগজে নানা মতের উচ্ছ্বাস দেখা গেল। সমস্ত পশ্চিম জগৎ জুড়ে এ নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ঘনিয়ে উঠল—স্বপক্ষে, বিপক্ষে। সেই সময় আমেরিকার একটি কাগজ 'উদ্ধত যৌবন' এই নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধে লিখছে :

'এই নোবেল পুরস্কারের ঘোষণা একটা মস্ত কাজ করেছে—কঠিন আঘাত করে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, এ আঘাত আমাদের প্রাপ্য ছিল—আমাদের গভীর অজ্ঞতা, আমাদেব আত্মতৃপ্ত গ্রাম্যতা, আমাদের গর্বিত আত্মপ্রসাদের মূলে এসে এই আঘাত লেগেছে।—সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের খবর ঘোষিত হবার পূর্বে কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছিল ?. খ্যাতিমান ও কীর্তিমানদের নামের তালিকাব অনেক বই আছে (Who is Who), সেসব বই ইংরেজি ভাষায় লেখা ও ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে প্রচলিত,—সেখানে অসংখ্য রাজা-গজার নাম. চুনোপুঁটি জমিদারদের নাম, নগণ্য লাখপতিদের নাম তালিকাভুক্ত করা আছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের নাম নেই। সম্প্রতি যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুজগতের আধিপত্যের লক্ষ্য ভেদ করে এগিয়ে এসেছে, এই নোবেল পুরস্কার ঘোষণা থেকে এখন তার একটি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—সে এই, যে কোনো সাম্রাজ্যের সীমাবেখা, কোনো জাতিভেদের গণ্ডী, কোনো বংশগত শত্রুতা কিছুই সেই বিশ্বসত্তাকে লুপ্ত করতে পারে না।...কিছুদিনের জন্য দাবিয়ে রাখতে পারে, নষ্ট করতে পারে না...আমরা যেসব দেশ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খবর রাখি সে সমস্ত দেশের চেয়েই ভারতবর্ষ বহু পুরাতন। আমরা কেউ কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও শুনি নাই—যদিও তিনি এক বৃহৎ জাতির আত্মার সঙ্গীত ত্রিশ বৎসর ধরে গান করেছেন, যে গান দুই হাজার বছরের উপলব্ধিসঞ্জাত।'. .[১]

যখন ইয়োরোপের বিস্মিত মনে সবেমাত্র গীতাঞ্জলির সুরধ্বনি প্রবেশ

---

[১] *States Columba*, Nov. 19, 1913.

করতে শুরু করেছে সেই সময়ে সেদেশে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতিও যে আত্মিক অনুভব বিকীর্ণ করেছে তাও সামান্য নয়—বস্তুত তা তাঁর কাব্যের প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ঐ সময়ে জেস্‌পার স্মিথ নামে এক ব্যক্তি ইংলন্ডের খবরের কাগজে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—জেসপার স্মিথের পরিচয় জানি না, তবে তিনি সুলেখক তাতে সন্দেহ নেই।—

'গত গ্রীষ্মকালে আমাদের মধ্যে একজন মানুষ এসেছিলেন, আমাদের মধ্যে বাস করেছিলেন, আমাদের এই লন্ডনের রাস্তায় হেঁটেছিলেন—যাঁকে দেখলে হঠাৎ মনে হয় তিনি এ যুগের মানুষ নন—হয় তিনি সুদূর অতীতের, নয় তিনি অনাগত ভবিষ্যতের—এই বর্তমানের নন। তিনি আমাদের কাছে সাগর পার হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হত শুধু সাগর পার নয়, তিনি যেন বহুযুগের ওপার থেকে আমাদের কাছে এসেছেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ, বিলম্বিত শ্মশ্রু, উন্নত মস্তক, রাজকীয় ভঙ্গি, দৃপ্ত নির্ভীক দৃষ্টি, যদিও স্নেহ-নম্র সে চোখ দেখলে মনে বিশ্বাস হয় যেন তিনি নিশ্চয় সেই দূর বিস্মৃত আর্থারের যুগ থেকে উঠে এসেছেন, যখন সবল দুর্বলকে সেবা করতে লজ্জা পেত না, যখন জ্ঞানী অজ্ঞানীকে শিক্ষা দিত, ছলনা করত না এবং যখন নাইটহুড বা বীরত্বের উপাধি-চিহ্নের মহিমা ছিল খেতাব জোগাড় করায় নয়, যোগ্যতায়। কিন্তু যদি তিনি দীর্ঘ ঋজুদেহ নাও হতেন তবু তাঁর মহিমান্বিত শান্ত মূর্তি, তাঁর সমাহিত গভীর নিঃশব্দ ভঙ্গি—এই তুচ্ছ ব্যস্ততা ও ঠেলাঠেলির যুগে মানুষকে আকর্ষণ করতই।'

এই ছোট বর্ণনাটি স্মরণ করায় তাঁর সেই শান্ত, আত্মস্থ মূর্তি, যখন ভোরবেলায় সূর্যাভিমুখী হয়ে কোলের কাছে হাত জড়ো করে বসে থাকতেন, দেহের আধারে জ্বলত চিত্তের শিখা—নিবাত নিষ্কম্প। কিন্তু সে সময়ে তো জেস্‌পার স্মিথ তাঁকে দেখেন নি—তবু কর্মব্যস্ত মানুষের ছুটোছুটি ও জীবনযাত্রার কোলাহলের মধ্যে, সেই নিরুদ্বেগ প্রশান্ত মূর্তি তারা বিস্মিত হয়ে দেখেছে—কোনো কাজে তাঁর তাড়া নেই, ঠেলাঠেলি নেই, দৌড়াদৌড়ি নেই—ইয়োরোপের মানুষের কাছে এই সমাহিত মহিমা বিস্ময়কর ঠেকেছে।

ঐ সময়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করে আর একজন বলেছিলেন : 'আমি লন্ডনের একটি হোটেলে ঠাকুরের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা আজ স্মরণ করছি।—মানুষ যেন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে তাঁকে দেখে, মন বলে—যা কিছু এই আমাদের গোলার্ধে, মর্তলোকে, স্পন্দিত, শ্বসিত হচ্ছে, যা কিছু জীবিত, তার কোনো কিছুই এই মানুষটির সৌন্দর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে তুলনীয় নয়। এ এমনি ত্রুটিহীন সৌন্দর্য যে, সে আপনাতে আপনি

প্রতিষ্ঠিত—যখন তিনি কথা বলেছিলেন তখন যেন শুধু সেইটুকুই সত্য ছিল, আর সব কিছু—দৌড়াদৌড়ি মলিনতা, বাহিরে রাস্তায় কুশ্রী শব্দ সব যেন তাঁর সামনে একেবারে অবিশ্বাস্য অবাস্তব হয়ে গেল।'১

যে ভাব রবীন্দ্র-কাব্যে, সেই ভাব ছিল রবীন্দ্র-জীবনে, আচরণে, জীবন-বিন্যাসে। তিনি যে শান্তির বাণী শোনাতে চেয়েছেন তা মুখের কথা মাত্র নয়, কবির কল্পনা নয়, ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস নয়—তা জীবনের গভীরে পরিব্যাপ্ত। ঐ সময়ে নানা নিমন্ত্রণে খ্যাতিমান অন্যান্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে সম্মানের আসনে তাঁকে দেখলে স্বতঃই তুলনা মনে এসেছে। একটি সাধারণ ইংরেজ তাঁকে বড় বড় নিমন্ত্রণসভায় সম্মানিত হতে দেখেছিলেন—তখনই তিনি অনুভব করেছিলেন সকলের মাঝখানে থেকেও সকলের চেয়ে কত দূরে কবি দাঁড়িয়ে আছেন। সে দূরত্ব অহমিকার নয়—জীবনবোধের ভিন্নতায়।—

'আমাদের মনে হয় কোনো কবিরই যশের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানে এমন অন্তরের সঙ্গে অরুচিবোধ হয়নি ও ধৈর্যের সঙ্গে, ইংলন্ড ও আমেরিকার সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণের সমাদর, বৈজ্ঞানিক চায়ের আসরের কৌতূহল, স্বর্গের রহস্যের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারবার জন্য বাজে বক-বকানি, এমন করে সহ্য করতে হয়নি। অল্পদিন পূর্বে যখন তিনি লন্ডনে ছিলেন তখন এই সমস্ত সভায় তাঁকে দেখলে, চঞ্চলরসনা, বৃথালাপী, সাপের মত ধূর্ত ও আরো অনেক কারণে সাপের সঙ্গে তুলনীয় মহামহারথীরা, যারা জীবনে কখনো ধ্যান কাকে বলে জানে না, তাদের মাঝখানে তাঁর সেই ধ্যান-মগ্ন মূর্তি, সেই নিশ্চল প্রশান্তি আর হরিণের মত নিরীহ মুখ দেখলে, মনে হত অদৃষ্ট যেন কৌতুক করে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে। তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বল্লে তখনই অতি ভদ্রতার সঙ্গে উত্তর দিতেন—আহা, তাঁর সেই কোমল কণ্ঠস্বর যেন লন্ডন শহরে শোনবার নয়—এমন স্বর বুঝি স্বর্গেই শোনা যায়—তারপর আবার সেই গভীর নৈঃশব্দে ফিরে যেতেন, সময়ের প্রবাহ বয়ে যেত, তাঁর কোনো তাড়া ছিল না।'২

সকলের মাঝখানে বসে সকলের থেকে দূরে চলে যাবার এই আশ্চর্য ক্ষমতা আমরা অনেকেই দেখেছি, বিস্মিত হয়েছি—কিন্তু এত অল্প সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গঠিত চিত্তেও তাঁর এই বিশেষ ভঙ্গিটি লক্ষ্য হয়েছে। চায়ের সভায় গল্পগুজবে যুক্ত থেকেও ভিতরে চলেছে যে মনন-প্রক্রিয়া তারই গভীর সৌন্দর্যের ছায়া পড়েছে প্রত্যেক আচরণে, কর্মব্যস্ত ইয়োরোপ বিস্মিত হয়ে দেখেছে ধ্যানী ভারতের প্রবুদ্ধ সত্তা।

---

[১] *The Ceylon Observer,* May, 1934.

[২] *London Nation,* 1913.

রোটেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিচিত্রে লিখেছেন : 'ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে ইংলণ্ডের নবীন কবিরা একত্র হতেন, তার মধ্যে সব চেয়ে উৎসাহী ছিলেন এজরা পাউন্ড, বয়স মাত্র সাতাশ, তরুণ উদীয়মান কবি—আধুনিক যুগের কবিদের মুখপাত্র। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে আসতেন, সেই সময়ে তাঁর সংস্পর্শে মনে যে আনন্দ উদ্বেল হয়ে উঠত, এজরা পাউন্ড নিপুণ ভাষায় তা নানা প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুলি প্রকাশিত হওয়া আমার মতে অতি প্রয়োজনীয় ছিল। যদিও জানি না সকলে আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা। আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে হলে তাঁর কাব্য পড়তে হবে। শান্ত মনে পড়তে হবে। যদি সম্ভব হয় উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে হবে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখলে অনুবাদের ইংরেজি অতি সরল তবু এই কাব্য এক শিল্পী ও সুরকারের রচনা, যিনি আমাদের সঙ্গীতের চেয়ে সূক্ষ্মতর সুরের সঙ্গে পরিচিত।...

'এক মাসের কিছু উপরে হবে যখন আমি ইয়েট্‌সের বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখলাম তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে আছেন--তিনি বল্লেন, 'আমাদের সকলের চেয়ে বড় একজন এসেছেন (Some one greater than any of us)'।'

কবির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে করতে এজরা পাউংড মনে করেছেন কিছুই বলা হল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন--'যে-আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি, আপন গানের কাছেতে আপনি হারি, সেই আমি কবি কে পারে আমারে ধরিতে।' সেই স্বপনমুরতি গোপনচারী কবির অধরা স্বরূপ, এজরা পাউন্ড নানা ব্যাখ্যায় ধরবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে কোনো কথা দিয়েই বুঝি তাঁর কাব্য ও ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। যাঁরা তাঁর অনির্বচনীয় স্বরূপের সম্মোহনের সামনে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা জানেন সেই কবি ও তাঁর কাব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। এজরা পাউন্ডও বলছেন :

'যদি একটা কথা সহজভাবে স্বীকার করি তাহলেই হয়ত আমার সমালোচনাটি উপযুক্ত হবে। অবশ্য আমি ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর কাজকে মিলিয়ে ফেলতে চাই না, তবু উভয়ের মধ্যে এমন গভীর সম্বন্ধ রয়েছে যে, এ প্রসঙ্গে আমি যে দুটি কথা বলব তা হয়ত অযোগ্য হবে না। যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ লাভের পর তাঁর কাছ থেকে উঠে আসি আমার মনে হয় আমি যেন চামড়ার আচ্ছাদন জড়ান সেই আদিম যুগের বর্বর মানুষ যারা পাথরের অস্ত্র লাঠিতে বেঁধে ঘাড়ে ঝুলিয়ে ফিরত।...

'আমি আর একটি ঘটনার কথা বলব যা শুনলে আপনারা হয়ত

তেমনি একটি অব্যক্ত আনন্দ পাবেন যা তাঁর কাব্যে পরিব্যাপ্ত। একদিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চৌকিতে বসে আমাদের কাছে সবেমাত্র বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে আরম্ভ করেছেন এমন সময় গৃহকর্ত্রীর একটি তিন বছরের মেয়ে উচ্চহাস্যের কলকলে তুমুল সোরগোল করতে করতে ঘরের মধ্যে দৌড়ে এল। তৎক্ষণাৎ কবি সেই শিশুর সঙ্গে শিশুর মতই হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আমি চমকে উঠলাম এবং এক মুহূর্তের জন্য আমার যেন গা ছম্-ছম্ করে উঠল, সে অনুভূতি আমি ঠিক ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। তিনি কি সহসা শিশুর আনন্দের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ গভীর সংযোগ অনুভব করেছিলেন কিংবা এ কি তাঁর প্রাচ্য অতিভদ্রতা, অথবা সেই হাস্যধ্বনিতে কি এই স্বীকৃতিটুকু ছিল যে, এই শিশুর আনন্দের মূল্য মহাবিশ্ব ব্যাপারের মধ্যে আমাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনার চেয়ে কম নয়! 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে। আমায় নৈলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে...।'[১]

এইভাবে এজরা পাউন্ড কবির ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতার পটভূমিতে তাঁর কাব্যকে গ্রহণ করে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেছিলেন তা নানা ভঙ্গিতে, বচনে, ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু আলোচনার পরে তিনি আবার বলছেন :

'সংক্ষেপে দেখতে গেলে আমি এই কবিতাগুলির মধ্যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ বুদ্ধি দেখতে পাই, এত বিচিত্র ভাব আমাদের মনে আসে যা আমরা এই ব্যস্ততার যুগে, আমাদের পাশ্চাত্য জীবনের হট্টগোলের মধ্যে, আমাদের শহুরে ব্যবসায়ী জীবনে, আর কলে তৈরি সাহিত্যের কচকচানিতে, আর বিজ্ঞাপনের ঘূর্ণাবর্তে অবিরত ভুলে যাই।'

---

[১] *Public Opinion*, Nov. 21, 1913.

নোবেল প্রাইজের পূর্বে

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইয়োরোপবাসীদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে সেদেশে ভারতবর্ষ ও হিন্দুজাতি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা ও মতামত কী ছিল তা জানা দরকার। আজ যখন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ এমন সহজ হয়ে গিয়েছে এবং স্বাধীনতার সুযোগে সুনেতা, কুনেতা, সরকারী কর্মচারী, অকর্মচারী সকলেই অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ড চষে ফেলছে এবং বিশ্বমৈত্রীর বাণী যখন এর, ওর, তার মুখের কপ্চানিতে বুদ্বুদের মত নির্গত হচ্ছে তখন মানুষ ধারণাই কবতে পারবে না সে যুগে অবস্থাটা কী ছিল। আমাদের নানা কুপ্রথা, ব্যবহারিক জীবনের নানা অসংগতি, জনসাধারণের ব্যাপক অশিক্ষা, মূঢ়তা, বিচারহীন আচার-পরায়ণতা—সর্বোপরি দারিদ্র্য ও পরাধীনতা—সব জড়িয়ে সেই সমুদ্রপারের মদগর্বিত দেশগুলির কাছে আমাদের যে অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্তি প্রকাশিত হয়েছিল তা আজ অনুমান করা যাবে না। এবং সে সময়ের একটি যথাযথ ধারণা না থাকলে আমরা বুঝতে পারব না—রবীন্দ্রনাথ আমদের কী করেছেন, কী ছিলেন এবং কেন তিনি বর্তমান ভারতের প্রাণপুরুষরূপে বরেণ্য।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে নানা অপ-প্রচারের মূলে কিপলিং-এর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিপলিং এবং মেকলে এই দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছাড়াও নিন্দামুখর আরো অনেক লেখক ছিলেন—যাঁরা ভারতবর্ষের বহিরঙ্গের দৈন্য পার হয়ে কখনো অন্তর্মুখী হননি। তাছাড়া যুক্তিবাদী ইংরেজ যুক্তি ছাড়া কোনো কাজ করতে চায় না, ভারতবর্ষকে অধীন করে রাখবার জন্য জোর-জবরদস্তির একটা উপযুক্ত কারণ চাই—ভারতীয়রা হীন, বর্বর, একেবারেই অযোগ্য, এইটে বিশ্বসমাজে প্রমাণ করে রাখার তাই প্রয়োজন ছিল। তার অল্প পূর্বে বিবেকানন্দ ভারতের কথা বলেছিলেন, তবে তা মোটামুটি পুরাতন ভারতের কথাই। এদিকে আমাদের আত্মপ্রকাশের ভাষাও প্রবল ছিল না, রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক ভারতের বাণীরূপে বিশ্বের আকাশে ধ্বনিত হলেন।

সেই জন্য নোবেল প্রাইজের খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে নানা রকমের মতামতের ঝড় বইতে লাগল। আমেরিকার একটি কাগজ ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে লিখছে :

‘নোবেল প্রাইজ যে একদিন একজন হিন্দু কবিকে দেওয়া হবে এ কথা

বোধ হয় আমেরিকান কবি লুকাস হোয়াইট কল্পনাও করতে পারতেন না, তিনি কয়েক বছর আগেই লিখেছিলেন—অন্ধকারাচ্ছন্ন এই হিন্দু জাতি,

> শুধু সেই কাজ করে যাহা বলে জ্ঞাতি।
> আদ্যোপান্ত চলেছে লড়াই,
> নিয়ে তার জাতের বড়াই,
> নাই তার আর কোনো সাজ,
> চামড়ায় চলে যায় পোশাকের কাজ।'[১]

লুকাস হোয়াইট কে তা জানি না এবং কেন যে সুদূরদেশস্থিত হিন্দু জাতি তাঁর ঈদৃশ কাব্য-প্রেরণা জাগিয়েছিল তাও আমাদের অজ্ঞাত। তবে এই ধরনের পরিচয়ই তখনকার লোকের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। বিশেষত ভারতবর্ষ থেকে যেসব মিশনারিরা ফিরে যেতেন নানা কারণে তাঁরাও কুৎসা প্রচার করতেন। কারণ যে একেবারেই ছিল না তা নয়! আমাদের অলস জড়-প্রকৃতি, আচার-আচরণে শৈথিল্য, নানারকম ব্যবহারের নোংরামি যা আজও দূর হয়নি তা বিদেশীর কাছে কুৎসিত ঠেকতে পারে। বাল্যবিবাহ বা শিশুবিবাহ, বিধবার প্রতি সম্পূর্ণ অকারণ কঠিন ব্যবহার, পূজা-বিধির মধ্যে নিরর্থক যুক্তিহীন অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, ইত্যাদি কোনোটাই প্রশংসনীয় বলে গণ্য হতে পারত না। দশ বছরের বালিকা বিধবাকে একাদশীর দিনে তৃষ্ণায় দগ্ধ করবার ইতিহাস শুনলে ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদী মন আমাদের শিক্ষা, সংস্কার, বুদ্ধি, বিবেচনাকে সম্মান করতে পারত না। অপরাধ যা ছিল তাই যথেষ্ট ছিল কিন্তু মিশনারিরা অনেক সময় বাড়িয়েও বলতেন—তাঁরা কোমর বেঁধে শিক্ষা দিতে বেরিয়ে পড়েছেন দেশ-দেশান্তর—যে দেশে যত অশিক্ষা ও মূঢ়তা সেই দেশেই তাঁদের কাজ দুরূহ ও মহৎ, তাই এও প্রমাণ করবার দরকার হত ভারতবর্ষে তাঁদের কাজ কী কঠিন; তাছাড়া ভারতবর্ষের সমস্ত দৈন্যের ভিতরও কোথায় ঐশ্বর্য আছে, কোথায় তার ভাব আছে, প্রাণ আছে, স্তূপীকৃত জঞ্জাল সরিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে যে উদার সহানুভূতি ও প্রেমের দৃষ্টি চাই—অধিকাংশ বিদেশীর কাছেই তা আশা করা যায় না। এতে বিদেশে যেসব ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যেতেন তাঁদেরই লজ্জা ও অপমান অসহ্য হত। 'আপস্বামী' নামে একজন দক্ষিণ ভারতীয় লেখক লিখছেন একটি ভারতীয় ক্রিশ্চান মহিলার বিপদের কথা। ঐ মহিলা ক্রিশ্চানদের কোনো সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলবেন স্থির ছিল। তার পূর্বে ভারত-প্রত্যাগত একজন মিশনারি বক্তৃতা দিতে উঠে বল্লেন যে, ভারতবর্ষে পুরো

---

[১] *Globe*, Boston, Mass, Nov. 16, 1913.

একটি মাস তাঁকে একটি ছাতার নিচে কাটাতে হয়েছিল, কারণ ভারতীয়রা এখনও তালগাছের পাতায় ছাতা বেঁধে দিন কাটায়। এদিকে ভারতীয় ক্রিশ্চান মহিলার স্বদেশের এই ক্যারিকেচার শুনে মুখে আর বাক্য নাহি সরে!

এই অন্ধকার পটভূমির উপর শোভন-বচন, শোভন-কর্মা, শোভন-আত্মা রবীন্দ্রনাথ ঘটালেন ‘পূরবে পশ্চিমে বন্ধুসঙ্গম’—তিনি একেবারে বিদেশের মর্মস্থলে গিয়ে এই সত্যবাণী উচ্চারণ করলেন :

‘We cannot accept anything from your hands unless we are able to give you something in return.’

তিনি বললেন, শুধু বিশ্বে, আমাদেরও কিছু দেবার আছে। ‘তোমাদের বিজ্ঞান, তোমাদের যন্ত্রকৌশল আমাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন, তোমাদের কাছ থেকে আমরা সে শিক্ষা নেব, কিন্তু তার পরিবর্তে যদি আমাদের যে আত্মিক ঐশ্বর্য তোমাদের দিতে চাই তা যদি না দিতে দাও, তবে আমাদের হবে অসম্মান।’

‘ইয়োরোপে দেখেছি গ্রীসের সভ্যতার যে দান, খৃষ্টধর্মের যে দান তার ঋণ স্বীকার করা হয় কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে যা কিছু আসে তাই হীন প্রতিপন্ন করা হয়। অজ্ঞান এবং শোষণনীতির সূত্রে বদ্ধ যে সম্বন্ধ তা সত্য নয়—তাই স্থায়ী নয়। সত্য সম্বন্ধ, সহানুভূতি ও বুদ্ধির যোগে স্থির করা চাই।’

ইয়োরোপের সঙ্গে সংযোগের পর সেই সত্য সম্বন্ধ তৈরি করবার সাধনাই তাঁর কর্মজীবনে প্রধান হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাধনা, বাণী ও ধর্ম কবির কাব্যে, সাহিত্যে, বচনে ও কর্মে নূতন ও [illegible] হয়ে যখন বহু মনের বিস্ময় ও আনন্দে মিলিত হচ্ছিল তখনও সংশয়ী [illegible] কম বাধা উপস্থিত হয়নি। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা পাছে তাদের বস্তুতান্ত্রিকতায় ঘুণ ধরায় এ ভয়ও কখনো কখনো দেখা গেছে— যদিও এই সময়ে ইয়োরোপেও কোনো কোনো মনীষী বস্তু-জঞ্জালের স্তূপ থেকে আত্মার মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। ‘পদ্মভোজী’ (Lotus-eater) অর্থ অলস, তাই ‘পদ্মের কবি’ নাম দিয়ে ১৯১৩ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘সাধনা’র প্রবন্ধগুলির সঙ্গে বের্গসঁর মতামতের সাদৃশ্য আলোচনা করে লেখক বলছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ও বের্গসঁ দুজনেই ইয়োরোপের বস্তুতন্ত্রবিমুখ মনের গতিকে আশ্রয় করেছেন।’ এই প্রসঙ্গে মেটারলিঙ্কের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা হয়েছে :

‘রবীন্দ্রনাথ ও মেটারলিঙ্ক দুজনেই কবির কাজটি ভালই করেন কিন্তু দার্শনিকের কাজটি নয়। তাঁর পুষ্পবিকশিত চিন্তায় যে নানা উপমা

উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা অবশ্য অসংখ্য লোকের মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়; বিশেষত যারা চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে বাধাবিঘ্ন সহ্য করতে পারে না এবং এমন সব বিষয় ভাবতে চায় যাতে আরাম পায়, উত্তেজনা হয় না। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের কবিতা ও দর্শন সবই অলস লোকের মনকে মুগ্ধ করে—যেখানে কল্পনার প্রবলতা নেই, যেখানে দেবতার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ নেই। পাঠকের চিন্তা ও মনকে যা দ্বন্দ্বে আহ্বান করে না, যেখানে আছে শুধু একটি তৃপ্ত গুঞ্জন। এখানে কিছু কঠিন নেই, কর্কশ নেই। যে জগতে প্রাণীরা কাজ করে, দুঃখ ভোগ করে, যে জগতে সুখে দুঃখে বিস্ময়ে গলবদ্ধরজ্জু হয়ে মানুষ ঘুরে বেড়ায়, তাঁর কাব্য থেকে সে জগৎ কত দূরে! আমরা সন্ধ্যায় পদ্মভোজীদের তীরে পৌঁছই।'[১]

বলা বাহুল্য, এই সমালোচক রবীন্দ্রসাহিত্যের কণামাত্র পড়েছিলেন। যে চিরবিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ কুপ্রথা, কুসংস্কার ও জড়ত্বের অচলায়তন ভাঙতে দাঁড়িয়েছেন উদ্যত অস্ত্র নিয়ে, বুদ্ধি ও জ্ঞানের শৌর্যে ছুটিয়েছেন বিজয়-রথ নূতন উষার স্বর্ণদ্বারের সন্ধানে তার খবর এঁর জানা ছিল না। বলা বাহুল্য সুখে দুঃখে গলবদ্ধরজ্জু হয়ে বেড়ানোতে শক্তির পরিচয় নেই—সুখে দুঃখে মুক্তাত্মা থাকাতেই শক্তির গৌরব।

---

[১] *Saturday Review*, 27 Dec. 1913.

কাব্য ও কবি

১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলির পর গার্ডনার প্রকাশিত হয়। গীতাঞ্জলির ভক্তিরস ভক্তজনের মনকে স্পর্শ করেছিল, মন্দিরের দরজায় ধূপের সৌরভের মত তা ইয়োরোপের বস্তুজীবী মনের কাছে নূতন অচেনা জগতের সংবাদ এনেছিল। কেউবা এই বইকে বাইবেলের সঙ্গে, সলোমনের সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করেছিল। এবং রবীন্দ্রনাথের চেহারায় খৃষ্টের সাদৃশ্য দেখে ভক্তির প্রেরণাও পেয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যখন পাশ্চাত্য জগৎ তাঁকে প্রফেট ও সন্ন্যাসীর আসনে বসিয়ে ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত, তখন তিনি অনায়াসে ক্ষণিকার কবিতা অনুবাদ করে বললেন :

আমি হব না তাপস হব না হব না
যেমনি বলুন যিনি
হব না তাপস নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী।

একেবারেই প্রফেটের উপযুক্ত কথা নয়! যে সময়ে কাগজে কাগজে তাঁকে খৃষ্টের সঙ্গে, জন দি ব্যাপটিস্ট-এর সঙ্গে, কখনো বা টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনা চলেছে তখন কিনা তিনি বিনা দ্বিধায় ক্ষণিকার কবিতা অনুবাদ করলেন! স্বধর্ম সম্বন্ধে তাঁর এই সততা, ধার্মিকতার আড়ম্বরশূন্যতা, সকলকে বিস্মিত করেছিল সন্দেহ নেই। তিনি যে সাধু সাজ যাননি সে কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন তার প্রথম এবং প্রধান পরিচয় তিনি কবি। ঐ সময়ে জর্জ ক্রামকুক্ নামে এক কাব্য-সমালোচক লিখছেন :

“ঠাকুরের সঙ্গে টলস্টয়ের তুলনা করার এদেশে খুব ঝোঁক এসেছে, যেন দুজনেই অল্পবয়সের বহির্মুখী স্বচ্ছন্দচারী মনের বাসনা-কামনাকে পরবর্তী আধ্যাত্মিক জীবনে শোধন করে নিচ্ছেন। যে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মপথে পুনরাবর্তনের সঙ্গে টলস্টয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের মোড় ফেরার তুলনা করা হয়েছে কবির সেই গীতাঞ্জলির ভাবময় কবিতাগুলি Psalms of David-এর চেয়েও পবিত্র। এই কবিতা, যেন তাঁর যৌবনের ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হলেও ইন্দ্রিয়ানুগত কামনাময় কবিতাগুলির প্রায়শ্চিত্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে।”

বলা বাহুল্য, টলস্টয়ের সঙ্গে কবির জীবনের কোনোই মিল নেই—এবং ঈশ্বর জানেন 'গীতাঞ্জলি' 'কড়ি ও কোমলে'র প্রায়শ্চিত্ত নয়! যাঁরা কবির কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানেন তাঁরা জানেন যে তাঁর কোনো রচনাই পাপবোধসঞ্জাত নয়। খৃষ্টধর্মের এই পাপের ভয় সে ধর্মের একটি প্রধান ত্রুটিরূপেই তাঁর মনে হয়েছে। ভক্তি বা প্রেম সমস্তরই উৎস এক আনন্দে—'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে, আমায় নৈলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে—' ইয়োরোপীয় মনের কাছে এই প্রেম ও ভক্তির স্বচ্ছন্দবিহারী আনন্দলীলা খুব সহজবোধ্য ছিল না। তবু ক্রমকুক্ 'গার্ডনার' ও 'গীতাঞ্জলি' একত্র পড়ে যেন তার আভাস পাচ্ছেন। তিনি লিখছেন :

"মনে হয় ঠাকুর ধর্মের প্রবণতা ও বাসনার প্রবণতার (passion of the soul and passion of the senses) মধ্যে বিশেষ কোনো ফাঁক অনুভব করেন না—তাঁর মনের গভীরে এমন একটি ভাবের আবেগ আছে যা প্রেমের গানগুলিকে মৃত্যুর গানের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে।"[১]

দেহ ও আত্মা, প্রেম ও ভক্তি, জীবন ও মৃত্যু, এ সমস্ত বিপরীতের সমন্বয়েই যে পূর্ণতার অভিজ্ঞান কবির অনুভবের মধ্যে প্রকাশিত, সেই পরম সত্য সামান্য দু-একটি অনুবাদের কবিতা মাত্র পড়ে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন জীবনাবস্থায় খণ্ডিত চিন্তার আবেষ্টনে বদ্ধ থেকেও যাঁরা ধারণা করতে পেরেছিলেন তাঁদের মননা অসামান্য।

"টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেখানে পার্থক্য সেখানেই তিনি আমাদের মনোহারী। টলস্টয়ের যখন জীবনের পরিবর্তন ও শোধন হল তখন পূর্বজীবনকে ও সেই সঙ্গে অনেক পরিমাণে তাঁর পূর্বজীবনের কাজকেও ধিক্কার দিলেন। কিন্তু এই হিন্দুর ঐশ্বর্যময় আত্মা এক অবিচ্ছিন্ন পরিণতি লাভ করেছে। তিনি তাঁর জীবনের কর্মকে প্রত্যাহার করতে চান না বা যৌবনের রচনাগুলিও আড়াল করতে চান না। তিনি স্পষ্টই বলছেন—'আমি কেবল মাত্র গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি দিয়েই ইংরেজি ভাষায় আমার পরিচয় দিতে চাই না।' যিনি একথা বলে গার্ডনারের কবিতাগুলি প্রকাশ করেছেন তাঁর পরিহাস-রসবোধ শ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখকদের থেকে এজরা পাউন্ড পর্যন্ত কারো চেয়ে কম নয়।"

Gospel of Joy এই নামে একটি প্রবন্ধে টলস্টয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে একজন রসজ্ঞ উভয়ের জীবনদর্শনের একটি মূল পার্থক্যের কথা আলোচনা করেছেন।—"এমন একটি মানুষের সঙ্গে দেখা হলে মন যেন

---

[১] *Evening Post*, Chicago, Nov. 21, 1913.

তাজা হয়ে ওঠে, যার বিশ্বাস করবার এবং জোর করে বলবার সাহস আছে যে আনন্দেই সকল সৃষ্টি উদ্ভূত হয়ে আনন্দেই বিধৃত হয়ে আনন্দের দিকেই প্রবাহিত এবং আনন্দেই প্রবিষ্ট হচ্ছে। এই আনন্দচেতনা পাপ-বোধের বিপরীত।” পাপের কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যের উপর কোথাও ভর করেনি অথচ তা আত্মার সঙ্গীত শোনাচ্ছে, পশ্চিমের কানে এ তাই বিশেষ নূতন হয়েই প্রবেশ করেছে। অন্যত্র কবি ইয়েট্‌সও বলেছেন :

“ঠাকুরের লেখার স্টাইলের সঙ্গে যখন ইয়োরোপীয় কোনো লেখকের লেখার তুলনা করতে চাই তখন আমার ‘ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট’ বইটির কথা মনে পড়ে—তবু এই দুজন লেখকের লেখায় দুই মেরুর ব্যবধান। টমাস একেম্পিস পাপবোধে ভারাক্রান্ত কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে পাপের চিন্তা কিছুই নেই, যে শিশু লাটিম নিয়ে খেলছে তারই মত তিনি পাপ সম্বন্ধে উদাসীন।”

গীতাঞ্জলির কবিতা ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবে চতুর্দিকে যেন বিশেষ একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। ধার্মিকরা বারবার তাঁকে খৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করছেন :

“তাঁর এই যৌবন-উজ্জ্বল আকৃতিতে গ্যালিলির সেই কবির শ্রেষ্ঠ ছবি-গুলির সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে- সেই কবি, যিনি একটি লাইনও কবিতা লেখেননি কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণীর কবিত্ব-মহিমায় জগৎ আলোকিত করেছিলেন।”

পশ্চিমের দেশগুলি গুরুতে-পাওয়া নয়—তবু আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে তারাও কাষায়বস্ত্রকে এক করে ফেলে। বিশেষত তাদের ধর্মবোধের তলে তলে পাপের চিন্তা গহ্বর সৃষ্টি করে চলে। গীতাঞ্জলির কবিতার ভক্তি-ভাবনার সঙ্গে ক্ষণিকার কবিকে মিলিয়ে দেখলে যে অনুভবের পূর্ণতা, জীবনের সমগ্রতা, ভাবনার একদেশদর্শিতা থাকলে সে কথা সহসা লক্ষ্য হয় না। যে কোনো কালেই, যে কোনো দেশেই কাষায়বস্ত্রের সুবিধা কম নয়। তবু ক্ষণিকার কবিতা প্রকাশ করলেন সেই সময়ে যে সময়ে ক্রিশ্চান জগৎ তাঁকে খৃষ্টের সঙ্গে তুলনা করছে। তখন কবি অনায়াসে ডেকে বললেন

শপথ করে দিলাম ছেড়ে আজই
যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা
বিদ্যা যত ফেলব ঝেড়ে ঝুড়ে
ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা!
ভদ্রলোকের তক্‌মা তাবিজ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দেব মদোন্মত্ত হাওয়া

শপথ করে বিপথ ব্রত নেব
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া!

কিংবা :
চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধু বুদ্ধি বহির্গতা—
আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্যকথা।

জীবনদৃষ্টির এই রসবোধ বিদেশী পাঠকদের চমৎকৃত করে দিল। কবি যেন ইঙ্গিতে ডেকে বললেন, দোহাই তোমাদের ভুলে যেও না, আমি ধর্ম-প্রচারক নই, আমি কবি।...'গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান, শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান!'

ক্ষণিকার কবিতাগুলি ঐ বিশেষ সময়ে প্রকাশ করার মধ্যে কবির চির-কালের রহস্যপ্রিয়তার চমক দেখা যায়।

ক্রিশ্চান জগৎ বিস্মিত হয়ে ভাবছে—পাপবোধ নেই, অনুতাপ নেই, অথচ ধর্মবোধ কি করে জাগে?

"I miss the cross in his teaching yet he breathes the very love of god . ."[১]

তাঁর কাব্যে ও ধর্মসঙ্গীতে দুঃখবাদ ও পাপবোধ নেই অথচ তাতে ভক্তি ও পূজার সৌরভ উঠছে—শাস্ত্রপ্রথাবদ্ধ মধ্যযুগীয় মনের কাছে এর বিস্ময় [illegible] না।

গার্ডনারের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৯১৩ সালে একটি ইংরেজি কাগজে এজরা পাউন্ড লিখছেন ·

"শ্রীযুক্ত ঠাকুর এসেছিলেন ও চলে গেছেন- তাঁকে ঘিরে জেগেছে কত কান্না কত প্রার্থনা। এরা তাঁকে অ্যাকাডেমিতে পদ দিতে, রাজকবির পদ দিতে চেয়েছে। তিনি অনেক নির্বোধকে ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেছেন এবং যেমন নীরবে এসেছিলেন তেমনি নীরবে চলে গেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে তাঁর 'নিজের প্রাধান্য সম্বন্ধে নিজের কোনো অতিরঞ্জিত ধারণা নেই।' শেষ যেবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, দেখলাম নিজের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রথমবারে যেমন ছিল তেমনি আছে, তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'এই অনুবাদগুলির মধ্যে তোমরা কী পেয়েছ?' যদি তাঁর ভক্তরা ইংরেজি সাহিত্যের [illegible] সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দানের তুলনা করে এক ক[illegible] বলে থাকেন [illegible] নিজে তা কখনই করেন নি। যদি তাঁর এই পরি[illegible] তাঁকে শিল্পীরূপে না দেখিয়ে

STATE CENTRAL LIBRARY
73457
৪|৪|৮১

---

[১] *Young Man*, July, 1914.

ধর্মপ্রচারকরূপে দেখিয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই দুঃখের বিষয়। সেই লেখক, যাঁর কণ্ঠে ভলটেয়ারের কাছে যা আশা করা যায় প্রায় ততগুলিই বিভিন্ন ধ্বনি বাজে, সেই কবি, যাঁর পরিহাস-রসবোধ প্যারিসের লেখকদের মতই সুকুমার, তিনি নিজেই বলেছেন—'আমি ইংরেজি ভাষায় শুধু গীতাঞ্জলিতেই আমার পরিচয় দিতে চাই না।'"

গার্ডনারের কবিতাগুলির সঙ্গে ফরাসী কবিতার কৌতুক-চমকের সাদৃশ্য উল্লেখ করে ও গীতাঞ্জলির কবির লেখনী থেকে ঐ কবিতাগুলি প্রকাশ হওয়ায় লোকের বিস্ময়ের উল্লেখ করে ঐ প্রবন্ধের লেখক লিখেছেন: "আমার কাছে অবশ্য এ এক দুর্বোধ্য রহস্য রয়েই গেল যে, কেন এই দ্বীপ-বাসী সৎলোকেরা এমন একজন পরম শিল্পীকে শুধু তিনি শিল্পী বলেই সম্মান দেখাতে পারে না! কেন যে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য তাঁর জীবনকে তুলোয় মুড়ে নীতিধর্মের প্রতীকরূপে ধ্বজা তুলে নিয়ে বেড়াতে হয়! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেই ফূর্তিবাজ বুর্জোয়া ধার্মিক আব্দুল বাহার সঙ্গে যেন কেউ এক না ভাবে কিংবা কোনো থিয়োসোফিস্ট প্রচারকের সঙ্গেও এক না ভাবে--আর রহস্যময় পূর্বদেশের সাতাত্তর রকম ধর্মমতের কোনো একজন প্রচারকও না ভাবে।"

বস্তুত ঐ দ্বীপবাসী সৎলোকদের এজন্য বিশেষ দায়ী করা যায় না। ধর্মাচরণ ও জীবনভোগ এই দুই অধ্যায়কে জীবনের দুই প্রান্তে ভিন্ন কাঠ-গড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে প্রায় সব দেশেই। বিচিত্র অনুভূতিতে রঞ্জিত ঐশ্বর্যবান প্রাণের আনন্দবাণীতে মানুষের সত্যধর্মের যে নিত্যপ্রকাশ, রবীন্দ্র-জীবন ও -গানে তারই পূর্ণ উৎসরণের অভাবনীয়ত্ব তাঁর স্বদেশেও দুর্বোধ্য ঠেকেছে সন্দেহ নেই।

গীতাঞ্জলি প্রকাশের কিছু পূর্বে র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে এসে-ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গিয়ে সে সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইংল্যান্ডের নানা দৈনিক ও মাসিক পত্রে তা নিয়ে আলোচনা হয়। এই প্রবন্ধে কবির কর্মকল্পনার মধ্যে শুধু তার ধর্মজীবন নয়, জীবন-ধর্ম কিভাবে প্রকাশিত তার একটি অভূতপূর্ব কাহিনী ইংরেজিভাষী জগতের কাছে এক অজ্ঞাতলোকের সংবাদ এনেছিল। র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড লিখছেন:

"দিল্লী থেকে কলকাতার পথে আমি শান্তিনিকেতনে একদিন কাটিয়ে ছিলাম। এইরকম একটি প্রতিষ্ঠানে গেলে কী রকম যে একটা ভাবে অভিভূত হতে হয় তা পরিষ্কার করে বোঝানো যায় না। সেখানে সরকারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের কর্মীরা কর্মচারী নয়, তাদের ব্যবস্থাও যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা নয়। সেখানে স্বনির্ভর ভারতের স্বতঃস্ফুরণ।

বিদেশী কোনো কিছু চাপিয়ে জবরদস্তি বা উৎখাত করার চেষ্টা নেই।... শান্ত স্মিত মুখে কবি আমাকে বললেন, 'ওরা আমার ছেলেদের বেঞ্চিতে বসাতে চায়—কিন্তু আমি মনে করি যে মাদুরে বসাই ভালো। অতএব আমার প্রতি ভ্রূকুটি ঘনিয়ে আসে, পুলিসের খাতায় নাম ওঠে।'..."

ম্যাকডোনাল্ড আরো লিখেছেন: "অতি প্রত্যূষে আমার ঘুম ভেঙে গেল—তখন প্রভাত হয় নি, শুধু অন্ধকারের সীমারেখায় আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে মধুর গীতধ্বনি আমার কানে এল—আমি শুনলাম যে অতি প্রত্যূষে ছেলেরা স্তবগান ক'রে, আশ্রম প্রদক্ষিণ ক'রে, দিন শুরু করে এবং শেষ করে। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে ধ্যানে বসে—আর সপ্তাহে দুদিন তারা মন্দিরের সমবেত প্রার্থনায় মিলিত হয়। কবি তাদের উপদেশ দেন—সৎ জীবন যাপনের পথ দেখান।"...

"...এ ছাড়া শান্তিনিকেতন কেবলমাত্র ছেলেদের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। ভারতবর্ষের প্রাণপ্রবাহে এ প্রাণিত। শান্তিনিকেতন বহির্জগতের খবরও রাখে, ভারতের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গেও সে যুক্ত। বর্তমানে এই বিদ্যালয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়েছে। আমাকে তাঁরা ছেলেদের কাছে কিছু বলতে বলেছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী বিষয়ে তাঁরা শুনতে ইচ্ছুক। তাঁরা বললেন, আমাদের বলুন জনসাধারণের শিক্ষাপ্রণালী কীরকম হওয়া উচিত। বস্তুত তাঁরা নিজেরাই কার্যের দ্বারা এই প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিলেন এবং আমাকে দেখাচ্ছিলেন কী করে একাজ করতে হয়। আমি গাছের তলায় একটি মনোহারী দৃশ্য দেখেছিলাম। শান্তিনিকেতনের চারপাশের গ্রামগুলিতে সাঁওতালদের বাস। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐসব গ্রামে মাঝে মাঝে ব্যাটবল নিয়ে যায় ও আপন মনে খেলা শুরু করে দেয়। খেলা খানিকক্ষণ চলতে থাকলে চারিদিকে আস্তে আস্তে যখন ভিড় জমে যায়, ছেলেরা তখন খেলা থামিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে, গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে—এইভাবে একটি সান্ধ্য স্কুলের শুরু হয়—এবং ছাত্ররাই সেখানে শিক্ষা দেয়—যেদিন আমি সেখানে ছিলাম সেদিন বার জনের মত ছাত্র এসেছিল এবং গাছের তলায় তাদের শিক্ষাসত্র চলেছিল। Stereoscope দেখিয়ে গ্রামবাসীদের প্রফুল্ল করবার পর, কী দেখল তারই বিশদ ও নিখুঁত করে বর্ণনা করতে বলা হয়েছিল। দুটি বালক তাদের বিশেষভাবে চালনা করছিল। দেশের প্রতি, মাতৃভূমির উদ্দেশে, এই তাদের অর্ঘ্য, এই তাদের পুনর্জন্মিত (reincarnated) স্বদেশের সেবা।"...

"...আমি যখন চলে আসি তখন তারা ছাতিমগাছের তলায় মাদুরের

আসনে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে দল বেঁধে বসে ছিল। তাদের পাশে ছিল বই, মাঝখানে বসে ছিলেন শিক্ষক। চারিদিক শান্তিপূর্ণ, সুন্দর, প্রফুল্ল। আমি তাদের ফেলে আর-এক জগতে চলে এলাম যেখানে অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ পড়া উপযুক্ত ও সুবুদ্ধি শিক্ষকেরা ঘর্মাক্ত কলেবরে কামারের মত জগদ্দল হাতুড়ি পেটাচ্ছেন ভারতীয় মনকে অদ্ভুত এন্‌ভিলের উপর রেখে, অদ্ভুত আকারে বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে নেবার জন্য।...”[১]

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের এই প্রবন্ধ কেবল যে কবির কর্মোদ্যমের খবর দিয়েছিল তা নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের প্রতিফলনে, তার কাব্য ও জীবনের নিগূঢ় সামঞ্জস্য প্রকাশ করেছিল। একটি পত্রিকা এই রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করে লিখছে—‘আমার পাঠকদের বলাই বাহুল্য শান্তিনিকেতনের এই ছবির সঙ্গে কবির রচনার কী নিগূঢ় ভাবসামঞ্জস্য রয়েছে—’

অবশ্য এই সামঞ্জস্য বোঝাবার ক্ষমতা যে সকলের ছিল তা নয়—ভোঁতা কলমের অভাব ছিল না। Stray Bird-এর সমালোচনা উপলক্ষে পিয়ার্সন সাহেবের শান্তিনিকেতন স্কুল সম্বন্ধে প্রবন্ধটির উপর ব্যঙ্গ করে থিয়োডোর নামে এক ব্যক্তি লিখছে,—

“মিস্টার ডব্লিউ পিয়ার্সন আমাদের বোলপুর স্কুলের বর্ণনা দিয়েছেন, মনে হয় সেখানে সূর্যোদয়ের পূর্বে একদল গাইয়ে কবির কোনো একটি গান গেয়ে বালকদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। হতভাগ্যরা! যাই হোক, যে লোক এই ভয়ানক নিষ্ঠুর (hedious) যন্ত্রণা দেবার কৌশল আবিষ্কার করেছিল তার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে—আমি শুনেছি ব্যাটারসিয়ার পাবলিক লাইব্রেরিতে তার নাম লেখা আছে ‘ব্যাগোর’, বেশ উচিত সাজা হয়েছে।”

ভারতীয় নাম উচ্চারণে, বিশেষত প্রাচ্যশব্দের ধ্বনিতে অনভ্যস্ত ইংরেজের কান ভারতবর্ষের নামের যে নানা সংস্করণ করেছে তাতে তার জন্মপরিচয়ের সম্পূর্ণ বিলোপ করেও সন্তোষ হয়নি। ঠাকুরকে ‘টেগোর’ করা তারই একটি নিদর্শন, তবু তাতেও স্বস্তি নেই। যে নামই আমরা উচ্চারণ করতে পারি না—এমন একজন কিনা নোবেল প্রাইজ পেল এ নিয়ে অনেক হা-হুতাশ কাগজে পড়া যায়।

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তিনি একজন ‘বেঙ্গলীসি’ (Bengalisee) কবি! তিনি নিজেই নিজের রচনার অনুবাদ করেন। এই প্রথম একজন এ পুরস্কার পেলেন যাঁর রং আমাদের মত সাদা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! এমন একটি নামের কোনো ব্যক্তি যে সাহিত্যে পৃথিবীর

---

[১] *Public Opinion, Jan. 10, 1914*

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবে এ সত্যের সঙ্গে মন মিলিয়ে নিতে আমাদের সময় লাগবে—কারণ আমাদের কি বলা হয় নি যে পূর্ব ও পশ্চিম কখনো মিলতে পারে না। নামের উচ্চারণের ধ্বনিও অদ্ভুত। প্রথম যখন ছাপার অক্ষরে এ নাম দেখি এটি বাস্তব বলে মনে হয় নি।”[১]

আর-একটি কাগজ লিখেছে : “ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ও যশ এমন সব লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যাদের তাঁর বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে অথচ তাঁর সম্বন্ধে এখনও কোনোই ধারণা নেই। একটা নামকরা লন্ডন লাইব্রেরিতে নানা লোক নানা অদ্ভুতভাবে তাঁর বই চেয়ে পাঠিয়েছে। লিখেছে—“আমাকে অনুগ্রহ করে ইহুদি লেখকের লেখা গীতাঞ্জলি এক-খণ্ড পাঠাবেন—” বা “আপনাদের কাছে রুশ ঠাকুরের শেষ বইটি আছে কি”—কিংবা “আরব কবির গানের বই গীতাঞ্জলি একটি পাঠাবেন!” এই উদ্ধৃতিগুলি পড়ে কাগজটি লিখছে—“যদি শ্রীযুক্ত ঠাকুর এসব মন্তব্য শোনেন তাহলে সম্ভবত তিনি আমোদ পাবেন, কারণ তাঁর মধ্যে এমন একটি শান্ত কৌতুকবোধ আছে, যা এতই শান্তিপূর্ণ যে (নামখ্যাতি সম্বন্ধে) প্রায় উদাসীন।”[২]

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণের কাছে বাংলা দেশের যে পরিচয় প্রচারিত হয়েছিল তার প্রভাব সহজে দূর হয়নি। কিপলিং, মেকলে ও রবীন্দ্রনাথ—এ তিন নামের তুলনামূলক বহু প্রবন্ধ, মন্তব্য ও আলোচনা কাগজে কাগজে কোলাহল তুলেছিল। সেই সময়ে একজন লিখছেন :

“পূর্ব পূর্বের মত ,আর পশ্চিম পশ্চিমের মত—এবং এ দুয়ের কখনো মিল হবে না।”

“আমাদের যুগে আর কোনো উদ্ধৃতি এমন জোর করে খুঁচিয়ে মাথায় ঢোকানো হয় নি—এই কবিতার ভক্তদের মুখে তাই এটি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের নিশ্চিত বিলোপ করে মানসিক জড়তার একটি সুন্দর ছুতো হয়েছে।... যাঁরা প্রাচ্যদেশের গভীর প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছেন তাঁরাও যদি বলেন এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে সেতু বাঁধা যায় না, তবে তা শোভন হয় না। তাই যদি হত তবে বাইবেল অজ্ঞাত থাকত। কারণ বাইবেল ইংরেজি গদ্যে আমরা পাঠ করি বটে কিন্তু মূলে সে তো হিব্রু কবিতাই। যুগ যুগ ধরে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনেই সুফল ফলেছে, বিচ্ছেদে নয়।”...

“...অনেকরূপেই পূর্বদেশের প্রভাব ধীরে ধীরে পশ্চিমের মনে প্রবেশ করেছে, কিন্তু গত কয়েক দিন হল সাধারণ লোক যারা এসব দিকে বড়

---

[১] *Globe Torento*, Canada, Jan. 26, 1914

[২] *Daily Citizen*, Feb. 1914.

একটা লক্ষ্যই করে না, তাদেরও দৃষ্টি এই কবির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে—তিনি এই দুই সভ্যতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মনগুলির উপর জাদুমন্ত্র বিস্তার করেছেন। যাঁরা মেকলের বই পড়ে ধারণা করে বসে আছেন যে বাংলা দেশে ‘বাবু ইংরেজি’র চেয়ে আর ভালো কিছু লেখা হয় না, নোবেল প্রাইজের বিচার তাঁদের বড়ই আঘাত দেবে—কারণ এই বাঙালী কবি এমন ইংরেজি গদ্য লিখেছেন যার সুকুমার মাধুর্যের তুলনা বেশী নেই! রসজ্ঞেরা লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর গীতিকাব্যের সঙ্গে বাইবেলের ‘সলোমনের সঙ্গীত’ অংশের সাদৃশ্য আছে।”[১]

বার বার বাইবেলের ভাষার সঙ্গে গীতাঞ্জলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে উল্লেখ করা হয়েছে—“It has a close resemblance to the poetic prose of the Old Testament.”

বস্তুত কিপলিং-এর বাঙালী চরিত্র চিত্রণের পটভূমির উপর হঠাৎ রবীন্দ্রকাব্যের মহিমার স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা মানুষের মনকে যে অভাবনীয় বিস্ময়ে ভরে দিয়েছিল শতমুখে তা বলেও ফুরাতে চায় নি।

একটি কাগজে লিখছে : “...এবং তারা (রবীন্দ্রনাথের কবিতা) ভুল ভেঙে দেয়। শ্রীযুক্ত কিপলিং-এর রচনা ও সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতি ইংরেজ মনের উপর ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তুলেছিল তা কঠিন বর্ণোচ্ছ্বাস, বিস্তৃত প্রান্তর—নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা, সতী, বোমা ও প্লেগ—এইসব জড়িয়ে এমনই একটা আকৃতি নিয়েছে যে ভারত-ভ্রমণকারী শ্বেতবর্ণ মানুষ সাদা ও মেটে রঙের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান অনুভব না করে পারে না। কবি সেতু বাঁধলেন, যে কেউ তাঁর কাব্য পড়েছে—সে আর কখনো ভারতবর্ষকে পূর্বের দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।”[২]

এ যে কী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রমণ, এ যে রামের সেতুবন্ধনের চেয়েও দুষ্কর এবং এ কার্যে তখন যে বিশেষ কোনো কাঠবিড়ালীও সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি, সেসব ঐতিহাসিক তথ্য সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে হয়ত বিস্মৃত হয়ে যাবে—অবশ্য, আশা করা যায় সেতু থাকবেই এবং অগণ্য মানবের যাতায়াতে তা মসৃণ হয়ে উঠবে।”

দৃষ্টির এই বদল মনের মোড় ফিরিয়ে দিল। শিক্ষিত ইংরেজ সহসা বুঝতে পারল ভারতবর্ষের স্বাদেশিকতা তুচ্ছ করবার নয়। ১৯১৩ সালের পোয়েট্রি রিভিউ লিখছে : “এ পর্যন্ত ভারতীয় স্বাদেশিকতার অনুকূলে যত যুক্তি শোনা গিয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সবচেয়ে বড় যুক্তি—Rabindranath Tagore is the strongest argument in favour of

---

[১] *Northern Colling*, Nov. 1913.

[২] *Boston Transcript*, Nov. 1913.

Indian nationalism that we have yet encountered." এর প্রায় ১৬/১৭ বৎসর পর আমেরিকাবাসী মনীষী উইল ডুরান্ট তাঁর The Case for India বইখানি কবিকে উপহার দিয়ে লেখেন : "You alone are sufficient reason why India should be free." সাম্রাজ্যলোলুপ দণ্ডপাণি ইংরেজ তখন সে বই এদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি। কিন্তু তার নিজের দেশের বহুপূর্বের একখানা পত্রিকার পাতায় ঠিক অনুরূপ উক্তিটি যুক্তিবাদী সত্যদর্শী ইংরেজ মনের স্বাক্ষর বহন করে রেখেছে এবং প্রমাণ করেছে কবির উল্লেখিত একটি সত্য যে. ভারত-শাসকরূপী ছোট ইংরেজ ও স্বাধীনচিত্ত ন্যায়নিষ্ঠ বড় ইংরেজ, ইংরেজ জাতির দুই পৃথক রূপ।

ঐ পত্রিকাটি আরো লিখেছে : "এই কবি তাঁর আকৃতির রেখায় রেখায় আপন অজ্ঞাতে যে কথা বলেন সেই কথাই সেদিন মুখেও বললেন। তাঁর সম্মানে আহূত নিমন্ত্রণসভায় জাতীয়তা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইংল্যান্ডে তিনি যে সহৃদয় সংবর্ধনা পেয়েছেন তারই উল্লেখ করে তিনি বললেন :

'আমি জানি যে যদিও আমাদের ভাষা পৃথক এবং আমাদের অভ্যাস পৃথক তবু অন্তরের গভীরে আমরা এক। নীল নদের তীরে যে বর্ষার মেঘ পুঞ্জিত হয় সুদূর গঙ্গার তীরকে সেই তো উর্বরা করে। ভাবকে পূর্ব তীর থেকে পশ্চিম তীরে যাত্রা করতে হয় মানুষের হৃদয়ে স্থান পেয়ে সার্থক হতে। পূর্ব পূর্বই এবং পশ্চিম পশ্চিমই. এবং ঈশ্বর করুন তার যেন অন্যথা না হয়, কিন্তু এ দুই-এর নিশ্চয় মিলন হবে, একতায়. শান্তিতে. সমবোধে।'

'পোয়েট্রি রিভিউ' কবি ইয়েটস প্রভৃতির নানা মন্তব্য উল্লেখ করতে করতে বলছে :

"আমাদের মধ্যে এসে ভারতীয় কবি তাঁর ভারতীয় প্রতিভা ও ভারতের বাণীর জন্যই যখন সম্মান ও সমাদর পেলেন এতে নিশ্চয় মনে হয় ইংরেজদের ভারতের প্রতি মনোভাবেব একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতীয় প্রতিভার পূর্ণ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা ও সমাদব করায় আমরা পরোক্ষভাবে এ কথা স্বীকার করেছি যে, ভারতীয় ন্যাশনালিস্টদের কথার যৌক্তিকতা আছে—এবং সে কথা স্বীকার করলে আমাদের অনুসন্ধান করা কর্তব্য--ভারতীয় প্রতিভার প্রকৃতি কী. ভারতের দানই বা কী।"...

"রবীন্দ্রনাথ ও কিপলিং-এর মধ্যে প্রভেদ নিয়ে আলোচনাই বাহুল্যমাত্র। মনে হয় যেন কিপলিং-এর প্রসিদ্ধ লাইন—'east is east and west is west and the twain shall never meet.' এই কথাটির প্রতিবাদ-রূপেই যেন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ইনি সেই জাতির প্রতীক যাদের

সভ্যতা যে আমাদের চেয়ে শুধু পৃথক তা নয় একেবারে বিপরীত, সংক্ষেপে বলতে গেলে তাদের হল ধ্যান ও আমাদের হল কর্মশক্তি। তবু যেই তাঁর কণ্ঠস্বর পশ্চিমের কানে প্রবেশ করল তারা চিনতে পারল, তারা শুনল, যেন তাদের আপন আত্মারই স্বর, আপন চিন্তার প্রশান্তির মধ্যে উদ্ঘোষিত। তাঁর কাব্যের ভাব চিরদিনের চিরযুগের ভাবের চেয়ে পৃথক নয়—তারা পুরাতন, তবু তাঁর হাতে তারা যেন সদ্য-ফোটা ফুলের উপর শিশিরের মতই তাজা।”[1]

এই শেষের পংক্তিটির মতই অনেক জায়গাতেই আমরা দেখি সে সময়ের বহু রচনার উপর কবির ভাষা, ভাব ও উপমার প্রভাব পড়েছে। এ নিয়ে বিদ্রূপও কম হয় নি। কোনো সমসাময়িক ইংরেজ কবির কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব লক্ষ্য করে কেউ বা লিখেছে—‘এ ব্যক্তির কিন্তু একটি নয় বহু নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত!’ এমনকি এজরা পাউন্ডেরও কোনো কোনো কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়ায় তাকে ব্যঙ্গ শুনতে হয়েছে।

গার্ডনারের সমালোচনা গীতাঞ্জলির পটভূমিতে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তারপর থেকে চিত্রা, স্ট্রে বার্ডস্, ছোট গল্প, সাধনা ইত্যাদি প্রত্যেকটি বই ইংল্যান্ডের প্রত্যেক কাগজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়েছে। কতগুলি সমালোচনা এক-একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য। নানাভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত মন রবীন্দ্রকাব্যের ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়েছে, তাঁর ভাবনার সূক্ষ্ম স্বর্ণজালের উপর লঘুচরণে স্বচ্ছন্দবিহার করেছে। প্রতিকূলতাও যে কিছু জাগে নি তা নয়—এখানে সেইসব সমালোচনার দুদিক থেকেই সামান্য কিছু উদ্ধৃত করব। বিস্তৃত উদ্ধৃতিতে একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ হতে পারে।

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির ইংরেজি অনুবাদের বিস্তৃত আলোচনা করে লিখেছে : “এই রূপকথা ও উপকথাগুলো সব ‘সত্যি গল্প’। তার অর্থ হচ্ছে গল্প বলার ক্ষমতা মনকে ব্যগ্রতায় পূর্ণ করে, বিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলে। গল্প বলার সময় অনেক দুর্লভ এবং ক্ষিপ্রগতি মনের গুণ প্রকাশ পায় যা সাধারণ অবস্থায় চাপা থাকে।...”

এর পর কয়েকটি গল্প ও ‘ক্ষুধিত পাষাণে’র আলোচনার পর সমালোচক লিখেছেন : “(ক্ষুধিত পাষাণ) উপকথাটির চেয়েও ‘তাসের দেশ’ রূপকথাটি ভালো। এই গল্পের ভাবটি নিশ্চয় ঠাকুরের ইংল্যান্ড সম্বন্ধে ধারণার স্মৃতি থেকে উদ্ভূত (must surely have grown out of impressions of England)।

---

[1] *Manchester Guardian*, Dec. 6, 1913.

"একজন সত্য রাজা তন্দ্রাচ্ছন্ন দ্বীপে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন প্রেম ও গান—'আশ্চর্য স্তব্ধতা এবং শান্তি, পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ—পথে ঘাটে গৃহে সকলেই সুসংযত সুবিহিত। শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই, আছে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম—' কিন্তু তরুণ রাজপুত্র এলেন ও অবশেষে তাঁর বধূকে পেলেন—তারপর রাজ্যের প্রজারা ছবির দল থেকে মানুষ হয়ে গেল 'এখন সকলে অলক্ষ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।' অত্যাশ্চর্য কৌশলে ব্যঙ্গে কৌতুকে সত্য নির্দেশ করে প্রজ্ঞাবান কবি যা বলেছেন তা কিপলিং-এর উপযুক্ত উত্তর।"

সকলেই জানেন 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি গল্পগুচ্ছে 'একটি আষাঢ়ে গল্প' এই নামে প্রকাশিত একটি কথিকা অবলম্বনে লিখিত। ঐ গল্পটি ১২৯৯ সালে লিখিত। তারপর ১৩৪৫ সালে নৃত্যনাট্যরূপে পুনঃরচিত ঐ গ্রন্থিকা সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গিত হয়েছে। উৎসর্গপত্রে লেখা আছে—"স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' উৎসর্গ করলুম।" 'তাসের দেশ' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে সে মনু-শাসিত, জড়-প্রথাবদ্ধ আমাদের এই জম্বুদ্বীপ, যেখানে বিদেশ থেকে পাশ্চাত্য জগতের সোনার কাঠি নিয়ে রাজপুত্র প্রবেশ করলেন, ঘুমন্ত প্রাণে জাগিয়ে তুললেন স্বাধীন চিন্তা। কবির উৎসর্গপত্রও আমাদের ধারণাকে সমর্থন করে। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শ বাংলা দেশের চিত্তকে কেমন করে উর্বরা করে তুলেছে সেই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে লিখছেন : "বঙ্কিম আনলেন সাত সমুদ্র পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার শিয়রে...যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো মনে করে তারা বলবে ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী, কিন্তু বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়, সে যে আমাদের আপন প্রাণ—"

কিন্তু 'তাসের দেশ' পড়ে যে কোনো ইংরেজও মনে করতে পারে ঐ বর্ণিত দ্বীপটি তাদেরই জলবেষ্টিত জন্মভূমি তা আমাদের মনেই উদয় হত না—প্রাণদৃপ্ত, কর্মকুশল, উৎসাহী ইংরেজ জাতি, তাদের দেখে কবির কেনই বা মনে হবে যে তারা তাসের দেশের মানুষ? সমালোচকের উদ্ধৃত দুটি অংশ থেকে তার কারণ কতকটা অনুমান করা যায়। ইংরেজের আইন-আনুগত্য সম্বন্ধে সারা ইয়োরোপে ব্যঙ্গোক্তি বর্ষিত হয়। তাই নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি ইংরেজের অত্যধিক অনুরাগ, সুসংযত সুবিহিত রীতিবদ্ধ জীবন জাতির প্রাণের সজীবতা নষ্ট করে দিয়েছে, ইচ্ছামত কাজ করবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে, কবি এইরকম ইঙ্গিত করেছেন বলে ইংরেজ সমালোচক

ধারণা করে বসে আছেন—যাক, কবি এক মনে করে লেখেন আর, 'কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার, কেহ এক বলে কেহ বলে আর।'

'স্ট্রে বার্ডস' বইটির অনেক মনোজ্ঞ সমালোচনার মধ্যে একটি ছোট্ট অংশ উদ্ধৃত করছি :

"সাধারণত লোকে সাহিত্যে বাহুল্যের চেয়ে সংক্ষেপই পছন্দ করে—যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যাঁরা বলেন তাঁর কবিতার ধোঁয়াটে মধুর হাওয়ায় তাঁদের মানসিক শ্বাসরোধ হয় তাঁরা স্ট্রে বার্ডস পড়ুন।—আমি এর মধ্যে একটি উপযুক্ত 'স্ট্রে' উক্তি উদ্ধৃত করছি—Truth in her dress finds facts too tight, in fiction she moves at ease.—এই ছোট্ট বাণীটিকে আর কোনো সংক্ষিপ্ততর কথায় বোঝানো যায় না। অনেক মানুষ আছেন যাঁরা একেবারে যথাযথ ও সঠিক তথ্যের বন্ধনে আটকে থাকলে সত্য বলতেই পারেন না। তাঁরা পরিহাসে কৌতুকে অতিরঞ্জনে বা কল্পনার সাহায্যে তাঁদের সত্য মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন, আর কোনো উপায়েই নয়। জীবনী লেখবার সময় এই লেখকের (অর্থাৎ Spectator কাগজের লেখকের) অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে জীবনী রচনার একটি নূতন সাহিত্যরীতির কখনো কি প্রচলন হবে যাতে জীবনীর মধ্যে কল্পনার স্থান হবে? একজন মানুষের জীবনের জানবার যোগ্য যা কিছু তা গল্পচ্ছলেই লেখা চলে—জীবনের বৃত্তান্ত মাত্রই গ্রথিত হবার মত মনোহারী নয় এবং সেগুলি যখন খবর হিসাবে জড়ো করে রাখা হয় তখন তাঁদের ব্যক্তিত্বকে তারা ছোট করে ফেলে। অনেক সময়তেই মানুষটির ছবি লোকে দেখতে চায়, ইতিবৃত্ত চায় না। অনেক সময় ঘটনার তালিকার বন্ধন থেকে ছাড়া পেলে তবেই সত্য স্বচ্ছন্দচারী হতে পারে।"[১]

এইভাবে স্ট্রে বার্ডস্-এর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা চলেছে, এখানে শুধু এই একটির উল্লেখ করা গেল—কারণ জীবনী প্রসঙ্গে এই কথাটি আজ সত্য হয়েছে—অনেকেই জীবনবৃত্তান্ত সাহিত্যরূপে প্রকাশিত করে মানুষটির ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন—তা নৈলে লিখে কী হয়? খবরের তালিকা পাওয়া যায়, মানুষটি মেলে না—কবিরে পাবে না কবির জীবনচরিতে!

'দৃষ্টিদান' গল্পটির একটি ছোট্ট সমালোচনা লক্ষ্য করবার মত, "প্রাচ্য-রীতি অনুসারে বিবাহবিধির যে মূল্য, তার ভিতর এ গল্পটির অর্থ নিহিত। কিন্তু কিপলিং যদি এই একই গল্প লিখতেন তাহলে যে স[illegible]দর্শী ভাবে অবহেলার সঙ্গে লিখতেন এ তো তেমন নয়। বিবাহের সেই বিশেষ

---

[১] *Spectator*, 24. 3. 1917.

প্রাচ্য মূল্যবোধ গল্পটির মধ্যে অতি সহজেই প্রবিষ্ট হয়ে পাঠককে (অর্থাৎ ইংরেজিভাষী পাঠককে) বুঝিয়ে দেয় যে এরা বিদেশী, এ অন্য দেশের কথা, এবং লেখক খাঁটি নিজের দেশের মানুষ।"[১]

জীবনস্মৃতির সমালোচনা প্রসঙ্গে রুশ লেখকের সঙ্গে একটি তুলনা আমাদের লক্ষ্যযোগ্য। কবির ছেলেবেলার স্কুল-জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, মাস্টারদের অশিষ্টাচরণ, ভৃত্যরাজতন্ত্রের দুর্ভোগ যে তাকে 'মরবিড সাইকোলজির' একটি উদাহরণ করে তোলেনি এতে ইংরেজ সমালোচক বিস্মিত। টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়, কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় রুশীয় লেখকদের লেখা কীরকম হত? "কিন্তু তিনি সেই অল্প বয়সের দুঃখের দিনগুলোর উপর এমন শান্ত ভদ্র সুন্দর ভাবে উজ্জ্বল কল্পনার সৌন্দর্য বিস্তার করে লিখেছেন যে তাঁর সেই কথনকৌশলের জন্য পাঠকের মনে কোনো দুঃখের ছাপ রেখে যায় না, যা রাশিয়ান লেখকের হাতে পড়লে অবশ্যই ঘটত।"[২]

পার্সন্যালিটি গ্রন্থে 'আমার স্কুল' প্রবন্ধটি একজনের মনে একটি নূতন রকম আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে—"এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, শিশুর জন্য মুক্তির দাবি যাতে সে তার জীবনের সেই কালের উপযোগী, অর্থাৎ শিশু তার বয়সের যোগ্য জীবন যাপন করতে পারে, এ প্রথম এসেছিল টলস্টয়ের কাছে থেকে রুশ বিপ্লবের পূর্বে, আর ভারতবর্ষে আজ রবীন্দ্রনাথও সেই কথা বলেছেন। অবস্থার বৈচিত্র্য ও প্রচুর পার্থক্যের মধ্যে এঁদের দাবির এই ঐক্যটি লক্ষ্য না করার কোনো অর্থ নেই।"[৩]

কাব্যসমালোচনার উদ্ধৃতি আর না করলেও বোঝা যায় রবীন্দ্রসাহিত্য তখনকার ইংরেজি সাহিত্যে স্বীকৃত হয়ে বহু জ্ঞানী, গুণী, কলারসিকের মন কিভাবে অধিকার করেছিল। কাব্য ছেড়ে এখন কবির কথাতেই আসা যাক। কারণ আমরাও তো সেই মানুষের ছবিটিরই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি, বিশ্বের আকাশে যা স্বল্পকালের জন্য জ্যোতি বিকীর্ণ করে লুব্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে চলে গেছে, যাকে আর এখন কোথাও পাওয়া যাবে না, একমাত্র মানুষের প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্যের দৃষ্টিতে যেটুকু ধরা আছে তারই মধ্যে সেই দিব্যমূর্তি ছায়াছবি হয়ে ধরা পড়ে গেছে। এখানে তাই ইংল্যান্ড সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে যে সমস্ত ইংরেজ চিত্তে তাঁর সখ্যপূর্ণ স্বীকৃতি আছে তারই দু-একটির কথা উল্লেখ করতে হয়।

---

[১] *Observer*, Sept. 21, 1916.
[২] *The Nation*, 25 8. 1917.
[৩] *Inquirer*, Feb. 28, 1917.

চিন্ময় ইংল্যান্ডে দীনবন্ধু এনড্রুজ প্রধান—যেদিন গীতাঞ্জলি পড়া হয় সেদিনকার স্মৃতি বহু বৎসর পরে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রবন্ধ যখন তিনি লিখছেন তখন কবির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা সৌহার্দ্যে ও প্রেমে পূর্ণ বিকশিত :

"W. B. Yeats গীতাঞ্জলি থেকে পড়ছিলেন, শুনতে শুনতে আমি মন্ত্রমোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যে কী ঘটেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কবিতার সুর আমাকে অধিকার করে বসল, তার সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করল। কবি নিজে উপস্থিত ছিলেন, নিজেকে যেন লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে এক কোণে বসে ছিলেন—আমার আজও বেশ মনে পড়ে সে মুহূর্তে আমার একটিমাত্র ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল, সে তাঁর পাদস্পর্শ করবার। অবশেষে আলোকিত ঘর থেকে, কবির সান্নিধ্য থেকে, হ্যাম্পস্টেড হীথের উপর হাঁটতে লাগলাম। তখন সবেমাত্র চন্দ্রোদয় হতে শুরু করেছে, বাতাস তারি মোহে পূর্ণ। পৃথিবীর উপরে ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—পশ্চিমাকাশে অস্তগত সূর্যের প্রতিফলিত অপরূপ আলোকাবশেষ। এই পূর্ণ উজ্জ্বল শোভা আমাকে অধিকার করে বসল, আমি হ্যাম্পস্টেড হীথের উপর দিয়ে ক্রমাগত পদচারণা করতে লাগলাম। গন্তব্য কোথায় সে খেয়ালই ছিল না। সেই মুহূর্তে যথার্থই আমার স্থান-কালের ও বাহ্য জগতের বোধ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছিল- সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত-রূপ আমি মনেব দৃষ্টিতে দেখছিলাম—সে দেখা এই বস্তুজগতের বন্ধন পেরিয়ে বহুদূর চলে গিয়েছিল--এই জ্যোতিরুদ্ভাসের আনন্দ কখনই আমার মন থেকে সম্পূর্ণ চলে যায়নি—যখনই আমি কবির সম্মুখে দীর্ঘদিন পর ফিরে আসি সেই স্মৃতি অব্যর্থভাবে আবার আমার মনে জাগে। বিশ্বের অন্তরে সৌন্দর্যলোকের এই অলোক রহস্যের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রথম দিনের অনুভবের পর থেকে আমি এই সৌন্দর্যরূপ তাঁর চোখ দিয়ে দেখতে চেষ্টা কবছি। তাঁর গানের ভিতর দিয়ে তিনি যেমন করে দেখাচ্ছেন, দেখছি আশ্রমজীবনের প্রাণের বয়নে এই সৌন্দর্যরূপ যেমন করে গড়ে তুলেছেন।"১

এনড্রুজ সাহেবের এই সৌন্দর্যানুভূতির স্মৃতির সঙ্গে কবির বহু বৎসর পবে লেখা 'পত্রোত্তর' কবিতার ক'টি লাইনের ভাবসাযুজ্য আছে !—

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর
দেয় না তবুও ধরা

---

১ *Golden Book of Tagore.*

মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা,
অলোক ধামের আভাস সেথায় আছে
মর্তের বুকে অমৃতপাত্রে ঢাকা
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা।

আমরা জানি সেই গোপন ঘরের দরজা তাঁর গানের সুরে, ভাবের পুষ্পবিকাশে, ছন্দের লাবণ্যে বার বার খুলে গিয়ে তাঁর দেশবাসীকে দেখিয়েছে অলোক ধামের আভাস—কিন্তু সে যে বিদেশী ভাষায় রচিত কয়েকটিমাত্র কবিতার নিরলংকার ছন্দে সেদিন তার বিদেশী শ্রোতাদের মধ্যেও সেই মন্ত্র লাগাতে পেরেছিল সাধক এনড্রুজের রচনায় আছে তারি সাক্ষ্য। কবি তাঁর কবিতায় বলেছেন, আমি দেখেছি—"দেখেছি, দেখছি, এই কথা বলিবারে সুব বেঁধে যায় কথা না জোগায় মুখে; ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে—পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে।"...কিন্তু তিনি যে দেখিয়েছেনও সেইখানেই পেলেন তাঁর ভক্তের প্রণাম—তাই এনড্রুজ বলছেন :

"যে কেউ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্বে আমাকে জানতেন তাঁরা জানেন আমার জীবনের সেদিন থেকেই পরিবর্তনের শুরু...সেই সাক্ষাতে এমন কিছু ঘটল যাতে আমার জীবনভঙ্গী গেল বদলে।"

১৯৩২ সালে 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোরে' এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালে দীনবন্ধু এনড্রুজের মৃত্যুর পর একটি ছোট স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই সন্ধ্যার কথা লিখছেন :

"তখন আমি লন্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রোটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্‌স আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এককোণে ছিলেন এনড্রুজ। পাঠ শেষ হলে ফিরে যাচ্ছি বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এনড্রুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বরপ্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপ ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনে করতে পারিনি।"

দীনবন্ধু এনড্রুজের স্মৃতিলেখনের সঙ্গে কবির স্মৃতির—ঘটনার তথ্য-

সমাবেশে অমিল রয়েছে। এনড্রুজের লেখা পড়লে মনে হয় তিনি একাই চলেছিলেন ঐ পথে। হয়ত দুই বন্ধু তাঁদের জীবনের এই বিশেষ স্মরণীয় সন্ধ্যার কথা বারংবার আলোচনা করে থাকবেন। নিত্য যাতায়াতের ফলে কবির মনে ঐ পথটি খুব সত্য হয়েছিল। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠের উপর জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রির কথা তাঁর কাছে বহুবার শুনেছি। তাঁদের উভয়ের জীবনের সেই পরম অভিজ্ঞতার মুহূর্তে ভাবের স্মৃতিই চরম সত্য। সে জ্যোৎস্না শুধু চন্দ্রকিরণ নয়, অলোক ধামের জ্যোতিরুদ্ভাস—যদি মুহূর্তের জন্যও মাটির দরজা খুলে কখনো তার আভাস পেয়ে থাকি তবেই তা অনুমেয়, অন্যথা নয়। সে সন্ধ্যায় দুই মহামানবের চিত্তসঙ্গমক্ষণে প্রেমের মিলন দিনের সত্যসাক্ষী তাঁদের দীর্ঘজীবনের প্রতি পদক্ষেপে তার সাক্ষ্য রেখে চলেছিলেন।

এইরকম প্রত্যক্ষবৎ বিশেষ অনুভূতির কথা এক ধর্মযাজক লিখছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে লিপ্ত এ'র অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ ভাব, বিশেষ সৌন্দর্য আছে :

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমনি একজন সার্থক মানুষ যাঁর কর্ম তাঁর আকৃতিতে সমর্থিত। যে একবার তাঁকে দেখেছে, দেখেছে সেই অনির্বচনীয় মহিমা ও আনন্দ, দেখেছে তাঁর শান্ত মুখচ্ছবি, সে কখনো তা ভুলতে পারবে না। আমার মনে আছে আমি যখন তাঁর দীর্ঘপরিচ্ছদাবৃত মূর্তি দেখলাম আমার মনে হল আমি যেন মানুষ নয়, কোনো দেবতার সামনে এসেছি, পরে আমি অনুভব করেছি এই উপস্থিতি যেন কাব্যময় আত্মার জীবন্ত রূপ—অন্তরস্থ আত্মিক লাবণ্যের বহিঃপ্রকাশ। এইজন্যই ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যেন একটি ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া; মন্দিরবেদীর সামনে কোনো অনুষ্ঠানের চেয়েও এই মানুষটির সংস্পর্শ আমার মনকে রহস্যময় ভক্তি ও বিস্ময়ে পূর্ণ করেছে।"[১]

অনুরূপ অভিজ্ঞতা আমাদেরও জীবনের সাক্ষ্যে আছে এবং সেই কারণেই রবীন্দ্রভক্তের পক্ষে তাঁর গানের সুরে ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ধর্মানুষ্ঠান প্রায় নিরর্থক হয়ে গেছে।

প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী সিবিল থর্নডাইক কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন. এ'র জীবন-ক্ষেত্র পূর্বোক্তদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক, তবু মানুষের ভাবলোকের অন্তরস্থ ঐক্যের খবর এ'র লেখাটিতে পাওয়া যায় : "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে লন্ডন হোটেলে আমার নাটক অভিনয় ব্যাপার ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। জীবনের সেই একটি

---

[১] *Golden Book of Tagore*

ঘণ্টা আমার অন্তিম কাল পর্যন্ত ভুলব না। কারণ তিনি এক মুহূর্তে আমায় তারই সন্ধান দিলেন, খৃশ্চান নারীরূপে আমি সারাজীবন যা বুঝতে চেষ্টা করেছি, যা খুঁজেছি।...তাঁর কাছ থেকে চলে আসবার সময় আমার মনে একটি সাম্যভাবের বোধ জন্মেছিল। বিশ্বের বড় বড় বিভিন্ন ধর্মমতগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে গভীর ঐক্য আছে তা অনুভব করবার এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল—এরকম বিস্ময়কর প্রত্যক্ষবৎ অনুভূতি কদাচিৎ ঘটে।”১

আজকাল এদেশের অনেক ইংরেজি-বিশারদের কাছে শুনেছি কবির ইংরেজি ভালো নয়। এরকম কথা বলার স্পর্ধা অবশ্য তিনি নিজের অহমিকাশূন্য সরলতার দ্বারাই বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে বিলাত থেকে লিখছেন—“যদি ইংরেজি কোনো গল্প থাকে দৃষ্টি রাখিবেন। কেননা ইংরেজি ভাষাটা আমি না জানিয়া আন্দাজে লিখি। এ প্রবন্ধগুলি আমি কানের অভ্যাসে লিখিয়াছি এবং এদেশের শ্রোতারা কানে শুনিয়া ভাল বলিয়াছে...১৮ই বৈশাখ ১৩২০।”

হয়ত এইসব কথাই আধুনিক সমালোচকদের উৎসাহ দিয়ে থাকবে, কিংবা বড়কে ছোট করা ও অবিসংবাদী সত্যের প্রতিবাদ করা এ যুগের ধর্ম। আমরা ইংরেজ নই, মিশনারি স্কুলের ফিরিঙ্গী ইংরেজির ত্যাড়াবাঁকা ধ্বনি আর আমেরিকান ইংরেজির উল্লম্ফনের সঙ্গে এদেশে বসে যতটুকু পরিচয় তাতে নিজেদের খুব বড় বিচারক বলে ধরে নিতে পারি না। যাহোক তখনকার সাহিত্যরসিক, জ্ঞানী-গুণী ইংরেজ সমাজের ধারণা অন্যরকম হয়েছিল, তবে অবশ্য তাঁরা বাংলাদেশের অলিগলির কলেজের ইংরেজি মাস্টার নন। কবির নিকটস্থ কোনো কোনো ইংরেজি-ভাষাভিমানী এও বলে বেড়ান যে Crisis of Civilization ও Miss Rathbone-এর চিঠির উত্তর ইত্যাদি অতিপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রচনাগুলি তাঁদেরই লিখিত। এঁদের সুবিধা এই যে মৃত্যুর পর কেউ সাক্ষ্য দিতে আসে না। তবে এঁরা ভুলে যান যে সে সময়ে অন্য লোকও ছিল, তাঁদেরও স্মৃতি আছে, তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা ভাষার একটা নিজস্ব রূপ আছে, সে আপন উদ্ভবের সাক্ষ্য নিজের মধ্যেই বহন করে।

“কেউ কি বিশ্বাস করবে তখন (১৯১৩) কবিকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করবার পূর্বে ইউনিভারসিটির কর্তৃপক্ষ সন্ধান করেছিলেন যে তিনি ইংরেজি বলতে পারেন কি না। যাক, সন্দেহভঞ্জন হল, তাঁর বাণী ছন্দের তালে তালে অপূর্ব রহস্যময় ভাবনার দ্যোতনা করে, পুরুষের কণ্ঠে যেমনটি

১ *Golden Book of Tagore*

কখনো শুনিনি, তেমনি মধুর সুরেলা স্বরে নিঃসৃত হতে লাগল। দর্শকবৃন্দ রইল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। দর্শকদের মধ্যে একজন আমেরিকান মহিলা তাঁর পাশের ব্যক্তিকে বলছিলেন : 'তোমার কি মনে হয় না এঁর মুখ একেবারে খৃষ্টের মত?' অপর ব্যক্তি উত্তর করলেন, 'কিন্তু জান না কি খৃষ্টও এশিয়াবাসী ছিলেন!' "[১]

আর জি ক্যাম্পবেল তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসন্দর্শনের কথা লিখেছেন : "সে দিনের অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল, আমার চিন্তায় বারে বারে সেই দিনটি ফিরে আসে। কবির দেহসৌন্দর্যও কেউ কখনো ভুলতে পারে না। যদি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার তাঁর আর কোনো কিছু নাও থাকত তবু সেই লাবণ্য-বিকিরণও কেউ ভুলতে পারত না। ন্যাসারাথের যীশুর রক্তমাংসের দেহের সম্বন্ধে মানুষের মনে যে আদর্শটি আছে তার সঙ্গে এমন সাদৃশ্য আর কোনো নরদেহে দেখিনি।... আমি একাই একথা ভাবিনি, আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা ও অন্যান্য সকলেই একথা আড়ালে আলোচনা করছিলেন—সে সময়ে (১৯১২?) ঠাকুরের পূর্ণ যৌবন, বাহুল্যবর্জিত ঋজু দেহ, ঈষৎ অলিভবর্ণ উজ্জ্বল নয়ন, দীর্ঘ কুঞ্চিত হাল্কা কেশ ও শ্মশ্রু—তাঁর মনোহারী নম্র মুখভাবে, তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বে আশ্চর্য তীক্ষ্ম বুদ্ধির সঙ্গে করুণার আর আত্মবিস্মৃত মহিমার মিশ্রণ। আত্মার প্রভায় প্রাণিত অধিকৃত এমন মরদেহ আর কোনো জীবিত লোকের মধ্যে দেখা যায় নি।

"একদিন Sir Richard Stapley-র বাড়িতে Evelyn Underhill, Edmund Holmes প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সেই বিদ্বজ্জনসভায় কবির অপ্রকাশিত নাটক The King of the Dark Chamber পড়া হল। নির্মল সুন্দর ইংরেজিতে উচ্চারিত বিরাট সৃজনশীল মনের শক্তি ও সজীবতা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি (বিশেষ) ইংরেজি জানতেন না. আমি আরো শুনেছি যে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ইংরেজি লিখতে শুরু করেননি। কী অদ্ভুত এ ঘটনা! তাঁর মাতৃভাষা বাংলার যিনি যুগপ্রবর্তক তিনিই আবার ইংরেজি গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম।"[২]

---

[১] *Golden Book of Tagore*

[২] *Golden Book of Tagore*

ন্যাশনালিজম্

এসব কাহিনীর অনেক পরে ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডে হিবার্ট লেকচার দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে কবি মে মাসে মাদ্রাজের পথে বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সে যাত্রায় ফিরে এসেছিলেন। ১৯৩০ সালে হিবার্ট লেকচার দেওয়া হয়। হিবার্ট লেকচারের সূচনায় দীনবন্ধু এনড্রুজ ইংল্যান্ডের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে ন্যাশনালিজম্ গ্রন্থের প্রেরণার একটি কাহিনী আছে তা এখানে উল্লেখযোগ্য।

হিবার্ট লেকচার দিতে কবি নিমন্ত্রিত হয়েছেন—তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি হিবার্ট বক্তৃতাধারা আরম্ভের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমন্ত্রিত হলেন। ইতিপূর্বে মিস মেয়োর কুখ্যাত বই 'মাদার ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হয়েছে সে কথা স্মরণ করে কবির ইংল্যান্ড যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে মহামতি এনড্রুজ লিখছেন—ইংল্যান্ডে কবির প্রতি সহৃদয় সংবর্ধনার ফলে আজকের ভারতবর্ষে মিস মেয়োর বই যে তিক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে তা কতকটা দূর হতেও পারে।..."একথা সত্য যে তিনি কবি, কল্পনাপ্রবণ, কিন্তু দূর প্রাচ্যে আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য তিনি যা করেছেন তা কেবল বীরচরিত্র জ্ঞানী মানুষেরই সাধ্য, আমি তার সাক্ষী আছি।...১৯১৬ সালে যখন যুদ্ধের উগ্র উৎসাহ প্রবলতম, তখন তিনি জাপানে এসেছিলেন। দুটি কারণে তিনি ঐ দেশে এসে মনের মধ্যে বিমুখতা অনুভব করেছিলেন, তারই ফলে প্রসিদ্ধ বই ন্যাশনালিজম্ লেখা হল। প্রথমত তিনি দেখেছিলেন জাপানের সৌন্দর্য, চরিত্রলাবণ্য বিদেশের যোদ্ধৃভাবের কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে—এদিকে তখন সেখানকার বড় বড় খবরের কাগজগুলি জনসাধারণকে কবির অহিংসার বাণী বিপজ্জনক বলে সাবধান করছিল...তাঁদের মতে ঠাকুর পরাজিত জাতির কবি। এই সময়ে তাঁর অতি অপূর্ব মহৎ সঙ্গীত রচিত হল, 'পরাজিতের গান'। জাপানে ঐ সময়ে একদিন তিনি একটি শিশুবিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলেন। সেই দিন দ্বিতীয় কারণটি ঘটল। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম, আমি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করিনি কিন্তু কবি ফিরে এলেন ভারাক্রান্ত চিন্তাগ্রস্ত মনে। তিনি দেখেছেন শিশুরা সব যোদ্ধৃবেশে (military uniform) সজ্জিত, আর বিদ্যালয়ের দেওয়ালে রক্তচিহ্নিত যুদ্ধের লুট (trophy) ঝোলানো রয়েছে।...ঐ দৃশ্যে সেদিন তাঁর মনে প্রবল ধিক্কার এসেছিল। তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে উদ্ধত স্বাজাত্য-অভিমান জগৎজোড়া পাগলামি জাগিয়ে তুলেছে তার বিরুদ্ধে

কঠোরতম ভাষায় লিখবেন। জাপানীরা কিন্তু তাঁর এই স্পষ্ট কথায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারায়নি। তারপরের বার যখন সেদেশে যান তখন সমগ্র দেশ দ্রষ্টা বলে তাঁকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। ভূমিকম্পের দুর্ঘটনার অল্প পরে যখন আমেরিকার ইমিগ্রেশন আইন জাপানের আত্মসম্মানে তীব্র আঘাত করেছিল তখন ঠাকুরকে সবাই তাঁর মর্যাদাপূর্ণ শান্ত ভদ্রজনোচিত উপদেশের জন্য প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।......চীনেও প্রথমে তাঁর আগমনের ভুল ব্যাখ্যা একশ্রেণীর ছাত্রসমাজে প্রচারিত হয়.. প্রগতিবাদী চীনা নব্য সুধীবৃন্দ দেশকে সাবধান করে বলেছিল বস্তুবাদী হবার প্রযোজনীয়তা, বলেছিল কবির কল্পনায় ভেসে গিয়ে মঙ্গল নেই..তাদের বিশ্বাস ছিল জোরজবরদস্তি ও অস্ত্রশস্ত্রেই আধুনিক জগতে কৃতকার্য হওয়া যায়। চীনের অস্ত্র চাই। চীনের আপাদমস্তক রণসজ্জায় সজ্জিত ও পাশব শক্তিতে দৃঢ়, যুদ্ধে প্রবল হওয়া চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম কবি তাঁর সততাপূর্ণ আগ্রহে, ভদ্রতানম্র আচরণে, তাদের জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে এক আশ্চর্য মন্ত্র বলেছিলেন ·

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি
ততঃ সপত্মান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"[১]

১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে কবি ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকা যান—এই তাঁর প্রথম আমেরিকা যাত্রা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। তখনও তিনি নোবেল প্রাইজ পাননি ও সমগ্র জগতে তাঁর নাম ও কীর্তির ঘোষণা হয়নি। তবু ক্রমে ক্রমে সে সময়েই তিনি লোকের দৃষ্টিগোচর হয়ছিলেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উদার-ধর্মমতীদের' সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সমাদরও পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর মন আমেরিকান জীবন-বিন্যাসের ধারাকে গ্রহণ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে নোবেল প্রাইজ পাবার পর ও ইংরেজিতে পর পর কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত হলে ও শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ আমেরিকায় প্রকাশিত হলে কবির বিষয়ে জনসাধারণের মনে সচেতন আগ্রহ আসে। ১৯১৬ সালে জাপানের পথে যখন আমেরিকায় আসেন তখন কবির নাম ও খ্যাতি মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো পৃথিবী ব্যাপ্ত করেছে—তাঁর কণ্ঠে দৃঢ়-প্রত্যয়ের ঘোষণা, অন্তরে অটল সত্যবিশ্বাস। আমেরিকায় আসার উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ—অর্থ সংগ্রহের উপায় নানা প্রতিষ্ঠানে

---

[১] *Modern Review.*

বক্তৃতার দর্শনী, কিন্তু বক্তৃতাগুলি উদ্দেশ্যের ধার ধারে না, তার উৎসরণ অন্তরের সত্য বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, প্রতিকূল চিন্তার ক্ষুরধার উজানে প্রবাহিত। 'ন্যাশনালিজম,' 'পার্সোন্যালিটি' প্রভৃতি নিবন্ধে আছে সেই উদ্ঘোষিত বাণী। ইতিমধ্যে চীন ও জাপানের সঙ্গে পরিচয়ে পূর্বদেশের বিশেষত্ব, ভাব ও অনুভবের সৌন্দর্য কবির মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। যদিও জাপানের উগ্র ন্যাশনালিজম্ বা দেশাত্মবোধ, যে বোধ নিজের জাতির আপাত মঙ্গলের জন্য অন্যের ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না তারই অতিশয়ীকৃত চেহারা দেখে কবি ন্যাশনালিজম্-এর ত্রুটি দেখতে পান—যে হিত ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা অহিত এবং অধর্মের ফলে যে সমূলেই বিনাশ, ভারতবর্ষের সেই অতিপুরাতন কথাটি আধুনিক মানুষের অনিচ্ছুক কানের কাছে অমোঘ ভাষায় ঘোষণা করেন—তবু জাপানের সৌন্দর্যবোধ, ধ্যানশক্তি, জীবনের প্রকাশ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হয়ে কবি বক্তৃতা দিতে আসছেন, সঙ্গে সেক্রেটারি প্রিয় সুহৃদ ও শিষ্য পিয়ার্সন সাহেব। ট্রেনের একটি ছোট কামরা নিজস্ব করে নেওয়া। হাতে আইরিশ শিল্পী ও কবি জর্জ রাসেল-এর বই 'Imagination and Reveries'। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, কবি ভ্রমণের সময় সর্বদা একলা কামরায় যেতেন—ভিড়ে বেশীক্ষণ থাকা তাঁর একেবারেই অসহ্য ছিল। ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ বসু আমেরিকা-প্রবাসী, তিনি অভ্যর্থনা করতে গিয়েছেন। এই তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসন্দর্শন। তিনি লিখছেন : "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি যা ধারণা করে রেখেছিলাম তিনি তার বিপরীত। তিনি নম্র, অতি ভদ্র, এমনকি মিশুক প্রকৃতির। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভা যে বিপুল সম্মান পেয়েছে তাতে তাঁকে মাতাল করেনি। আমি যেসব বড়লোক দেখেছি তিনি একেবারেই তাঁদের কারো মত নন। তিনি সম্পূর্ণ পৃথক, কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার বিষয়েই তাঁর সমস্ত আগ্রহ, তাই জাপান ও আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের কথা উঠল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈষৎ ইংরেজি ধরনের উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের ছেলেদের জাপানে আর্ট শিখতে যাওয়া দরকার—জাপানের আর্ট অতি সুন্দর কিন্তু সায়েন্স শিখতে সায়েন্সের প্রধান উৎস আমেরিকায় আসতেই হবে—'...তিনি আরও বললেন, 'জাপানীদের আমার ভালো লাগে—তাদের আচার-আচরণের এমন সৌন্দর্য আছে যা ভালো না লেগেই পারে না। তাদের ব্যবহারও মুগ্ধ করে। ভিতরে ভিতরে জাপানীরা আমাদেরই মত, ওরা পাশ্চাত্যভাবের নয়। যতই ওরা বলুক না কেন যে একেবারে তারা ইয়োরোপীয়ান হয়ে গেছে, আসলে জাপানীরা মজ্জায় মজ্জায় ওরিয়েন্টাল!...চীনারাও এক মহাজাতি—

আর তাদের এমন সুন্দর একটা মর্যাদাবোধ আছে—তাদের রীতিনীতি সনাতন, কিন্তু সেগুলি তাদের পক্ষে শোভন—অনেক দিক থেকে আমার চীনাদের জাপানীদের চেয়েও ভালো লাগে।' সুধীন্দ্রবাবু কথাপ্রসঙ্গে আমেরিকানদের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি খোলাখুলিই বলেছিলেন : 'তোমাদের আমেরিকানদের জীবন বড় পল্লবগ্রাহী, তারা গভীরভাবে চিন্তা করে না।'"

কিন্তু আমেরিকার সুধীবৃন্দ গভীর আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। এবং আমেরিকার নাগরিক জীবনের বহু সমালোচনা তারা কবির কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের পূর্বে কাগজে কাগজে পূর্ণ উৎসাহে তাঁর সম্বন্ধে খবর বেরিয়েছে—"রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্ট থেকে আসছেন। কিন্তু তাঁর ঐক্যের বাণী, জীবনের সামঞ্জস্যের বাণী সমস্ত বিশ্বের—এই রকম মহামানবকে দেখবার সৌভাগ্য, এ'র বাণী শোনবার সৌভাগ্য, আমাদের ছাত্ররা এবার পাবে—জীবনে এমন মহৎ ঘটনা একবারই ঘটে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য সম্বন্ধে আমেরিকার জনসাধারণ উদাসীন ছিল না। তাঁর চতুর্দিকে অহর্নিশি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা প্রদক্ষিণ করে বেড়াত। রবীন্দ্রনাথ পাবলিসিটি পছন্দ করেন না। তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে এই খববের কাগজের ঢেডরা পেটানো আঘাত করে। "তিনি খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের হাত এড়াতে চান যেমন লোকে মশা এড়াতে চায়। তাঁর সেক্রেটারি পিয়ার্সন সাহেবকে এই কাগজওয়ালাদের তাড়াবার নিত্য নূতন পন্থা বের করতে হয়। এই উপলক্ষে মাঝে মাঝে খবর-অনুসন্ধানীদের সঙ্গে তাঁর বেশ মজায় সময় কাটে। একটা ঘটনা বলা যাক। কবি তখন য়ুটা প্রদেশে সলট্ লেক সিটিতে আছেন। সৈন্যপরিবৃত দুর্গের মত তাঁর হোটেল কাগজওয়ালারা ঘিরে আছে—সবাই সাক্ষাৎ চায়। কবির ইংরেজ সেক্রেটারি বেশ গরম হয়ে বললেন, 'অসম্ভব। এসময় দেখা হতেই পারে না।' রিপোর্টারদের মধ্যে একজনের বেশ উদ্ভাবনী প্রতিভা ছিল, তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সে গিয়ে হোটেলে টেলিফোন করে ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে চাইল :—'হ্যালো হ্যালো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথা বলছেন?'

'না, আমি তাঁর সেক্রেটারি। আপনি কী চান?'

'আমি এখুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'দুঃখিত। এখন হতে পারে না।'

'আমি সলট্ লেক সিটির ব্রিটিশ ভাইস-কনসাল। ঠাকুরের সঙ্গে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে এখুনি দেখা করা আমার দরকার।'

পিয়ার্সন একটু নরম হলেন, গলাটা কিঞ্চিৎ মোলায়েম করে বললেন, "ও, আচ্ছা আপনি আসুন, দেখা হবে।" অতঃপর তথাকথিত ভাইস-কন্‌সালকে ঠাকুরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি 'ইয়োর লর্ডশিপ' বলে কথা শুরু করলেন। তাঁর গলার স্বরে সন্দেহজনক অতিভদ্রতার আমেজ—'ইয়োর লর্ডশিপ, আপনার কাছে জানতে চাই—' আর বলতে হল না—জ্ঞানীপুরুষ পিয়ার্সনের পক্ষে এই যথেষ্ট হল। তিনি বললেন, 'কিন্তু ব্রিটিশ ভাইস-কন্‌সাল হয়ে আপনার জানা উচিত যে, 'নাইট'কে 'ইয়োর লর্ডশিপ' বলে সম্বোধন করা হয় না। আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?' এই বলে কালবিলম্ব না করে সাহায্য করলেন অর্থাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। অন্যত্র অবশ্য আছে যে, রিপোর্টারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল, কবির সঙ্গে মনোরম কৌতুকপ্রদ আলাপ জমেছিল!

এত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের যে সাক্ষাৎকার তা চটকদার বা চমকপ্রদ খবর সংগ্রহের ইচ্ছাপ্রসূত হলেও স্বীকার করতেই হবে যে, তৎকালীন আমেরিকান জার্নালিসম্‌ অন্য দেশের তুলনায় অনেক ব্যাপক ছিল। পুরানো কাগজপত্র খুঁজে আমেরিকার কাগজে কবির সম্বন্ধে যে বিশদ বর্ণনা এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যত বিস্তৃত বিবরণ পাই এমন অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা থাকলেও যেসব প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা যেরকম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিস্তারিতরূপে তাঁদের মনোভাব লিখেছেন এমন তো এদেশেও কোথাও দেখি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কি দেশে কি বিদেশে সর্বত্রই তথ্য সংগ্রহের ঝোঁকই প্রধান, কিন্তু যে সমস্ত অনির্বচনীয় ভাবে, ভঙ্গীতে, কৌতুকে, আনন্দে, রবীন্দ্র-সত্তার সত্যরূপ উদ্ভাসিত, তাকে ধরবার কথা কারুর মনেই হয়নি। "Then for an hour he regaled the company with an entertaining talk."....

আমরা অনুমানে বুঝতে পারি সে কী আনন্দোজ্জ্বল, একাধারে গভীর সত্যপূর্ণ অথচ কৌতুকে ঝলমল বাক্যালাপে স্বপ্নপুরী করে তুলেছেন চারিপাশ। বারে বারেই আভাস পাই কিন্তু দুঃখ হয় তাঁর জীবনের যে আনন্দবাণী কেবল উপস্থিতিতেই উচ্চারিত তা আমাদের এড়িয়ে গেল। যাহোক, তবু আমেরিকার কাগজেপত্রে কিছু আভাস ছড়িয়ে আছে।

চিকাগোর একটি সংবাদপত্রে ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে একজন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিখছেন :

"আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—তিনি পাশ্চাত্য ভঙ্গীতে হাত এগিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ ইংরেজিতে উচ্চারিত তাঁর ধীর মৃদু "হাউ ডু ইয়ু ডু"র মধ্যেও যেন এক অলৌকিক ভাব ছিল।...আর্টিস্টরা আমাদের

মনে খৃষ্টের যে ছবি গড়ে তুলেছেন তার সঙ্গে এঁর যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে শুধু সেই জন্যই নয়—তাঁর আশ্চর্যরকম মেশায়ার তুল্য আকৃতি, অলিভরঙের মুক্তামসৃণ ত্বক, নরম কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ, আর সেই চোখ, যে চোখের দৃষ্টিতে আছে অপার করুণা—তবু শুধু সেজন্যও নয়, আমার মনে হল তিনি যেন তেমনি একজন আশ্চর্য মানুষ যিনি জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন এবং যাঁর চিত্তের আদর্শ দীর্ঘ-জীবনের দাহে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা হয়ে গেছে। আমরা আমেরিকান সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম—ছন্দ, ফ্রী ভার্স, বাইবেল ও সৌভ্রাত্র্য এইসব বিষয়ে কথা হল। কবি বললেন, আমেরিকান সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই খবর রাখেন না।”

“আমি শুধু ইংরেজি ক্ল্যাসিক পড়েছি—আধুনিক ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্য সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানি না—আমি তোমাদের ক্ল্যাসিক লেখক এমার্সন ও হুইটম্যানের কাব্য পড়েছি।”

আমি বললুম, “কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকানই হুইটম্যানের রচনা ঠিক ক্ল্যাসিকের পর্যায়ে পড়ে বলে মনে করে না।”

কবি বিস্মিত হয়ে বললেন, “করে না? কিন্তু তিনিই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি।”

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে যখন বাঙালী কবিদের, ইংরেজ কবিদের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে বাংলার মিলটন কাউকে টেনিসন বলা হত তখন রবীন্দ্রনাথকে কেউ কেউ বাংলার শেলী বলেছে। সে তুলনা একেবারেই বহিরঙ্গ, সংকীর্ণ।

রবীন্দ্র-চিত্তের ব্যাপকতা, রবীন্দ্র-মননের সার্বভৌম দৃষ্টির সঙ্গে যদি কোনো ইংরেজি ভাষার কবির তুলনা চলে সে হুইটম্যান। হুইটম্যানকে আমেরিকা দীর্ঘদিন প্রাপ্য সম্মান দেয়নি। তাঁর জীবন সম্বন্ধে কুরুচিপূর্ণ এবং সম্ভবত সম্পূর্ণ অনুমানমূলক কুৎসিত কাহিনী তাঁরই কাব্যগ্রন্থে ভূমিকারূপে সংলগ্ন করে পাঠকের মনকে বিমুখ করেছে। বর্তমানে অবশ্য হুইটম্যান ক্রমশই স্বীকৃত হচ্ছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকাশভঙ্গী ও আঙ্গিক হুইটম্যানের একেবারে বিপরীত—হুইটম্যানের নিছক শুষ্ক গদ্যরীতির ভাষা সর্বকোমলতাবঞ্চিত—তার সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যের সুকুমার ললিত-সূক্ষ্মতার কোনো তুলনাই চলে না, তবু বিস্ময়ের কথা এই যে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিপরীত ছন্দে, একজন কঠোরে ও একজন ললিতে, বহু জায়গায় একইভাবের দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকান প্রশ্নকারী লিখেছেন: “আমি বললাম—‘আপনার গীতাঞ্জলির গানগুলি পড়বার পর থেকেই আমি ভাবছি কী জানি

বাইবেলের "Psalms of David" আপনাকে কতখানি প্রেরণা দিয়েছে।' তাদের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য অপরূপ—কিন্তু কবি যেন আমার কথা বুঝতে পারলেন না—তিনি বললেন—'বাইবেল তো আমি পড়িনি...'।

..."তারপর ঈষৎ লজ্জিত আর ক্ষমা প্রার্থনার ভাবেই যেন বললেন, 'আশা করি এ কথায় আপনাকে কষ্ট দিলাম না। আমি প্রথম দু অধ্যায় পড়তে চেষ্টা করেছি কিন্তু সেগুলি এত বেশী নিষ্ঠুর (They are so...so... very violent) যে আমি পড়তে পারলাম না। আমি শুনেছি যে Psalmsগুলি খুব সুন্দর, আমি নিশ্চয়ই এবার পড়ব'—"

তারপর বহুক্ষণ আমেরিকান প্রতিনিধির সঙ্গে একদা জগতে বিশ্বমৈত্রী স্থাপিত হবে এই আশা নিয়ে অনেক আলোচনা হল। কবির আলোচনা গভীর বিষয়কে অবলম্বন করে হলেও কৌতুকোজ্জ্বল, শুধু এইটুকু বলেই প্রতিনিধি ক্ষান্ত হয়েছেন। সর্বত্রই প্রায় তাই ঘটেছে। গোটা কয়েক মতামত পেয়েই লোকে সন্তুষ্ট কিন্তু তাঁর সঙ্গসুধার আনন্দটুকু ধরে রাখতে কেউই চেষ্টা করেনি। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, গোঁড়া ক্রিশ্চান মহলে রবীন্দ্রনাথ বাইবেল পড়েছেন কি পড়েননি এ নিয়ে তর্ক ও বিরুদ্ধ আলোচনা অদ্যাবধি চলেছে। টমসন সাহেব কবির এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন—"কবির পূর্বপুরুষেরাও দুটি "ভায়োলেন্ট" বই লিখেছিলেন—মহাভারত, রামায়ণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনই অমন কচি খোকা (milk sop) নন—কাগজে নিশ্চয়ই ভুল খবর লিখেছে। তা-ছাড়া তিনি যীশু খৃষ্ট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।"[১] টমসন সাহেবের অনুমান করা উচিত ছিল যে, বাইবেলের যে-অংশ তাঁর নিষ্ঠুর বোধ হয়েছে যীশুর জীবনই সে অংশের প্রতিবাদ—কাজেই সম্পূর্ণ গ্রন্থটি কণ্ঠস্থ না করলেও খৃষ্টকে শ্রদ্ধা করা যায়। বিশেষত এখানে ওল্ড টেস্টামেন্টের কথাই বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ডাঃ নিকল ম্যানিকলকে ১৯৩২ সালে লেখা এনড্রুজ সাহেবের একটি চিঠিতে কিছু তথ্য পাওয়া যায়—"একবার আমার বিশেষ সৌভাগ্য হয়েছিল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত 'নিউ টেস্টামেন্ট'খানি হাতে পাবার—মনে পড়ে যে লক্ষ্য করেছিলাম বইয়ের ধারে কবিকৃত নোটগুলি সেন্ট জন-এর এপিসল্ ও গস্পেল-এর পাশেই বেশী রয়েছে। কিন্তু সেন্ট পলের এপিসলে বই-এর কিনারা চিহ্নিত নয়। এ থেকে অনুমান করেছি কবির পূর্বদেশীয় মনে সেন্ট পলের প্রভাব পড়েনি। কোনো অমূল্য পরম সত্য যদি অন্য মানুষের কাছে প্রতিভাত করতে হয়—তা হলে

---

[১] খৃষ্ট সম্বন্ধে অপূর্ব কবিতা শিশুতীর্থ ছাড়াও, বিভিন্ন প্রবন্ধে, কবিতায় ও গানে কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

কি নিজের অন্তরের আলোকেই নিষ্কম্প রাখতে হয় না—যাতে সে সত্য আপন জ্যোতিতেই প্রকাশিত হতে পারে। সত্য শেখানো যায় না, শুধু জীবনে প্রকাশ করা যায়। এমনকি স্বয়ং খৃষ্টের মর্তজীবনের মুখনিঃসৃত বাণীর কোনো স্থায়ী মূল্য হত না—যদি না সমস্ত উচ্চারিত বাক্যের মর্মে অন্তর্নিহিত তাঁর সত্তা আরো অনেক মহান হত।...

"পাশ্চাত্য আচরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে জ্ঞানপূর্ণ সহৃদয় সমালোচনা আমরা শুনেছি তার মধ্যে 'করা' এবং 'হওয়া' এই দুই ভাবের যে বিশেষ পার্থক্য সেইদিকেই নির্দেশ পেয়েছি। তিনি বলেছিলেন, 'চার্লি, তুমি সব সময়েই কিছু একটা করবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করছ, কখন তুমি হবে?' কবি দূর থেকে পাশ্চাত্ত্য জগতের বিরামহীন কর্মপ্রবাহ সপ্রশংসভাবেই দেখেন এবং এর মহত্ত্বের প্রশংসাও করেন কিন্তু তাঁর প্রাচ্য মন কখন নিঃশব্দ সঞ্চারে যেন তাঁরও অগোচরে তাঁর মধ্যে ফিরে আসে!"

আমার কাগজের সাক্ষ্যপ্রমাণ বলে যে, প্রথমে তিনি ওল্ড টেস্টামেন্ট খানিকটা পড়ে অরুচিকর ঠেকায় আর পড়েননি, কিন্তু গীতাঞ্জলি রচনার পরে ও ইয়োরোপে বহুবার গীতাঞ্জলির ভাষার সঙ্গে বাইবেলের ভাষা ও ভাবের সাদৃশ্য আলোচনা হবার পর তিনি বাইবেল পড়েছিলেন। রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় (১৯৩০ সালে) তিনি বলেছিলেন: "I have never been able to love the God of the Old Testament. He is the Lord with rod." ঈশ্বরের শাসকমূর্তি কবি চেনেন না, তিনি বন্ধুকে চেনেন। সে সময়ে পাশ্চাত্য জনসাধারণ ভারতবর্ষের পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী এক পরাধীন জাতির কণ্ঠস্বরে গীতাঞ্জলির গানগুলি শুনে যেন নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না—উপনিষদের ব্রহ্মবাদ কেই-বা তখন শুনেছে বা বুঝেছে—সে ক্ষেত্রে বাইবেল ও খৃষ্টধর্মের প্রভাব ছাড়া কি করে এভাব জন্মাতে পারে তাও তারা বুঝতে বা মানতে রাজী নয়। নব্য হিন্দু অভ্যুদয় যে খৃষ্টধর্মের প্রভাবে ও প্রেরণায় এ কথায় যেটুকু সত্য আছে তার চেয়ে তা অনেক বেশী উচ্চৈঃস্বরে প্রচারিত হচ্ছিল। অতএব সে সময়ে কবি বাইবেলই পড়েননি এ কথা নিয়ে বহু তর্ক উপস্থিত হয়। ইদানীংও খৃষ্টান সমাজে এ বিষয়ে বিতর্ক শুনেছি। যাই হোক, অনুমান করা যায় ভক্ত খৃষ্টান বন্ধুদের গভীর প্রীতি ও তাঁর কাব্যের সঙ্গে বাইবেলের এত তুলনায় তিনি নিশ্চয় ঐ গ্রন্থ পরে সমনোযোগে পড়েছিলেন। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, গীতাঞ্জলির গানগুলির জন্য বাইবেলের প্রেরণার দরকার হয়নি।[১]

---

[১] এ সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ১৩১৩ সালে লেখা কবির একটি চিঠি

শুধু শাস্ত্র নয়, শাস্ত্রকারের সঙ্গে আকৃতির এত মিল পশ্চিমের চোখকে বিস্মিত করেছিল। আকারে বচনে ভঙ্গীতে শান্ত ধ্যানসমাহিত সেই মূর্তি. চঞ্চল বিক্ষিপ্তচিত্ত দ্রুতধাবমান ইয়োরোপের জনতার মাঝখানে দূর এক অতীত জগতের দৃশ্যের মত মনে হচ্ছিল।

১৯২১ সালে আমেরিকার একটি কাগজ লিখছে. "রবীন্দ্রনাথের আকৃতি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা খৃষ্টের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে, তার আত্মিক ভাবময় গভীর ও নম্র দৃষ্টির সামনে এসে, যে দৃষ্টি জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে, জীবনের অর্থ বুঝেছে, যে আমেরিকান নিজের প্রতীচ্য অমার্জিত স্থূলতা অনুভব করে না, বুঝতে পারে না যে তার নিজের আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষাই নেই, সে নিশ্চয় অতিশয় দাম্ভিক। এমনকি গীতাঞ্জলি ও ক্রিসেণ্ট মুন তার প্রিয় বলেই যে কবির অন্তরঙ্গ হওয়া তার সহজ হবে তা একেবারেই নয়। কারণ ঠাকুর যে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় কোনো আলোচনাই করবেন না শুধু তা নয়, এমনকি তুমি যদি তার কবিতা সম্বন্ধে কিছু বল তাহলে তিনি তাঁর গভীর আশ্চর্য চোখের দৃষ্টিতে এমন একটি অব্যক্ত প্রতীক্ষা নিয়ে নীরব হয়ে থাকবেন যে তোমার মনে হবে তুমি তোমার অধিকারের সীমা অতিক্রম করেছ।'

তখনকার কাগজপত্র ও সাময়িকের নানা মন্তব্য ও খবর থেকে বোঝা যায় যে কতরকম প্রশ্নোত্তরের ফেরেই কবিকে পড়তে হত এবং অনেক লোকই অসার প্রশ্নে, বিফল বিতর্কে মুখর হয়ে উঠতে চাইত—কবিকে হয়ত তখন অনেক স্থলেই নীরব দৃষ্টির অভিঘাতে সেগুলিকে যথাস্থানে সরিয়ে রাখতে হত।

নোবেল প্রাইজ পাবার তিন বছর পরে 'ন্যাশনালিজম্' গ্রন্থ প্রকাশিত হল। ঐ ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থখানি বিশ্বব্যাপী তুমুল আলোচনার কেন্দ্র হয়েছিল। তার তিন-চার বছর পরে কবি নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন। যুদ্ধামিত্র ইংরেজিভাষী ইংল্যন্ড ও আমেরিকায় কবির মিত্রসংখ্যা কমল। বিশেষ ন্যাশনালিজম্ গ্রন্থ যে মানুষের মনকে যুদ্ধাবিমুখ করবে এই আশঙ্কায় সেই বইকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলেই আমেরিকাব নানা কাগজে মন্তব্য করেছিল। ইংল্যন্ড নীরব অবহেলায়, আমেবিকা মুখর নিন্দায়, কবির প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছিল। এ সম্বন্ধে প্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

সম্প্রতি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি লিখেছেন :—"টমসন লিখেচেন আমি কাকে বলেচি যে আমি বাইবেল পড়িনি, আমাকে প্রশ্ন করলে সহজেই জানতে পারতেন আমি New Testament পড়েছি— একান্ত বিতৃষ্ণাবশতঃ Old Testament পড়িনি।—প্রবাসী

রবীন্দ্রজীবনীতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু বিরুদ্ধতা যতই উচ্চঘোষিত হোক, ঐ বই বহু মানুষের অন্তর যে কী গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তারও নানা প্রমাণ ইতস্তত ছড়ানো আছে। বস্তুত বিরুদ্ধতা যেখানে স্বার্থমূলক, অভিসন্ধিগ্রস্ত, সেখানে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমুক্ত মনে ভাবের যে প্রভাব পড়েছে তার মধ্যেই পরিচয় পাই সত্যের। বুঝতে পারি যাঁরা তাঁর বাণীর তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছিলেন, স্বার্থবিরোধী হতে পারে অনুমান করে আতঙ্কিত হন নি, তাঁরাই সে দেশের মনুষ্যত্বের প্রতীক। ক্ষুদ্র স্বার্থে যাঁদের দৃষ্টি আবিল নয়, সত্যকে যাঁরা চিনতে চান সংখ্যায় তাঁরা সর্বত্রই নগণ্য। তবু তাঁদের মধ্যেই আছে দেশ ও জাতির অর্থ, সার্থকতা। ন্যাশনালিজম্ গ্রন্থ ও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ ও বাণী কলম্বিয়ার একজন আমেরিকানকে কী গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল তা উদ্ধৃত চিঠিখানি থেকে বোঝা যাবে :

"আমি কখনো আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার সুযোগ পাইনি, আমার সে ক্ষমতাও নেই যে আমি বুঝিয়ে বলতে পারি যে কতখানি ভালবাসা, আগ্রহ ও ভক্তিপূর্ণ বিনম্র মন নিয়ে আমি কি ভাবে তাঁর পদাঙ্কঅনুবর্তী হতে চাই। ঠাকুর আমার মনকে এমন সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করেছেন যে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি এক নূতন মানুষ হয়ে নূতন জগতে প্রবেশ করেছি। তাঁর ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে বক্তৃতায় তাঁকে শান্তির বাণী প্রচারের জন্য আবার নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত। সেই যে বালিকা 'রাজার দুলালের' রথের চাকার তলায় মণিহার খুলে ফেলেছিল তিনি জানেন না সে কে, সে আমি।"

ন্যাশনালিজম্ বক্তৃতা নিয়ে যে আলোচনার তুফান উঠল তা দীর্ঘদিন ধরে চলল। কারণ সহজেই অনুমেয়। ন্যাশনালিজমের বোধ বা দেশপ্রেম মহৎ এবং এই সদ্‌গুণের দ্বারা চালিত হয়ে কত বীরের আত্মোৎসর্গ—স্বাদেশিকতা বা দেশপ্রেমের মধ্যে, স্বদেশপ্রীতির মধ্যে যে কোনো পাপ থাকতে পারে তা সাধারণ লোকের ধারণার অতীত। কবি যখন একেবারে নিঃসংশয়রূপে দেখিয়ে দিলেন স্বজাতিপ্রীতির উলটো পিঠে পরজাতিপীড়নের ছবিটি কেমন, দেখিয়ে দিলেন দেশপ্রেমের মুখোশ পরা লোভের বিকট মূর্তি, ঘোষণা করলেন এই অপদেবতার কাছে নরবলি দিও না, তখন মানুষ চমকে উঠল। তবু ন্যাশনালিজম্ শব্দটির উপর যত ভক্তি অর্পণ করেছে, একদিন তাকে যে সিংহাসনে বসিয়েছে হঠাৎ তাকে সেখান থেকে নামানো শক্ত, তাই মন বড় খুঁতখুঁত করতে লাগল। অনেকেই বললেন, কবি 'ন্যাশনালিজম্' শব্দটির অর্থ আমরা ইংরেজিতে যেমন বুঝি তা বোঝেন নি।

"যদি এই বইয়ের যত জায়গায় নেশন শব্দের ব্যবহার আছে তার স্থলে 'স্টেট্' শব্দটি বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বইটি চমৎকার শোনায়। স্টেট্‌কে যদি চরম ভক্তি ও ক্ষমতা অর্পণ করে দেবতা করে তুলি তবে সে মূর্খতায় ক্ষতি অনেক। ভারতবর্ষ আমাদের সাহায্য করবে তাকে সে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনতে।"১

এমনকি দীনবন্ধু এনড্রুজও কবিকে বলেছিলেন যে তুমি স্টেট ও নেশন এই দুই শব্দের অর্থের গোলমাল করেছ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবেই জানিয়েছিলেন যে তিনি নেশনতন্ত্রকেই নিন্দা করেন।

ন্যাশনালিজম্ বক্তৃতার বিরুদ্ধ আলোচনাপর্ব সেই প্রসঙ্গেই ক্ষান্ত হত না, হিন্দুজাতির আদ্যশ্রাদ্ধ করে তবে ক্ষোভ মিটত।

"এই হিন্দু পোয়েট আমাদের আত্মার সঙ্গীত শোনবার জন্য, আধ্যাত্মিক হবার জন্য ওকালতি করতে এসেছেন এবং তাঁর প্রত্যেক plead-এর জন্য দর্শনী লাগছে ১০০ ডলার!" কেউ বা লিখছে—"এ সমস্ত কথার পাশ্চাত্য চিত্তের কাছে কোনো আবেদন নেই। যে-জীবন-দর্শন অনন্ত ধ্যানের উপর বায়না করে বসে সমস্ত জাতিকে দারুণ দারিদ্র্যে ফেলে রাখতে পারে, যেসব থিয়োরি পতিতকে অজ্ঞান থেকে ওঠাবার কোনো চেষ্টাই করে না, কেবল-মাত্র পৌত্তলিকতা ও বহুদেববাদের স্থূলতম মতগুলিকে পোষণ করে আর রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতায় সন্তোষে থাকে সেসব কথা আমেরিকান বা ইয়োরোপীয়ানদের মনকে স্পর্শ করে না।"২

সেই সময়ে কিন্তু ওদেশের চিন্তাশীল বহু জ্ঞানী-গুণী খবরের কাগজের এসব বহিরঙ্গ সমালোচনা অগ্রাহ্য করে কবির বক্তব্য সমনোযোগে অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বহুদেববাদ বা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী কিনা ও জাতির অশিক্ষা দূর করবার কোনো চেষ্টা করেছেন কিনা, পরাধীন অবস্থায় সন্তুষ্ট কিনা এসব কথা তাঁরা সকলেই সবিশেষ জানতে পারেন না, তবু তাঁর কথা শুনে অনেকেরই মনে হয়েছে ·

"যদি ঐ দেশকে (ভারতবর্ষকে) আমরা ভাল করে বুঝতে চাই তাহলে কবি এবং গুরু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি গ্রহণ করতে হবে। কয়েক বছর পূর্বে (১৯১২) তিনি যখন লন্ডনে ছিলেন, তিনি যেন দ্রষ্টার মত এই বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন--। অতি স্পষ্ট ভাষায় তিনি তাঁর বন্ধুদের বলে গিয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে এগিয়ে আসছে এক কঠিন পরীক্ষা।. বলেছিলেন, ভারতবর্ষের বাণী তাকে শুনতেই

---

১ *Manchester Guardian*, Sept. 24, 1917.

২ *Detroit Mich Free Press*, Nov. 15, 1916.

হবে। প্রাচ্যধর্ম কেবলই কুসংস্কার নয়, কেবলই পিতৃপূজো বা মূর্তিপূজো নয়...। আমরা শুনেছি যে ঐ সময়ে লন্ডনে বাসকালে এই মিস্টিক্ কবি সব কিছুতেই উৎসাহ নিতেন, এদেশের সবকিছুই জানবার তাঁর আগ্রহ ছিল, তিনি আনন্দেই ছিলেন কিন্তু তাঁর লেখবার শক্তি, সৃষ্টি করবার শক্তি একেবারে চলে গিয়েছিল। যতদিন এই গন্ডগোল ও দৌড়াদৌড়ির মধ্যে ছিলেন কিছুই লিখতে পারেন নি।...তবু তাঁর এই শুদ্ধ নীরবতার ছবিটি মনে নিয়ে কেউ যেন মনে না করেন যে কবি একজন সন্ন্যাসী, তিনি এই পৃথিবীর কবিদের একজন, কেবলমাত্র প্রচারকদের নয়, আর তিনি যা প্রচার করেন জীবনেও তাই করেন।"[১]

কবি যখন নেশনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জগতে তাঁর মত ঘোষণা করেছিলেন অপ্রত্যাশিত বলেই তা বহু বাদপ্রতিবাদের কারণ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে, বিশেষত দ্বিতীয় যুদ্ধের পটভূমিতে, স্বাদেশিকতার অনুষঙ্গে, পরজাতিবিদ্বেষের রূপ যখন প্রকট হয়ে উঠল তখন কবির মতটি সমস্ত চিন্তাশীল মানুষের কাছে অব্যর্থ সত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। মানুষ বুঝেছে এর গলদ কোথায়, দেশপ্রীতি যখন নাজি জার্মানির আর্যপ্রীতির অতিকায় রূপ নিয়েছে তখন নেশনতন্ত্রের কাছে নরবলির দৃশ্যটি আর অলীক বলে মনে হয়নি। অবশ্য কবির কথাটি কারু মনে পড়েছে কিনা জানি না। অলক্ষ্যে অগোচরে পূর্ববর্তীর চিন্তা ও কর্ম আমাদের ভাবনাকে প্রভাবিত করে সেটা স্বীকার করাই পিতৃপূজো, বর্তমানের আধুনিক সুসভ্য মানুষ তা করতে পারে না। সম্প্রতি "Common Sense and Nuclear Warfare" নামে বার্ট্রেন্ড রাসেলের একটি বইতে তিনি লিখেছেন, "এরপর আমরা স্বাদেশিকতার বিপজ্জনক দিকগুলির প্রতি মন দেব"—তারপর যা বলছেন 'ন্যাশনালিজম্' গ্রন্থে তা দুই যুগ পূর্বে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে কয়েকজন জ্ঞানী একমত হয়েছিলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোঁলা ও রাসেল অগ্রগণ্য যদিও ইংল্যান্ডে হয়ত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এখন বিস্মৃত।

বর্তমানের মেকানাইজড যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন অবান্তর। একদিক থেকে দেখলে, জয়ী ও পরাজিত এক হয়ে যায়। মৃত্যু, ধ্বংস ও মনুষ্যত্বের ক্ষয়ে উভয়ের অবস্থা হয় সমান। অথচ যে উদ্ধত জাত্যভিমান, অন্যের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব শোষণের ইচ্ছা বাড়িয়ে তুলে যুদ্ধ বাধায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ন্যাশনালিজম্' গ্রন্থে তাকেই নিন্দা করেছিলেন। হৃদয়হীন মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয় লোভের তাড়নায়। সে সময়ে সামন্ত-যুগের প্রভাব

---

[১] *New York City Sun*, Dec. 2, 1916.

কাটিয়ে জমিদার-শ্রেণীর পরিবর্তে যে নূতন বণিক-সমাজ বা শিল্পপতিদের ধনী-সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাদের বলদর্পিত বিত্তস্পৃহা বিভিন্ন দেশের পণ্যের বাজার খুঁজে ফিরেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে সাম্রাজ্য বাড়াবার উৎকট প্রয়াস। কিন্তু শত শত শান্তিপ্রিয় মানুষের ভালোবাসা-ভরা সংসার গেছে এরই উত্তাপে শুকিয়ে। 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থ একটা বৃহৎ শক্তিশালী শ্রেণীকে আঘাত করেছিল, আর তারাই ছিল রাষ্ট্রশক্তির মেরুদন্ড। ফলে আমেরিকায় ব্রিটেনে এই বইয়ের প্রচার বন্ধ হল। কারণ যুদ্ধবাজরা মনে করেছিলেন, এ বই যুবকদের মন "বিষিয়ে দেবে", তাদের যুদ্ধবিমুখ করবে। যুবকদের জিজ্ঞাসু মনে এ বই কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল সন্দেহ নেই—ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে এ বইয়ের টাইপ-করা কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হত।

রবীন্দ্রজীবনীতে আছে : "ন্যাশনালিজম গ্রন্থ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। ফরাসী দেশে ইহার অনুবাদ হয় অনেক পরে। শোনা যায় যুদ্ধের মধ্যে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে টাইপ-করা কপি সৈনিকদের মধ্যে চালাচালি হইত। Max Plowman নামে একজন তেজস্বী ইংরেজ যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগদান করেন, কিন্তু ১৯১৭ সালে "ন্যাশনালিজম" পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি যুদ্ধ করিবেন না স্থির করায় সমর-বিভাগীয় শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "What to do when the personal application of such words came home to me, I did not know but what not to do was plain as a pike staff and in the moment of that recognition I had ceased from organized war for ever." (এই বাণী যখন উপলব্ধি করলাম তখনও জানি না ব্যক্তিগত জীবনে কী করে একে কার্যকরী করা যাবে, কী করা উচিত। কিন্তু কী করা উচিত নয় তা আমার কাছে জলের মত সহজ হয়ে গেল। আমি সংঘবদ্ধ যুদ্ধ থেকে নিজেকে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করলাম।)।

শোনা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যেদিন বিরতি হয় সেই দিনই সন্ধ্যায় ক্লেমেন্সো কাউন্টেস ডি নোয়ালিসকে গীতাঞ্জলির কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য ডেকেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রীর ও মানবতার বাণী তাঁর কবিত্বের শক্তিতে এক অমোঘত্ব লাভ করেছিল। জয়ী ও পরাজিত—উভয় দেশের মানুষের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁদের জীবনের বাস্তব ভূমিকায় তাঁর গান সত্য হচ্ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও করুণ একখানি চিঠি উইলফ্রেড ওয়েনের নিদারুণ মৃত্যুর পর তাঁর মার কাছ থেকে এসে-

ছিল। উইলফ্রেড ওয়েন তরুণ কবি—তার সুকুমার মন যুদ্ধের বিপরীত-ধর্মী—কিন্তু যুদ্ধে যোগ দিতে হবে সকলকেই। উইলফ্রেডের মা লিখেছিলেন :

প্রিয় সার রবীন্দ্রনাথ,

আপনি লন্ডনে এসেছেন শোনা পর্যন্ত আপনাকে চিঠি লিখবার সাহস সঞ্চয় করছি। আপনাকে যে একটি কথা বলবার আকাঙ্ক্ষা ছিল আজ তা এ চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে। এ চিঠি হয়ত আপনার কাছে পৌঁছবে না। কারণ আপনার ঠিকানা আমার ঠিকমত জানা নেই। তবু আমার বিশ্বাস খামের উপর আপনার নামই যথেষ্ট হবে। প্রায় দু বছর আগে আমার প্রাণপ্রতিম জ্যেষ্ঠ পুত্র শেষবারের মত যুদ্ধে চলে যায়। যেদিন সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল সেদিন আমরা দুজনে সূর্যমহিমায় সুন্দর সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বুকভাঙা কষ্ট নিয়ে চেয়ে ছিলাম ফ্রান্সের দিকে। তখন সে, আমার কবি-পুত্র, আপনার সেই আশ্চর্য বাণী উচ্চারণ করল :

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই—
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

তারপর তার ডায়েরির খাতাখানা আমার কাছে ফিরে এল, আমি দেখলাম তার হাতের প্রিয় অক্ষরে লেখা এই লাইনটি, আর তার নিচে লেখা আপনার নাম। সমস্ত কবিতাটি কোন্‌ বইতে পাওয়া যাবে এ কথা আপনার কাছে জানতে চাওয়া কি অন্যায় হবে?

বীভৎস যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে আমার পরম সম্পদ পুত্র মারা গেল। যুদ্ধবিরতির দিনে আমাদের কাছে সে দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল। আমার পুত্রের রচিত একটি ছোট কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

সেখানে (অর্থাৎ যুদ্ধফ্রন্টে) যে দুঃসহ কষ্ট সে দেখেছিল আর দেশের বেশীর ভাগ লোকের যে হৃদয়শূন্যতা, এবং যুদ্ধের ব্যর্থতা—সব মিলে তার মন যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। সে নিজের কষ্টের কথা কিছুই বলেনি, কিন্তু যে কেউ তাকে ভালোবাসে, তার লেখাগুলো পড়লে সকলেই বুঝবে যে কী বেদনা ভোগ করলে তবে অমন করে লেখা যায়। তার বয়স হয়েছিল মাত্র পঁচিশ। যা কিছু সুন্দর তাই উইলফ্রেডের প্রিয় ছিল—তার জীবনই ছিল সুন্দর। শ্রেয়ের প্রভাব ছিল সে সুন্দর জীবনে। আমাদের পরম পিতা জানেন কখন তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার উপযুক্ত সময় হয়েছিল। তাই আমি বিদ্রোহ করব না। আমি জানি তিনি প্রেমময়—আমার কাছে ফিরে আসাই যদি আমার পুত্রের পক্ষে শ্রেয় হত তাহলে

তিনি নিশ্চয়ই আমার দিনরাত্রির আকুল প্রার্থনা পূরণ করতেন। তাই আমি প্রণত মস্তকে এ আঘাত মেনে নিয়েছি, নম্রভাবে বাকি ক'টা দিন যতদিন না আবার দেখা হয় কাটিয়ে দেব। আমাদের পরিত্রাতা যেখানে আমাদের প্রত্যেকের জন্য যথাযোগ্য স্থান প্রস্তুত করে রাখতে গিয়েছেন সেখানে আবার নিশ্চয় দেখা হবে। আপনাকে এত বড় চিঠি লিখব ভাবিনি। ক্ষমা করবেন। আমার একান্ত ইচ্ছা আমার পুত্রের ক্ষুদ্র বইখানি আপনি পড়েন। যদি আপনি আমাদের এ অনুগ্রহ করেন তবে আপনার অনুমতি পেলে আপনাকে একখানা বই পাঠিয়ে আমরা গৌরবান্বিত হব। এই শরৎকালে বইটি Chatto & Windus কর্তৃক প্রকাশিত হবে।

সপ্রশংস শ্রদ্ধাবনতা
উইলফ্রেড ওয়েনের মা
সুসান এইচ ওয়েন

আমেরিকায়

Examiner কাগজের সংবাদদাতারা লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাগজের নির্ভুল সংবাদ প্রকাশের প্রশংসা করেছেন। বিশেষত কবির নিজের বক্তব্যগুলি সঠিকভাবে সততায় সঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। বস্তুত এই সততার অভাব নানা স্থানেই বড় বেশীরকম প্রকাশ পাওয়াতে কবি ভারি উত্ত্যক্ত বোধ করতেন। তাঁর সূক্ষ্ম ভাবনার ঊর্ণজাল সাংবাদিকের স্থূল-হস্ত-অবলেপে বারে বারে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে অধৈর্য হতেন। সাংবাদিকদের জেরাও বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে লাফ দিয়ে চলত।

"হোটেল আলেক্সেন্দ্রিয়ায় কবি তাঁর নিজের কক্ষে বসে আছেন। তাঁর চোখে কবির স্বপ্ন আর তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে নানা তত্ত্ববাণী যার ভাষা সাধারণ ইংরেজি-ভাষাভাষী বা কুভাষীর তুলনায় অলৌকিক বাক্যের মত মনে হয়। তাঁর সঙ্গে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। তিনি বললেন, 'আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় যে আমি বিবাহ-প্রথায় বিশ্বাস করি কি না—কিন্তু এরকম যে কোনো প্রশ্ন হতে পারে তা আমার আগে কখনো মনেই হয়নি। বিবাহব্যবস্থা মানবসম্বন্ধের আপন অন্তর্নিহিত প্রয়োজনেই উদ্ভূত হয়েছে। এ শুধু একটা সুবিধা তৈরি করে নেওয়া মাত্র নয়। মানুষের কামনা ও যৌনসম্বন্ধ সংযত করা একান্ত প্রয়োজন।

'তবে যখন আপনারা বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্ন তোলেন সে অন্য কথা। জানি না কোথায় তার সীমা দেওয়া যায়। সকল সম্বন্ধের মধ্যেই মুক্তির উপায় থাকা উচিত। এমনকি দেখুন মা ও সন্তানের, ভাই ও বোনের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তার মধ্যেও মুক্তির পথ রয়েছে। সন্তান বাপ-মার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে...যদিও তাদের রক্তসম্বন্ধবন্ধন থাকেই তবু মুক্তিও থাকে—আমার মনে হয় সমাজব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের উপায় কিছু সহজ হতে পারে।'"

এই প্রসঙ্গে গল্পগুচ্ছের 'মুক্তির উপায়' গল্পটি মনে পড়ে। সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশ ও সমাজের কাহিনী হলেও সম্ভবত এই প্রশ্নই প্রচ্ছন্ন-ভাবে ঐ গল্পের মর্মে আছে। সম্বন্ধ যেখানে নিতান্ত তিক্ত হয়ে উঠেছে—যা হতে পারত কুসুমগ্রন্থি তা হয়েছে লৌহশিকল, যে সম্বন্ধের বন্ধনের মধ্যে পড়ে প্রাণপাখি আছড়াচ্ছে কিন্তু মুক্তির উপায় নেই—সেইরকমই এক শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যে পড়ে মাখনলাল তার দুই স্ত্রীর দিকে দেখিয়ে বলেছিল—"ইনি আমার দাঁড়, আর উনি আমার কলসী।"

মানবসম্বন্ধের যে মাধুর্যের মধ্যে কবি দেখেছেন মুক্তি, দেখেছেন অসীমের চিহ্ন, সেই সম্বন্ধই তার স্বমহিমাভ্রষ্ট হলে হতে পারে বন্ধনের খুঁটি, বলির যূপকাষ্ঠ।

বিবাহবিচ্ছেদ প্রসঙ্গ হয়ে গেলেই সাংবাদিকরা আমেরিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন শুরু করলেন। নানা বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করে নেওয়া উদ্দেশ্য। আমেরিকা দেশটি কেমন লাগছে ঐ প্রশ্নেরও বহুবার সম্মুখীন হতে হয়েছে ডায়লেমার দুই সিং-এর খোঁচার মধ্যে দারুভূত মুরারির মত। ভাল লেগেছে চমৎকার লেগেছে বললে শোনায় তোষামোদের মত। লাগেনি বললে শোনায় রূঢ়। কাগজের সাক্ষ্যপ্রমাণ বলে কবি একাধিকবার রূঢ় মন্তব্যই করেছেন যা সাধারণত তাঁর স্বভাবের বিপরীত। সম্ভবত অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে থাকবেন।

"তিনি একটু থেমে এদেশের সম্বন্ধে তাঁর মত বললেন। এই মত বেশ তেঁতো বড়ি, তবে তাতে রোগের উপশম হতে পারে! তিনি বললেন, 'এদেশের লোকদের গেঁয়োমি আছে, সম্ভবত তাদের স্বভাবের রূঢ়তাও আছে। আশা করি ক্রমে এগুলি ক্ষয়ে আসবে ও মানুষে ও প্রকৃতিতে ক্রমেই সামঞ্জস্য সাধন হবে। বিশেষ করে একটা জিনিস আমায় আশ্চর্য করেছে। .হয়ত সেটা পাশ্চাত্য মনের একটা অভ্যাস যে এদেশে লোকেরা বিদেশী কোনো কিছু সহ্য করতে পারে না। তারা তাদের নিজেদের অভ্যাসের চেয়ে যা কিছু পৃথক—তা বহিরঙ্গ ব্যাপারেই হোক কি আত্মিক ব্যাপারেই হোক—বুঝতেই পারে না।" এই কথা বলে তিনি তাঁর নিজের পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

"কিছুদিন পূর্বে কবি যখন সমুদ্রতীরে বসে আছেন তখন এক অর্বাচীন এসে তাঁর দীর্ঘ পরিচ্ছেদের একটি অংশ তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল :

'Hey, what is this! Is this a kind of bath robe?'

কবি বলে চলেছেন, "এ বিদ্রূপের কারণ শুধু এই যে আমি এমন পোশাক পরেছি যা বিদেশী। যদিও তা কোনো অংশেই শালীনতায় সৌন্দর্যে এদেশের পুরুষের পোশাকের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। এবং তাতে লজ্জিত হবার কোনো কারণই নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে যে কোনো বিদেশী এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারে, সে বিদেশী বলেই তাকে কেউ অসম্মান করতে পারে না! সে যে সেই দেশের অভ্যাস ও আচারব্যবহার জানে না সেজন্য বিদ্রূপের ভাগী হয় না—কেউ আশাই করে না যে সে সব জানবে। তোমাদের দেশের ব্যবহার যে কত পৃথক তা ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়। Santa Barbara-তে আমাকে দেখে মেয়েরা হাসাহাসি করেছিল—কিন্তু সেই মেয়েদের সৌন্দর্য-লাবণ্য ও স্বচ্ছন্দ জড়তাহীন

চলনভঙ্গিমার আমি প্রশংসা করেছি এবং তাদের বিদ্রুপহাস্যকে ক্ষমা করে আজও করি। আমার সত্যিই ভারি বেদনা বোধ হয় যখন তোমাদের স্বভাবে যা কিছু বিদেশী তা যদি তোমাদের নিজেদের জিনিসের চেয়ে ভালও হয়, তবু তার প্রতি তোমাদের এমন বিরুদ্ধতা দেখি।”

১৯১৬ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ বসু আমেরিকান রীতি সম্বন্ধে লিখছেন :

“আমেরিকায় ঐক্যভাব এত তীব্র যে একেবারে মূলত পৃথক এমনও সব কিছুই এক হয়ে যেতে বাধ্য হয়! ভাষা, শিক্ষা, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ও জনমত এইগুলিই সেই মিলের রসায়ন। যদি কোনো বিদেশী জনমত অগ্রাহ্য করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার মত জোর দেখায় তাহলে সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে পড়ে ও ব্যবসায়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ‘যদি আমাদের দেশ ভালো না লাগে চলে যাও, বা অন্যেরা যেমনভাবে চলে তেমনি চলো’—সাধারণত আমেরিকার এই দাবি! আমার প্রথম জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে হাসি পায়! নূতন অবস্থায় মানিয়ে নিতে আমার সময় লাগছিল, যাহোক আমার অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে আমার আচরণ বেশভূষা সবই বদলে যাচ্ছিল। শুধু পাগড়িটি আঁকড়ে ধরেছিলাম। যদিও সেটি কলেজে কম হাস্যোদ্রেক করেনি তবুও আমার স্বাজাত্যের এই শেষ চিহ্নটি ছাড়তে রাজী হইনি। একদিন কলেজের ক্লোকরুমে পাগড়িটি ফেলে গিয়েছিলাম—ফিরে দেখি তার বর্ণনাতীত শোচনীয় দুর্গতি। সে বেচারীকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বধ করা হয়েছে! অতএব দীর্ঘবিলম্বিত হলেও সেই অসমঞ্জস আমেরিকান ডার্বি টুপিতে সাজতেই হল।”

বলা বাহুল্য আমেরিকার এই স্টীমরোলার চালিয়ে একীকরণের রীতিকে তিনি সাধুবাদ দিতে পারেন না, যিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনকেই ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে ঘোষণা করেছেন। যিনি বলেছেন, “পাঁচটি বিভিন্ন ফুলকে কুটে দলা পাকালেই তাকে শতদল বলে না”...তাঁর মতে বিশেষত্ব বিসর্জন করে সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়ে তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম নয়। তা ফাঁকি। বিশেষত্বকে মহত্ত্বে নিয়ে গিয়ে যে সুবিধা তাই সত্য।

আমেরিকায় অবশ্য ভারতীয়দের নিজের পোশাকের বিশেষত্ব রাখার জন্য প্রয়োজনও ছিল। বাঙালীর ছেলে সাধারণত পাগড়ি পরে না, তবু যে যুবক সুধীন্দ্র বসু পাগড়ি আঁকড়ে ছিলেন তার কোনো গূঢ় কারণ থাকা সম্ভব। গল্প আছে যখন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় ওয়াশিংটনে Disarmament Conference-এ যোগ দিতে যান সে সময়ে এক কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে উঁচু-টুপি-পরা শাস্ত্রী মহাশয়কে নাকি জনান্তিকে

বলেছিল—"দেখো ভাই, এসব জায়গা আমাদের মত নিগারদের জন্য নয়। যদি তুমি পাগড়ি পর তাহলে আমেরিকার লোকে তোমাকে হয়ত হিন্দু সাপুড়ে, জাদুকর বা জ্যোতিষী মনে করে নিতেও পারে। তাহলে অবশ্য হতভাগা নিগারের চেয়ে তোমার অবস্থা ভালই হবে। তাই বলছি টুপিটা ফেলে দাও।"

শোনা যায় শাস্ত্রী মহাশয় উপদেশটি পালন করেছিলেন।১

১৯২০ সালে 'ওয়াশিংটন' নামক কাগজে এডিসনের মেশিন বলে একটি যন্ত্রের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ঐ যন্ত্র মৃত্যুর পরে সত্তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে এই ছিল প্রতিপাদ্য। এই সময়ে কবির 'পার্সোনালিটি' নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় ও ঐ বিষয়ে নানা স্থানে বক্তৃতা করায় মারগারি রেক্স নামক এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে ঐ যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসেছে। জীবনসত্তার দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে আত্মার ভৌতিক অনুসরণ চেষ্টায় যে বিপুল পার্থক্য আছে হুজুকপ্রিয় আমেরিকানদের তা ধারণা করা শক্ত।

মারগারি রেক্স কবির সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এসে তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগল—মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকবে কিনা এবং এডিসনের মেশিন সম্বন্ধেই বা তাঁর মত কী। এই এডিসন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কিনা এবং তাঁর এ যন্ত্রেরই বা কী পরিণতি হল সে সম্বন্ধে আর কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। এডিসনের মেশিন দিয়ে যে ব্যক্তিসত্তার জীবনোত্তর অস্তিত্ব ধরা যাবে এ কথা কবির কাছে বিশেষ গ্রাহ্য হল না।

তিনি বললেন: "পরজীবন সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই মনে করতে পারি যে, যা ঘটবে তাতে নিশ্চয় মঙ্গলই হবে।......মৃত্যু আছে, তা সত্ত্বেও জীবন ফুরায় না...জীবনের সকল অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যই আছে, বিরোধ নেই। যে নূতন পৃথিবীতে এল তার সঙ্গে যে জীবন পৃথিবীতে ছিল তাকে গ্রহণ করবার জন্য, তাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সামঞ্জস্য আছে ('ছিল আমার মা অচেনা নিল আমায় কোলে') তেমনি যে জীবন শেষ হবার মুখে সেও যে নূতন অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে আশা করা যায় সেখানেও বিরোধ থাকবে না, সামঞ্জস্য থাকবে...আর এডিসনের যন্ত্র সম্বন্ধে আপনারা আমার মত জানতে চান—এই যন্ত্র দিয়ে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ব্যক্তিসত্তার মৃত্যুর পরও অস্তিত্ব থাকে কিনা। কিন্তু আমরা এই লোকে থেকে কখনই স্থির করতে পারব না যে, মৃত কোনো অবিনাশী সত্তার আমাদের তৈরি যন্ত্রে সাড়া দেবার উপায় বা ইচ্ছা থাকবে কিনা। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে আমার আশা ও বিশ্বাসের শেষ নেই—তবে মানুষের

---

১ *Modern Review*, March. 1927

কাছে তার প্রমাণের জন্য আমি কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন দেখি না। ধরা থাক, মেশিন সেই সত্তার কাছে কোনো খবর পেঁছতে পারল না, আমার কাছে তা হলেই তার অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয়ে যাবে না…।”

এইভাবে কিছুক্ষণ বলে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ ডিম ও পাখির উদাহরণটি দিলেন। এই উপমা-সংযুক্ত জীবন-মৃত্যুর আলোচনা একাধিকবার হয়েছে কিন্তু উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মবাদী দার্শনিক কবির জীবন-মৃত্যুর পরিপূরকতার বোধ প্রতীচ্যের স্থূল বস্তুতন্ত্র ও যুক্তিবাদের ভূমিকায় পূর্ণ প্রকাশিত হতে পারেনি। অবাঙ্‌মানসগোচর বিষয়কে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনতে যারা গিয়েছে তাদের সঙ্গে কী তর্ক করবেন যিনি জানেন—যস্যা মতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ…

১৯২০ সালে ‘নিউইয়র্ক সিটি’ নামে কাগজে একটি খবর ছাপা হয়। খবরের উপর প্রকান্ড শিরোনামা—‘সার অলিভার লজ ও তাঁর শিষ্যদের প্রামাণ্য ভারতীয় কবি কর্তৃক বাতিল।’ এইরকম সব শিরোনামাভূষিত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের জন্য কবি একেবারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠতেন। যা গুরু তাকে লঘু করার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই। তত্রাচ এইরকম বেখাপ্পা শিরোনামায় অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ কলমে ইতস্তত অনেক খবর ছড়ানো আছে—যার আবর্জনা বাদ দিলেও যা বাকি থাকবে তার মূল্য কম নয়! অলিভার লজের মতামত এবং প্ল্যান্‌চেটের সাহায্যে পরলোকগতের সঙ্গে আলাপ সম্বন্ধে কবির সঙ্গে আলোচনা করতে যে আমেরিকানটি গিয়েছিল অনুমান করা যায় যে, সে ভেবেছিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ভারতীয় কবির কাছে নিশ্চয় পারলৌকিক বিষয়ে অনেক অনুকূল তথ্য পাওয়া যাবে—এমনকি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার খবর পাওয়াই বা কি অসম্ভব! কিন্তু ফল বিপরীত হল। তিনি লিখছেন :

“রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কিন্তু পূর্ব দেশ পশ্চিমের প্রতি মিডিয়ামের সাহায্যে টেবিল চলা প্রভৃতি ভৌতিক পরীক্ষার বিষয়ে এক বিন্দুও সহানুভূতির বাণী পাঠায়নি। আমাদের উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে ভারতের মহাকবি বললেন, ‘মৃত্যুর পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে লাভ কিছুই নেই—জীবনের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বোধ আছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে যে সে কী আকার নেবে সে সম্বন্ধে কোনোই ধারণা নেই, যেমন ডিমের ভিতরে বন্দী পাখির ছানা জানে না তার খোলসের প্রাচীরের বাইরের জীবন কীরকম।’ কবি এই পর্যন্ত বলে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি বন্ধ করলেন—চোখ বন্ধ করবার কি কোনো রীতি আছে? এতে আমরা, তাঁর আমেরিকান শ্রোতারা, ভারি বিস্ময়বোধ করি। তাঁর মৃদু অন্তর্ভেদী উচ্চগ্রামে বাঁধা কণ্ঠস্বরে তিনি কথা বলতে লাগলেন, সে

কথা যেন কোনো অন্তরস্থ কর্তার নির্দেশে বেরিয়ে আসতে লাগল। অক্সফোর্ডে শেখা ইংরেজির মত নির্ভুল ভাষা ও উচ্চারণে তিনি বলে চললেন : ‘এ জীবন ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে এক মস্ত যবনিকার আড়াল, তার নিশ্চয় কোনো অর্থ আছে যেমন ডিমের খোলার ভিতর শাবককে রাখার কোনো মানে আছে। যদি সম্পূর্ণ তৈরি হবার আগেই খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসা, বহির্জগতের পরিচয় নেওয়া, শাবকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হত তাহলে নিশ্চয় জানবেন, তার কোনো ব্যবস্থাও থাকত। কিন্তু সময় না হলে খোলস যে ভাঙা হয় না—পক্ষিশাবকের জীবনের মধ্যে ডিম্বকালের পক্ষে সেইটাই হিতকর।...

‘মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে একটা সঠিক স্থির ধারণা করে নেওয়া চলে না—সেটা করতে চেষ্টা করাই materialistic, সে শুধু অসীমকে সীমা দেবার চেষ্টা করা। লোকে এমনভাবে কথা বলে যেন তারা পরকালের বিষয় সমস্ত খবরই রাখে। আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধেও বিস্তারিত সবই তাদের জানা! এতে শুধু সেই অসীম চিরপ্রশ্নগুলিকে সীমা দিয়ে কলঙ্কিত করা হয়—এ আমার একেবারেই ভালো লাগে না!’

“ঠাকুর সহসা তাঁর চোখ খুললেন, তখন মার্জিত অনিকস ও অ্যাম্বার মাণিক্যের মত তাঁর সে চোখের দৃষ্টির দীপ্তি সব নিকটস্থ ব্যক্তিদের মর্মভেদ করে গেল। পর মুহূর্তেই তিনি চোখ নিচু করলেন ও বলে যেতে লাগলেন :

‘আত্মা পাখির মত আকাশচারী হতে চায়—এইসব অনুসন্ধান, তর্ক ও ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা তার সেই মুক্ত পক্ষের শুধু বাধা সৃষ্টি করে। এর দ্বারা আমরা স্থান ও কালের ধারণার সঙ্গে বাঁধা পড়ে থাকি। তাতে অনন্ত বা অসীমের বোধ জন্মাতে বাধা হয়। আমাদের সাধনা হোক কালজয়ী হবার, পাওয়া চাই সেই আনন্দ যা পরমানন্দ...যে আনন্দবোধ আমাদের অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো খবর দেয় না, শুধু অনন্তের সংবাদ দেয়—যা অসীম শাশ্বত ও চিরবর্তমান।’

“কোনো গভীর ভাবনা ছায়ার মত কবির স্থির মুখের উপর ভেসে গেল”—তিনি বলে চললেন :

‘যদি বর্তমান ক্ষণের মধ্যে শাশ্বতের বোধ জন্মায় তাহলেই অমরত্ব লাভ হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উপায় পন্থা কৌশল ও তর্ক-বিতর্ক এসবের স্থান নেই। আছে শুধু বর্তমানের বোধ। স্থান ও কালের বন্ধন বা যা কিছুই অসীমকে খণ্ডিত করতে-চায় সে সমস্তই পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বর্তমান মুহূর্তের মধ্যে পূর্ণ শান্তি ও সামঞ্জস্য লাভের সাধনা করে এবং সেই সাধনায় সে লক্ষ্যভেদ করে অনন্তে প্রবেশ করে—’

"আগন্তুকদের মধ্যে একজন বললেন, 'তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রবাবু, আমরা পাশ্চাত্য দেশে জন্মান্তরবাদের তত্ত্বে মোহিত হয়েছি—এবং আমাদের চিন্তায় ও সাহিত্যে তার প্রভাব বেড়ে চলেছে—'

"ঠাকুর অত্যন্ত নিরুৎসাহে বললেন, 'হবে, আমার কোনো মতবাদ নেই, আমি কোনো 'বাদ'-এ বিশ্বাস করি না।'

"আমাদের মধ্যে একজন বললেন, 'কিন্তু আপনার চেয়ে সুন্দর করে জন্মান্তরের গান তো কেউ গায়নি, বলে তিনি মৃদু স্বরে আবৃত্তি করতে লাগলেন :

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার
কতরূপ ধরে পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার—

কবি তাঁর অর্ধনিমীলিত চিন্তানিমগ্ন দৃষ্টি তুলে বললেন, 'অসম্ভব নয় যে, আমরা বারে বারে জন্মাই—কিন্তু সে কেবলই আন্দাজী কথা, অনন্ত আমাদের বালকোচিত খুঁটিনাঁটি কৌতূহল মেটায় না।'

আমেরিকান আগন্তুক বললেন, 'রবীন্দ্রবাবু, আপনি মিস্টিকেব ভাবে কথা বলছেন। আপনার কথা প্রেমের পথের সাধকের মত, যাঁরা জ্ঞানের আর সমস্ত পথকেই অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু আমাদের কাছে ভারতীয় ঋষিদের ও অন্যান্য দেশের সাধুদের প্রামাণ্য বাক্য আছে যাঁরা প্রেমের পথের সঙ্গে অন্য পথের রহস্য মিলিত কববাব সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। পশ্চিমের প্রকৃতিই হচ্ছে জ্ঞানের অনুসন্ধান করা এবং বস্তুজগতের বাইরেও যে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে ক্রমেই এ সত্য পশ্চিমের মনে উদয় হচ্ছে। যদি ডিম্ববন্ধ শাবকের সেরকম চেতনা থাকত যাতে বহির্জগৎ সম্বন্ধে ধারণা করবার তার ক্ষমতা জন্মাতে পারে, আমরা তাহলে তার সেই ক্ষমতাকে চর্চার দ্বারা উন্নত করতে উৎসাহ দিতাম। তাহলে হয়ত তার ফলে সেই সাধারণ শাবক মহাশাবকে পরিণত হত।'

"কবি তাঁর সুগঠিত সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করলেন, যেন মনে হল এ আলোচনায় একটু শ্রান্তি বোধ করছেন। তিনি বললেন :

'আমার যা কিছু জ্ঞান তা শুধু বীণাপাণির (muse) দরজায় পেয়েছি, সত্যকে উপমার মধ্য দিয়ে ধারণা করে আমি তাকে আপন করে নিই।

আমি এ পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে সত্যের অনুসন্ধান করিনি—একমাত্র এই পথই আমার—'"

জন্মান্তর প্রসঙ্গে কবি নিজেই স্টপফোর্ড ব্রুক্‌স্‌-এর সঙ্গে তাঁর আলোচনা লিখেছেন :

"কথায় কথায় তিনি (স্টপফোর্ড ব্রুক্‌স্‌) এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কিনা। আমি বললাম, 'আমাদের বর্তমান জন্মের বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নেই এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করিনে, কিন্তু যখন চিন্তা করে দেখি তখন মনে হয়, এ কখনো হতেই পারে না যে আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিস...যে বিশেষ কারণবশত জীবনটা বিশেষ দেহ ধরে প্রকাশ পেয়েছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হয়ে এ জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেল, এ মতটা স্বীকার করতে মনে বাধে। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হতে হতে আপনাকে পূর্ণতর করে তুলছে, এইটেই সম্ভবপর বলে বোধ হয়। কিন্তু পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরবে একথাও আমি মনে করতে পারিনে। কেননা প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়, সেই ধারায় হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত।' স্টপফোর্ড ব্রুক্‌স্‌ বললেন, তিনিও জন্মান্তরের বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা যখন একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করব তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হয়ে জাগ্রত হবে। এ কথাটা আমার মনে লাগল। আমার মনে হল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করে ফেলি তখন তার সমস্তর ভাবটা পরস্পর গ্রথিত হয়ে আমাদের মনে উদিত হয়; শেষ না করলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করে এক-একটা জন্মমালা গেঁথে চলেছি; গাঁথা শেষ হলেই যে একেবারে ফুরিয়ে যায় তা নয়, কিন্তু একটা পালা শেষ হয়ে যায়, আর তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করে গ্রহণ করতে পারি।"

স্টপফোর্ড ব্রুক্‌স্‌-এর সঙ্গে এ আলোচনার প্রায় ১৮ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে লিখছেন : "জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি, তখন আমাদের ভিতরকার অনন্ত সৃজন-রহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে—প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে গেলে যেমন সমস্ত বাক্যটির অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না, সেইরকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনব্যাপারের ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি

করি। বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলেছে; আমার সুখ-দুঃখ, বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান করছে...”

স্যার অলিভার লজের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়েছিল আমরা জানি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী। মৃত আত্মার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, প্ল্যানচেট্ কৌশল ইত্যাদিতে তাঁর বিশ্বাস তিনি নানা প্রমাণসহযোগে লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ-বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছিল, তা এখনও আমার গোচরে আসেনি। তবে দেখছি ১৯২৮ সালে ‘স্ট্র্যাফোর্ডশায়ার সেণ্টিন্যাল’ বলে একটি কাগজে, স্যার অলিভার লজের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। স্যার অলিভার নাকি একদা রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আপনারা কি ভারতবর্ষে টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন?” কবি নাকি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, “বিশ্বাস করি! আমরা প্র্যাক্টিস করি!”

এ-খবরের সত্য-মিথ্যা জানি না, তবে সমস্ত বিষয়েই তাঁর গোঁড়ামিশূন্য অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যেও সত্যানুসন্ধানে অনুপ্রবিষ্ট হত। কিন্তু তাঁর কাব্যে, অনুভবে ও বাণীতে কোথাও অতিপ্রাকৃতের স্থান নেই—এই প্রকৃতি তার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে, এই মানুষ তার ‘স্নেহ-প্রেম-বুদ্ধি-মন’ নিয়ে তাঁর কাছে ছিল ‘অসীম বিস্ময়াবহ।’

পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতায় বর্ধিত হুজুকপ্রিয়তা ও ভিড়-ঠেলাঠেলি কবিকে অন্তরে পীড়িত করত—মনুষ্যত্বের এই ক্ষয়ে তাঁর ক্ষোভ এত সত্য ছিল যে, কোনো সুবিধার প্রলোভনেই তা প্রকাশ না করে পারতেন না। সেজন্য যাদের সন্তুষ্ট করতে গিয়েছেন তাদের অসন্তোষভাজন হয়ে পড়তেন। বস্তুত তিনি তো আমেরিকাকে সংশোধন করতে যাননি—প্রচারকের উদ্দেশ্যও তাঁর নয়। তাঁর এই ভূ-পরিক্রমার আপাত উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ। কিন্তু সে উদ্দেশ্য একেবারেই বহিরঙ্গ—ভিতরের কোন্ অন্তর্গূঢ় গভীর উদ্দেশ্য আপন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এই পরম দ্রষ্টার মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের বেদনা, তার সাধনা, তার বাণী উচ্চারিত করে সাধিত হচ্ছে তা শুধু তিনিই জানতেন যিনি ভারতভাগ্যবিধাতা।

ভদ্রতায় নম্র, শোভনবচন, মোহনমূর্তি কবি তো মানুষকে খুশি করতেই চান কিন্তু “হিতং মনোহারি চ সুদুর্লভং বচঃ।” যা হিত তা সব সময় মনোহারী করে তোলা মুশকিল এবং যা সত্য তাই সর্বদা প্রিয় হতে পারে

না। আমেরিকায় বসে নানা লোকের কাছে ন্যনা প্রসঙ্গে কবি তাই বললেন—'তোমাদের স্বরূপটি আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

—"আমি তোমাদের জগৎ জানি না। আমি তোমাদের বেডরুম, ড্রয়িং-রুম, ডাইনিং রুম ইত্যাদি দেখেছি। তোমাদের বাইরের জীবন দেখেছি। তোমরা সর্বদাই কত কী জিনিসপত্র তৈরি করবার জন্য ছুটোছুটি করছ। তোমাদের কাজকর্ম আমার কিন্তু ভারি অর্থহীন বোধ হয়—আমি জানি না তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কী, তোমাদের জীবনের আদর্শই বা কী—খোলা বাতাসে, আকাশের নিচে প্রকৃতির কাছাকাছি যে জীবন বাড়ে তাতে ধ্যানের অবকাশ থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগ অনুভব করলে তবেই আপন অস্তিত্বের অর্থ পাওয়া যায়..."

"আমি এই দৌড়াদৌড়ি দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—তোমাদের এ কী অমানুষিক ব্যাপার। এ যেন ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি আর অর্থ উপার্জনেরই দেশ।"

বলা বাহুল্য, এ-ধরনের কথাবার্তায় অনেকে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। কেউ কেউ বললে, কবির মতামতগুলি বর্তমানকালের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—এর কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। আমরা মনুষ্য-সমাজ যা জানি তাতে এ'র মতে চলা চলে না।

কেউ বা বললে—কেনই বা আমরা টাকা খরচ করে এই বিদেশীর স্পর্ধিত নিন্দাবাক্য শুনব—? তিনি আমাদের নিয়ে মজা করবেন! কিন্তু একই সঙ্গে আবার বহুলোকেই কবির কথার সত্যতা অনুভব করলে।

"স্যার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের কোনো চেষ্টা নেই যদিও একটু চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যায় যে, আমেরিকান জীবনের হট্টগোল দূরপ্রাচ্যের সমাহিতচিত্ত এই দার্শনিকের কাছে নিতান্তই ব্যর্থ মনে হয়।"

এবং শুধু তাই নয় বহু, আমেরিকানের মনে সেই ব্যর্থতার বোধ জন্মাল শুধু তাঁর কথা শুনে নয়, তাঁকে দেখে, তাঁর আচরণের, তাঁর ভঙ্গীর প্রশান্তিতে। তিনি যখন নিউইয়র্কে বসে বললেন :

"জীবনটা শুধু অর্থপাগল কাজের জন্য কলে তৈরি দিন নয়, .জীবনে অবকাশের প্রয়োজন আছে। তোমাদের কর্মব্যস্ততায় তোমরা ভুলে যাও যে জীবনের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিস তা সরল। ধীরে ধীরে লাভ করা দরকার সন্তোষ, যা অর্থে কেনা যায় না। এদেশে খুব কম লোকেরই জীবনের ছন্দবোধ (poise) আছে। তারা আত্মসচেতন, আর অদ্ভুত—এমনকি সুন্দরভাবে ঘরে ঢুকতে বা বেরুতেও জানে না। তোমরা একে কী বল। টিনে পোরা গান, টিনে পোরা চিন্তা আর টিনে পোরা

ওরিজিন্যালিটি?...তোমাদের ওই ভুট্টার খৈ ভাজার যন্ত্রটার মতই আধুনিক জীবনাদর্শগুলি ফট্‌ফট্‌ করে লাফিয়ে উঠছে। সবকিছুই লাফ মারছে, নানাদিকে ছুটছে, কোনো শান্তি নেই স্থৈর্য নেই...”

১৯১৬ সালে এই মন্তব্যের পর এ-ভাব এতদিনে আরও শতগুণে বেড়ে গেছে। তবু তখনও নিতান্ত কম ছিল না। সেই ঠেলাঠেলির উদ্‌ভ্রান্ততার মধ্যেও অবশ্য স্থিতধী আত্মস্থ চিত্তের মহিমা যে কোনো আমেরিকানই অনুভব করেনি তা নয়। বহু সাধারণ লোকও তাঁর সামনে এসে দেখছে, ‘অশান্তির অন্তরে রাজে শান্তি সুমহান।’

যোশেফ গোলোম্ব বলে একব্যক্তি ‘নিউইয়র্ক সিটি ইভনিং পোস্ট’-এর তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি লিখছেন :

“রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় সাধারণতই পথে যেমনটি ঘটে থাকে তেমনটি ঘটল। টিউবের সুড়ঙ্গপথে খানিকটা ধাক্কা খেলাম—একটা এইটুকুন মেয়েকে নির্দোষ একটি ছেলেকে হিস্টিরিয়া-পাওয়া খিঁচুনি দিতে শুনলাম—দেখলাম মুহূর্তের জন্য সেই বালকের মুখ মর্মভেদী লজ্জায় লাল হয়ে উঠল—টিউবের গাড়িতে ভিড়ের চাপে আমার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্টেশন পার হয়ে গেলাম—তারপর সেই প্রচণ্ড ভিড় গুঁতিয়ে নামতেই হল, ফলে ধাক্কা খেলাম—কনুইর গুঁতো খেলাম, তারপর একটা ট্যাক্সির নিচে পড়-পড় হতে হতে বেঁচে গেলাম—ট্যাক্সিটা যে রাস্তার নিয়ম না মেনে পুলিসের শিষ অগ্রাহ্য করে হু হু শব্দে ছুটছিল কি-না! তাবপর হোটেলের ভৃত্য দ্বারা বারিত হয়ে, তার দাঁতখিঁচুনি খেতে হল, কারণ সেই ভৃত্যটি তার উপর কী নির্দেশ আছে তা ঠিকমত বোঝে নি, অতএব আমাকেও তাকে খিঁচুনি দিতে হল এবং পকেট থেকে অপর্যাপ্ত প্রমাণ বের করে বোঝাতে হল যে, সেখানে উপস্থিত হবার অধিকার আমার আছে! অবশেষে একটি শ্রান্তিহরণ স্বল্পালোকিত ঘরে প্রবেশ করে সেই “মিস্টিকের” জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। পথের এই যে তুমুল তাণ্ডব সে আমার অতিপরিচয়বশত লক্ষ্যই হয়নি। সত্য বলতে কি, সে বিষয়ে আমি কিছুই ভাবিনি যতক্ষণ না মুখ ফিরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছিলাম। তিনি ঘরে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করেছেন যে যদিও আমি তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলাম তবুও যেন অভাবিত কিছু ঘটার মতই চমকে উঠলাম। তাঁর সুদীর্ঘ পরিচ্ছদ ও শ্মশ্রুল আকৃতি বা তাঁর পদক্ষেপের নীরবতাই যে চমৎকারী তা নয়। তাঁর ভিতর থেকে যে গভীর প্রশান্তি উৎসারিত হচ্ছিল, যার সামনে যে কোলাহলের মধ্য দিয়ে আমি এসেছি তা মনে করলেও মন্দিরে ঢুকে চীৎকার করার মত বোধ হয়, সেই প্রশান্তিই আমার কাছে গভীর বিস্ময়াবহ। আমি কত প্রশ্নই তাঁকে করব

বলে এসেছিলাম—সাহিত্য, পলিটিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে। সহসা তাঁর সামনে এসে আমার বাক্য স্তব্ধ হয়ে গেল।' আমার নিজের প্রতি ধিক্কার এল। এই যে দাঁত খেঁচানো, কনুই গোঁতানো, ধাক্কা মারা, ঠেলাঠেলির মধ্যে আমি নিয়ত বাস করি, যা আমি অতি স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছি, তা কী অসম্মানজনক!

"আমি তাঁকে আমার মনের এ কথা বলেছিলাম। তিনি ধীর শান্তভাবে দ্রুতধাবমান কোলাহলে, মোটর গাড়ির সুতীক্ষ্ন চীৎকারে, গৃহগামী শহরের আর্তনাদ শুনছিলেন। যখন কথা বলতে শুরু করলেন তাঁর মৃদু স্বরে সামান্য একটু কম্পন ছিল—সেই ঈষৎকম্পিত মধুর ধ্বনি যেন প্রার্থনার মন্ত্রের মত উচ্চারিত :

'তোমরা পাশ্চাত্য দেশবাসীরা আমাদের নৈষ্কর্মের জন্য দোষ দাও। জানি পৌরুষ সুন্দর। জানি শক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু এদেশে তোমরা তার বড় অপচয় কর। তোমরা অনেকেই তোমাদের জীবনটাকে এমনভাবে খরচ কর যেমন করে অধীর লোক বাতি জ্বালায়। সে মোম বাতির একমুখে শিখা জ্বালিয়ে অধৈর্য হয়ে ওঠে যে সেটা তৎক্ষণাৎ কেন মশাল হয়ে জ্বলে উঠল না! তখন সে আবার অন্য মুখেও আগুন জ্বালিয়ে দেয় যেন সেটা সত্যি মশাল, সযত্নে রক্ষণীয় গৃহদীপ নয়। কাজেই সেই মশালের অতিকৃত আলোয় সে ভুল দেখে। আশ্চর্য নয় যে সে মশাল একেবারেই নিঃশেষে জ্বলে যায়, সে ব্যক্তিও ভুলেই যায় সে কী দেখতে চেয়েছিল। শুধু বাতি জ্বালাতেই মত্ত হয়ে ওঠে।'...

'তোমরা ছোট জিনিসের ভারে পীড়িত অত্যাচারিত। তোমাদের বসবার ঘরে ঢুকে দেখি কত অপ্রয়োজনীয় পদার্থের ভিড়ে ঠাসা আবর্জনার স্তূপ—তোমাদের পোশাকের আলমারিতে দেখি কত রকমের পোশাক—সকালের একরকম, বিকালের একরকম, একরকম কর্মস্থলে, একরকম প্রমোদে, একরকম আনুষ্ঠানিক (formal), একরকম প্রায়-আনুষ্ঠানিক (semi-formal)। অপেরাতে, চার্চে, রেসে, রাস্তায় সব আলাদা আলাদা—আমার পোশাক দেখে এদেশের লোকের হাসি পায়—কিন্তু আমি পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে তোমাদেব কাছে কিছু বলতে এসেছি বলেই কি যাত্রাদলেব মত পোশাকের বোঝা বয়ে বেড়াব, যাতে যত দেশে ও যত জাতের মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হবে, যাদের যাদের দেশের ভিতর দিয়ে যাব, তাদের মত বেশ বদল করতে করতে চলব. .'

"একটু দ্রুত স্বরে তিনি বলতে লাগলেন :

'তোমাদের কর্মোদ্যম চমৎকার, প্রকৃতিকে তোমরা জয় করেছ, পদার্থবিজ্ঞানে তোমাদের অসামান্য দক্ষতা, এসবের মূল্য অনেক—এখন সেদিন

সামনে এগিয়ে আসছে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের জাতি-অভিমান ফেলে রেখে, বণিক যেমন করে পণ্য বিনিময় করে, তেমনি করেই এসব মহৎ ভাবের আদান-প্রদান করবে! তোমাদের কত অমূল্য সম্পদ আছে যা তোমরা আমাদের দিতে পার। শুধু মনে রেখো, আমাদেরও তার বদলে কিছু দেবার আছে...প্রতিদিনই সেই সব পথ বিস্তৃত হচ্ছে যে-পথে পূর্ব ও পশ্চিম এক হয়ে যাবে।'

'সে পথগুলি কী?'

'এক তো তোমাদের ব্যবসায়, আর-এক হচ্ছে ধর্ম। তোমাদের স্বভাব-ঔদ্ধত্যের জন্য তোমরা দেখতেই পাও না যে আমাদের দেশের কাছেও শিক্ষণীয় কিছু আছে। কিন্তু ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতরা পূর্ব জগতের সাহিত্যের দরজা খুলে দিয়েছেন। গ্যেটে, শিলার, এমনকি তোমার দেশের এমার্সন, থুরো, হুইট্‌ম্যান, এঁদের রচনায় এশিয়ার চিন্তার প্রভাব পড়েছে, সেই প্রভাবে এঁদের ভাবের ধারাই গেছে বদলে, কারণ তাঁদের আত্মা ও ভারতবর্ষের গভীর প্রজ্ঞা ছিল একই সুরে বাঁধা, তাই যেই ভারতবর্ষের বাণী তাঁদের কানে পৌঁছল তাঁদের মন বেজে উঠল সেই সুরে। তোমাদের এইসব লেখকরাই তো পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের আশ্চর্য পথ খুলে দিয়েছেন।'

প্রশ্নকারীর সংশয় যায় না :—'আমাদের এখনকার কোনো লেখক কি একাজ করেছেন?'

কবি মৃদু হাসলেন, সে হাসিতে ঈষৎ নিন্দা মেশানো ছিল। কিন্তু শুধু বললেন :

জানো তো আমি তেমন পড়ি না—এক-সময় খুব পড়তুম কিন্তু দীর্ঘ দিন হয় আমি তোমাদের আধুনিক লেখকদের সঙ্গে যোগ হারিয়েছি। আধুনিক সাহিত্যের অধিকাংশই এত বহিরঙ্গ (ephemeral), কেবলি আমোদের ভোজ (entertainment), খালি কাগজ খরচ...ধরো না কেন তোমাদের খবরের কাগজ—যদি তোমাদের দিনে দশটা না বেরিয়ে একটা এডিশন বেরুত কিংবা যদি তোমরা সপ্তাহে একবার খবর পড়তে তাহলে জীবনের মূল্য কি কিছু কমে যেত?'

জানি না খবরের কাগজের পাতায় এইসব যা-কিছু আলাপ-আলোচনা বিধৃত আছে তা সবই সঠিক বা যথাযথ কি না, তার মধ্যে বিকৃতি ও ভুল তথ্য থাকা অসম্ভব নয়, তবু অনেক জায়গায় আমরা যখন কবির পরিচিত ভঙ্গিগুলি দেখতে পাই তখনই চিনতে পারি যে এ তাঁরই ভাব বটে। খবরের কাগজ সম্বন্ধে এই বিরূপ মন্তব্য সেই কাগজের পাতাতেই সযত্নে বিধৃত আছে, তাই মনে হয় ইতিহাস রক্ষায় এর আবশ্যকতা আছে; তবু

কত অবান্তর, অনাবশ্যক, একান্ত বহিরঙ্গ ও অপথ্যে ঠাসা অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা। মনে আছে এদেশে ডাকের সঙ্গে কাগজ এলে কবি সেটি খুলে অতি দ্রুতগতিতে তার শিরোভূষণ লাইনগুলি সকৌতুক মন্তব্যে অলংকৃত করে পড়ে যেতেন—খবরের কাগজের সৃষ্টি নূতন নূতন ভাষা বা অপভাষা-গুলি ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করে যেতেন, যেমন—পরিস্থিতি, অবদান ইত্যাদি। অবদান শব্দের মানে হচ্ছে ছোট গল্প, যেমন—'অবদান-শতক'; কিন্তু সে মানেকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে দান-শব্দের মাহাত্ম্য বাড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে 'অবদান'—কবি বলতেন, 'খুব ফলাও রকম দান আর কি?' যা-হোক এ শব্দটি নূতন অর্থে এখন এমনই চলে গেছে যে মূল অর্থের সঙ্গে অসংগতি অনেকেই লক্ষ্য করবে না। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে নিত্যকর্মপদ্ধতির মত কাগজের পাতা থেকে জ্ঞানের উঞ্ছবৃত্তি দিয়ে যাদের প্রত্যহ সকাল হয় তিনি সে দলের মানুষ ছিলেন না। আলোর আভাস জড়ানো পূর্বাঞ্চলের দিকে উন্মুখ হৃদয়ে প্রার্থনা উত্থিত করে হত তাঁর দিনের আরম্ভ। হে সূর্য তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ অপাবৃণু—আমি তোমার মধ্যে দেখি আমার স্বরূপ—সেই যে কবি মনীষী গায়ত্রী মন্ত্রকে অন্তরে গ্রহণ করে এই ভূর্ভুবস্বঃ-লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে যেতেন—আমেরিকান রিপোর্টার দেখেনি তাঁর সেই যোগযুক্ত মূর্তি। এমনকি তাদের ভাষাতেই এভাব বোঝাবার উপযুক্ত শব্দ নেই, আছে এক দুর্জ্ঞেয় শব্দ 'মিস্টিক'—তবু তার অন্তরে স্পর্শ করেছে কোন্ অজ্ঞাত অনুভব—সে বলছে, "একবার রবীন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, প্রতিভাত হয়, কত অকিঞ্চিৎকর, কত তুচ্ছ আমাদের এই কোলাহলময় প্রত্যহের আবিলতা।"

যাক্ যে প্রসঙ্গ চলছিল, প্রশ্নোত্তরের জের টেনে কর্তব্য অনুসারেই সংবাদদাতা ভয়ে ভয়ে কিপলিং-এর কথা তুললেন। তিনি লিখছেন :

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হল না, শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

'কিপলিং-এর রচনায় যেখানে ভারতবর্ষকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন সেখানে শুধু তাঁর পণ্ডিতম্মন্যতা (charlatanism) ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পায়নি। তাঁর সে রচনা বড়জোর সাহিত্যে কৌশলের কসরত, ভেলকিবাজি, মিথ্যা। তিনি ভারতের নিতান্ত বহিরঙ্গ বিষয়ও যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি, করেনওনি। তিনি প্রাচ্যের সেই দিকেরই ছবি আঁকতে পারেন যা ইয়োরোপের সংস্পর্শে বিকৃত। তাঁর মনের ঔদ্ধত্য, দুর্ভেদ্যতা (insularity) আমাদের প্রতি সমবেদনার সব সম্ভাবনা রুদ্ধ করে রেখেছে। সমবেদনা ছাড়া অপর এক দেশ ও জাতিকে জানা যায় না।

জানতে চাইলে নিজে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থেকে তাকে জীবতত্ত্বের একটি নমুনারূপে (zoological specimen) দেখলে চলে না। কিপলিং তাই করেছেন—তার ফলে— ?'

"কবি এই কথা বলে তাঁর কোলের উপর ন্যস্ত পরস্পরসম্বদ্ধ কোমল করতল মুক্ত করে একটি নিন্দা প্রকাশের ভঙ্গীতে ওল্টালেন। তাঁরপরই হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। হয়ত সহসা তাঁর মনে হয়ে থাকবে এমন কঠিন মন্তব্য করা শোভন নয়।"

প্রশ্নকর্তা এবার অন্য কথা তুললেন : 'আপনি কি মনে করেন এডউইন আরনল্ড আপনাদের কথা ঠিকমত বলতে পেরেছেন ?'

'তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল, ছিল সুন্দর সমবেদনা, কিন্তু তিনি বড় কবি নন। আমি তোমাকে একটা বইর কথা বলতে পারি—The Creed of Buddha. Edmund Holmes-এর লেখা—এই বইতে দুই জগতের দুস্তর ব্যবধানের মধ্যে আশ্চর্য সহানুভূতির যোগ দেখা যায়।...ঐ লেখকের মন আমাদের জীবনের ছন্দে স্পন্দিত।'

সাংবাদিক আরো বহু প্রশ্নোত্তরের পরে তাঁর শেষ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছেন—

'তাহলে কবির কাজের উদ্দেশ্য (mission) কী ?'

এই প্রশ্ন শুনে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তাঁর কথার ভিতর দিয়ে কোমল একটু হাস্যধ্বনি ঢেউয়ের মত খেলা করে যেতে লাগল। ঠিক যেন তিনি কোনো আদরের দুষ্ট ছেলের কথা বলছেন :

"ও, কবিরা! তারা পাখির মতই উদ্দেশ্যহীন, তারা শুধু জানে যে তাদের গাইতে আনন্দ। পাঠকরাই বলতে পারবে কবিদের দিয়ে কী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিও নিজে জানে না সে কী শেখাতে চায়—যদি জানে, তাহলে তখনই আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং তার কাব্যের প্রাণদায়িনী শক্তি কমে আসে। কবিরা যে পথ্য যোগায় আমাদের প্রাণ চায় যে সে যেন তাদের হৃদয়ের বাগান থেকেই আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়—কারণ প্রাণও আত্মসচেতন নয় এবং ল্যাবরেটরিতে তৈরি পূর্বে হজম করা (pre-digested) খাদ্য চায় না।"

সাংবাদিকের নানা প্রশ্নের উত্তরে কবি বলে চলেছেন : "তোমাদের মনকে সেইসব আবর্জনা থেকে মুক্ত করা দরকার যা অন্তর্দৃষ্টি নষ্ট করে—অনাবশ্যক পদার্থের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছোট ছোট জিনিসের কোলাহল বন্ধ করে দেওয়া চাই—তারপর যখন অন্তরে সত্যবাণী ঘোষিত হবে তখন শুনো সে কথা, নিজেকে অনুকূল রেখো তার প্রতি"—কথোপকথনের বিবরণ লিখে তারপর সাংবাদিক নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করেছেন :

—“জীবনের ঝাঁকবাঁধা অনর্থক জঞ্জালের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মতামত, তাঁর শান্তি ও স্থৈর্যের বাণীর পূর্ণ মহিমা, উপলব্ধি করতে হলে, তিনি যখন কথা বলছিলেন তাঁর সে সময়ের মুখচ্ছবি দেখা চাই। অনেকে তাঁর বাণীকে পরাজিত জাতির কবিত্ব বলে মনে করেছে, মনে করেছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তপ্ত আবহাওয়ায় বর্ধিত অর্ধমূর্ছিত জাতির কাছ থেকে এইরকমই তত্ত্ব আশা করা যায়। এই বাণী এমন একজন মানুষের মুখ থেকে শুনেছি, কথা বলতে বলতে যাঁর মুখ বিচিত্র শক্তিপ্রবাহের মিলনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। তাঁব প্রশান্ত ললাটে ধ্যানের মহিমা—কিন্তু তাঁর গভীর কালো চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়ে এমন একটি মানবচরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে যাতে বোঝা যায় ইন্দ্রিয়ের আধারে মানুষের যত ভাব, যত আনন্দ ধাবণ করবার ক্ষমতা আছে সবই সেই দেহদীপে জ্বলে উঠেছে। তাঁর সুকুমার ঈষৎ বঙ্কিম নাসাতে প্রকাশ পাচ্ছে সুসংবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাশক্তি; আর নাসাগ্রের দুই প্রান্তের সূক্ষ্ম বঙ্কিম রেখায় পাওয়া যায় দুর্দম চিত্তবৃত্তিকে বশীভূত করার সংবাদ। কোমল মুখশ্রীব মধ্যে বিধৃত রযেছে ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা—স্বাস্থ্য ও পূর্ণপ্রাণের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল দেহত্বক, মানতেই হবে এ চেহারা পরাভূত, গ্রীষ্মমূর্ছিত, অবসন্নচেতনা কোনো মানুষের নয়। আমার এ কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝতে হলে—এঁকে দেখতে হবে—চোখে দেখতে হবে। তবুও এ কথা বলব যে তাঁর দর্শনে মনে যে ছাপ বেখে যায় সে শুধুই একজন আশ্চর্য ব্যক্তিসত্তার নয়। মনে হয় যাঁকে দেখছি তিনি যেন বৃহত্তব পৃথিবীর পটভূমিকায় এক মহৎ জাতিব বিগ্রহমূর্তি।”[১]

বলাকায একটি কবিতা আছে—‘সর্বদেহেব ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী—’ সৃষ্টিকর্তার যে আনন্দ কবির কাব্যে গানে সুরে ছন্দে ভক্তিতে প্রেমে, কর্মে সৌন্দর্যে উদ্বেল, সেই আনন্দেব উদ্ভাস ছিল তাঁব সর্বদেহে, বস্তুতন্ত্র-গ্রথিত ইয়োরোপীয় মন সে দৃশ্যে বারবার হয়েছে বিস্ময়াভিভূত। ভাষা খুঁজে পায়নি, শুধু বলেছে, কাহারে হেরিলাম—। এখানে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁর অপবিচিত বেশভূষা, অপরিচিত ভঙ্গী কোনো কোনো মূঢ় মনে হাস্যোদ্রেক করে থাকলেও তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কোন্ মেয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল জানি না, কিন্তু লস্-এঞ্জেলস থেকে একটি মেয়ে অভিভূত চিত্তে তার প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে এক বান্ধবীকে লিখছে :

“আমি সুন্দর স্পেনীয় রীতিতে সাজানো উদ্যানে খাবার টেবিলে বসে-

---

[১] *New York City Evening Post*, Dec. 2, 1917.

ছিলাম, চারদিকে পাম-তরুশ্রেণীর পত্রমর্মর, আর স্প্যানিশ ধ্বজাগুলি বাতাসে দোলায়িত হচ্ছে, কোকিলের কুহুধ্বনি শোনা যাচ্ছে, মেয়েরা হলদে রঙের ঝলমলে জামা পরা, জাপানী ভৃত্যরা বেগুনী কোমরবন্ধ এঁটে রঙীন ঢেউ তুলে বেড়াচ্ছে—আমাদের মাথার উপর ক্যালিফোর্নিয়ার উজ্জ্বল নীলাকাশ উদ্ভাসিত। এমন সময়ে আমাদের পাশের টেবিলেই কবি রবীন্দ্রনাথ অদৃষ্টপূর্ব পূর্বদেশীয় পোশাক পরে বসে ছিলেন, তাঁকে দেখে আমার মনে হল, তিনি যেন নিশ্চয় সাদা উটে চড়ে মরুভূমি পার হয়ে এখানে এসে আবির্ভূত হয়েছেন—এবং তাঁর সেই আশ্চর্য বাহনটি যেন বাইরে অপেক্ষা করে আছে। কারণ তিনি যে একেবারেই সেই ম্যাগিদের প্রতিচ্ছবি—মনে হয় যেন তিনি বেথলহেমের তারকার অনুসরণ করে বেরিয়েছেন আর শুধু ক্ষণকালের জন্য এই আশ্চর্য সুন্দর পান্থশালায় বিশ্রাম করতে এসেছেন।"[১]

এই সুন্দর বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে কবিত্ব—কিন্তু এ কবিত্বের উৎসবৎ অনির্বচনীয়তায়—লেখিকার মনোভাব উপযুক্ত প্রকাশের পথ খুঁজে ব্যাকুল, তাই তিনি উপমার আশ্রয় নিয়েছেন—মনের আবেগ তাঁকে কবি করে তুলেছে। এমনি উপমা দিয়েই আর-একজন লিখেছে—"আজ রবীন্দ্রনাথের কথা শুনেছি—তাঁর উচ্চগ্রামে বাঁধা কণ্ঠস্বর যেন দেহচ্যুত আত্মার মত।"

আমরা জানি ইয়োরোপীয়েরা সভাস্থলে প্রশংসাসূচক মনোভাব প্রকাশ করতে হাততালি দিয়ে থাকে। কোনো গান আবৃত্তি বক্তৃতা শেষ হতে না হতে করতালির ধ্বনিতে সভাগৃহ কম্পিত হতে থাকে। কবি নিজে অবশ্য এদেশে এ প্রথার অনুকরণ বন্ধ করতে বহু চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতায় যখনই কোনো অভিনয়, নৃত্যনাট্য বা গান হত প্রোগ্রামপত্রের পিছনে লেখাই থাকত—অনুগ্রহপূর্বক হাততালি দিবেন না। সুন্দর একটি গানের পর যখন সুর থেমে গেলেও তার রেশ অন্তরে ধ্বনিত হবে—যখন বাক্যহীন বাণীতে শিল্পের প্রকাশ মর্মে প্রবেশ করবে, সেই সময় করতালির কোলাহল সৃষ্টি করা অতি স্থূল প্রথা। অথচ দর্শকদের কাছে থেকে সপ্রশংস কোনো উত্তরই কি পাওয়া যাবে না? তাই শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানগুলিতে সাধুবাদ দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছিল। আমাদের পুরাতন স্বদেশী প্রথায় ধীরভাবে ঐ শব্দটি উচ্চারণ করে দর্শকরা তাদের সমর্থন জানায়।

ইয়োরোপীয়রা সাধারণত অত শত লক্ষ্য করে না। তাদের নাচেও অনেক কসরত, গানেও কম নয়, অরেটরিতেও প্রচণ্ডতা, সেই সঙ্গে করতালিও

---

[১] Nashville T. Banner, Nov. 4, 1916.

কর্ণপটাহচ্ছেদী। আজ পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রসিদ্ধ ভাওলিনবাদক ইহুদী মেনুইনের বাজনা শোনবার পর যখন তার সূক্ষ্ম সুরের রেশ মনের তন্ত্রীতে কম্পিত হতে হতে অলৌকিক বস্তুহীন মায়ালোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখনও দর্শকবৃন্দ সবলে ও সজোরে দুই করতলের প্রচন্ড চপেটাঘাতে তুমুল কান্ড করে তুলতে পারে—সুরের পরেই বেসুরো এই অট্টরোল তুলতে তাদের মনে কোনো বাধা হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, অনেকস্থলেই দেখেছি যখন রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিচ্ছেন, জনতা স্তব্ধ হয়ে শুনছে, হাততালি দিতে ইতস্তত করছে! যদিও তাতে মুশকিল আছে, হাততালি না দিলে তার ব্যাখ্যা হতে পারে যেন ভাল লাগেনি। অথচ মনের ভাব যেন মন্দিরে এসেছি, এখানে গোলমাল চলবে না।

একজন লিখেছে : "ন্যাশনালিজম্ বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম—শ্রোতৃবৃন্দেব মধ্যে সব রকম অবস্থার ও শিক্ষার লোকই ছিল। তারা আগ্রহের সঙ্গে, মনোযোগের সঙ্গে নীরবে তাঁর বক্তৃতা শুনছিল, হাততালি দিয়ে স্তব্ধতা ভঙ্গ করতেও তাদের দ্বিধা হচ্ছিল।"

এই সময় ইয়েল ইউনিভার্সিটি ভারতের দ্রষ্টাকে দ্বিশতাব্দী পুরস্কার দিয়ে প্রাচ্যের ঋণ স্বীকার করল—কবি যখন সেই পুরস্কার নিতে সভায় ঢুকলেন শোভায় সৌন্দর্যে Woolsey Hall-এর সভামণ্ড আলোকিত করে, সেই ছবিটি যারা দেখেছে তারা কখনো ভুলতে পারবে না। "তাঁর অঙ্গে ছিল মাটির রঙের আঙরাখা, ঘরের স্বল্প আলোতে তাতে একটা বেগুনী ভাব দেখা গেল; ঐ রং তাঁর শরীরের বাদামী রঙের আভার সঙ্গে অপরূপ লাগছিল—তাঁর কেশ মাথার উপরের অংশে সম্পূর্ণ শুভ্র কিন্তু অল্প অল্প করে নীচের দিকে গাঢ় হয়ে এসে কুঞ্চিত হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন কোনো শিল্পী তুলি দিয়ে সাদা থেকে গভীর করে রং বুলিয়ে দিয়েছে—একেবারে যীশুর প্রতিমূর্তি, মনুষ্যদেহে তাঁর এমন প্রতিচ্ছবি কেউ কি কখনো দেখেছে? আমরা শুনেছি যে, এ'র ব্যক্তিত্ব এ'র শ্রোতাদের অভিভূত সম্মোহিত করে দেয়—তারা তাঁর উপস্থিতির দ্বারাই তাঁর সঙ্গে এক আত্মিক যোগ অনুভব করে।...একথার সত্যতা, তাঁর প্রভাবের ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেল, সভাগৃহ নিস্পন্দ—একমাত্র অশোভন ঘটনা ঘটল হাততালি...তাঁর কবিতার মহিমাময় প্রভাবের পরেই করতালির ধ্বনি সুর কেটে দিল। প্রেসিডেণ্ট হেড্‌লি দ্বিশতাব্দী পুরস্কারের পদকটি নিয়ে বললেন, "সত্য ও আলোকেব অনুসন্ধানীদের একজন বলে আপনাকে স্বাগত জানাই।"

কবি মেডেলটি হাতে নিয়ে ছেলেমানুষের মত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে

লাগলেন। তাঁকে কবিতা পড়তে বলা হলে তিনি বললেন, “কিন্তু একটা শ্রম বিভাগ থাকবে তো? কবির কাজ কবিতা লেখা, পড়া তো নয়। কোনটা পড়ব তাও স্থির করা মুশকিল—গাছ ফুল ফোটায় কিন্তু মালা তো গাঁথে না...”

প্রথমে তিনি তাঁর অল্প বয়সের রচনা থেকে পড়তে শুরু করলেন, “আশা করি তোমরা বিশ্বাস করবে যে, একদিন আমারও অল্প বয়স ছিল, এমনকি এই সভাতে সবচেয়ে ছোট যিনি আছেন তাঁর চেয়েও ছোট ছিলাম!”[১]

‘ওয়ার্লড অব পারসোনালিটি’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করছেন কবি। “বিশ্লেষণের দ্বারা নয়, আনন্দের মধ্যেই আভাস পাই অনন্তের”—চলেছে তাঁর সীমা-অসীমের লীলার ব্যাখ্যা। যারা তাঁর সেই অপূর্ব উপদেশ শুনছিল তাঁদের মনে তাঁর বক্তৃতা সম্বন্ধেও সে কথাটি সত্য মনে হল—এ বক্তৃতা বিশ্লেষণের দ্বারা বোঝবার নয়, সম্পূর্ণভাবে একে গ্রহণ ও অনুভব করতে পারলেই বোঝা যায় এর সত্যতা।

“রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে প্রবেশ কবলেন, তাঁর দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির—তিনি হেঁটে ঢুকলেন বলার চেয়ে মনে হয় যেন ভেসে এলেন—তিনি জানেন না তাঁর শ্রোতৃবৃন্দ কী জাতীয়, তারা কী শুনতে চায় বা তাদের মনের পরিধি কতদূর—তিনি মাথা নিচু করে তাঁর সেই সরল বন্ধুভাবে নমস্কার করলেন—আর তৎক্ষণাৎ জনতার নড়াচড়ার সমস্ত শব্দ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে বলতে শ্রোতৃমণ্ডলীর মাথার উপর দিয়ে, টুপির আর ফার-এর শ্রেণীর উপর দিয়ে তার দৃষ্টি চলে গেল দূরে। তিনি বলতে লাগলেন সীমা-অসীমের তত্ত্ব—যে অণু পরমাণু ঐ নক্ষত্র-পুঞ্জের সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে লৌহপিণ্ড, সৃষ্টি করেছে জলভারনত মেঘরাশি, তাদের কথা, এদের সেই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সত্য হলেও আমাদের কাছে সত্য নয়, তাদের পূর্ণ রূপেই সত্য—তিনি যখন এ কথা বলছিলেন আমাদের মনে হল এ কথা তাঁর বক্তৃতা সম্বন্ধেও সত্য। তাঁর কথার মধ্যে কত সুন্দর সুন্দব বাক্য, কত উপমা, বিচ্ছিন্নভাবে তা হয়ত সকলে বুঝতে পারছে না, কিন্তু সমগ্রভাবে তার প্রভাব পড়ছে আমাদের সমগ্র চিত্তের উপর।

“যখন আমরা সভাগৃহ থেকে চলে আসছি একটি মহিলা বলছিলেন, ‘কেমন যেন, এত বেশী...হায় আমি জানি না কী বলব’—“যা হোক তবু তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কথা বলছিলেন আর সবাই ছিল সম্পূর্ণ

---

[১] *New Haven C. Courier*, Dec. 7, 1916.

নিস্তব্ধ। সেদিন গাড়ির দিকে আশ্চর্য এক নিঃশব্দ জনতা চলেছিল, কারু কারু চোখ জলে ভাসছিল।”...১

এই সময় তাঁর বক্তৃতা শুনে ফিলাডেলফিয়ার একজন লিখছে, “তাঁর কণ্ঠস্বর সাধারণ আমেরিকানের চেয়ে এক অক্টেভ উচ্চগ্রামে বাঁধা—তাঁর আশ্চর্য শব্দচয়নেই বক্তৃতার জোর প্রকাশ পায়, ভাবভঙ্গী বা ঝোঁক তিনি দেন না।...

...তাঁর নম্র আত্মিক ভাবময় মুখচ্ছবি দেখলে, তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হয় যেন খৃষ্ট ‘সারমন অন দি মাউন্ট’ বলছেন।...খৃষ্টের বাণীর সঙ্গে ঠাকুরের বাণীর এতই সাদৃশ্য যে যারা খৃষ্টকে মনুষ্যসম্ভব বলে জানে তারা অনায়াসেই মেনে নেবে যে, উভয়েরই ধর্মমতেব উৎস সেই ধর্মতত্ত্বের সীমাহীন শেষহীন সাগর অপরিবর্তনীয় পূর্বদেশ। এমনও হতে পারে যে যখন খৃষ্ট গ্যালিলির পথে হাঁটছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের কোন পূর্বপুরুষ এইরকম কেশশমশ্রুসমন্বিত মুখে এইরকম পরিচ্ছদ পরে এইরকমই কথা বলতেন, শিক্ষা দিতেন, প্রচার করতেন—আজ এই যৌবনে ক্লান্ত নগরে রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তাধারা প্রবাহিত করেছেন, তাঁদের চিন্তাও ছিল তেমনি।”২

সাংবাদিক লিখছেন : “এই যশস্বী হিন্দু কবি যে নিস্পৃহ বা কথা বলতে অনিচ্ছুক তা নয় কিন্তু যে দুজন সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তারা দুঘণ্টা ধরে তাঁর কথা শুনেছে কিন্তু নিজেরা যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল তা না করেই ফিরে এসেছে। তারা বলেছে... ‘তাঁকে প্রশ্ন করা যেন প্রফেট এলিজাকে কোণঠাসা করে তাঁকে Raven সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়ে জেরা করার মতই হয়।’

“কিন্তু জেরা করে উত্ত্যক্ত না করলে কবি অপূর্ব কৌতুকপরিহাসে চিত্ত-অভিভূতকারী কথা একাই বলে যেতে পারেন!

“তিনি বলছিলেন :—‘তোমাদের আমেরিকান ইন্টারভিউ খালি একটা কৌতূহল মেটানোর জন্য। তোমরা মানুষের ব্যক্তিত্বের চটকদার দিকটাতেই মজা পাও। আমি ভাবি আমার কাছে খবরের কাগজওয়ালারা কেনই বা লোক পাঠায়—তদের তো সময় হাঙ্গামা সবই বেঁচে যায় যদি একজন রিপোর্টারকে টাইপরাইটার দিয়ে বসিয়ে দেয় এবং তাকে কল্পনা করতে বলে আমার পক্ষে কী কী বলা সম্ভব!

‘তোমাদের আমেরিকান কর্মকুশলতার এ একটা ভারি ত্রুটি যে তোমাদের

---

[১] *New York City Evening Post*, Nov. 22, 1916.

[২] *Philadelphia Pa North America*, Nov. 26, 1916.

এত কষ্ট করে দেখাসাক্ষাৎ করে সংবাদ সংগ্রহ করতে হয় যাতে একমাত্র সত্য খবর থাকে আমার নাম আর আমার হোটেলের নাম।' "[১]

খবরের কাগজের দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হয়ে একথা বললে কী হবে, আমেরিকান কাগজের প্রধান লক্ষ্য নাকি খবরের যাথার্থ্য।...গল্প আছে The New York City Sun যার মন্ত্র [motto] হচ্ছে 'Sun-এ যা দেখেছ তাই ঠিক'—সেই কাগজে একটি লোকের মৃত্যুসংবাদ ছাপা হয়েছিল, পরের দিন সেই ব্যক্তি স্বয়ং সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, 'খবরটি সংশোধন করো।' সম্পাদক একটি কাগজ আনিয়ে ঐ খবরটি সমনোযোগে পড়লেন তারপর ঘাড় নাড়লেন—'আমি তো এ খবর বদলাতে পারব না; 'দি সান' বলেছে তুমি মরেছ অতএব তুমি মরেইছ, এর উপায় নেই।'

'কিন্তু আমি তো মরিনি, জ্বলজ্যান্ত আমায় দেখছ তো! খবরটি সংশোধন করো।'

'দুঃখিত। 'দি সান' একবার যা বলেছে তাব আর অন্যথা হতে পারে না। তবে এক কাজ করতে পারি, কালকের জন্মনির্দেশ কলমে তোমার নামটি ঢুকিয়ে দিতে পারি।'

"আর জাপানী সংবাদদাতারা কিন্তু আমেরিকানত্বে আমেরিকান সংবাদদাতাদেরও হারিয়ে দেয়। (They out-American the American interviewers!) তারা ভৃত্যদের এসে জিজ্ঞাসা করে, আমি কী খাই—ভৃত্যরা যদি না বলে তবে হোটেলের খাবার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে খবর জেনে নেয়। টোকিও-র একটা খবরের কাগজে আমার দুর্বলতার সন্ধান পেলে—আইসক্রীম! তারপর থেকে যেখানেই যাই কেবলই আইসক্রীম আসতে থাকে। অবশ্য জাপানীদের আগ্রহের কারণ, যার কবিতা তাদের ভালো লেগেছে তার সম্বন্ধে একটা ছেলেমানুষী কৌতূহল মাত্র, কিন্তু তোমাদের কথা ঠিক তা বলতে পাবি না, তোমাদের হচ্ছে খালি খবর ফলাও করে একজনকে জাহির করা (to play up a man) যার নামটুকই মাত্র তোমরা শুনেছ!"

বলতেই হবে কবির মন্তব্যটি তিক্ত বড়িই বটে! বিশেষ জাপানীদের সঙ্গে তুলনায় সে তিক্ততা বাড়ে বই কমে না। জাপানী রিপোর্টাররাও তো বোঝা যাচ্ছে কম উৎপাতকারী নয়, তবে তাদের প্রতি মমতার কণ্ঠস্বর কেন? মনে হয় কবি এশীয় জাতির প্রতি যে আত্মীয়তা ও মমত্ব বোধ করেন তা পাশ্চাত্যদের প্রতি করেন না। এই পক্ষপাতিত্বের ব্যাখ্যা কী?

---

[১] *Detroit Mich News,* Nov. 10, 1916.

প্রধান ব্যাখ্যা—এশিয়া শক্তিমদগর্বিত অলংকৃত পাশ্চাত্য দেশের কাছে অপমানিত। খৃষ্টান ধর্মযাজকদের অন্য ধর্মকে নিন্দা ও এশীয়দের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিম ভাবে ভাবিত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা, ইয়োরোপীয় জাতির সকলের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হওয়ার সংকল্প, যার ফলে এশীয় জাতির সম্বন্ধে নানা অপপ্রচার, ইমিগ্রেশন আইন, ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে যে প্রবল জাতিভেদের নিয়মে এশীয়রা পতিত জাতি বলে নির্ণীত, কবির ন্যায়-নিবদ্ধচিত্তে ক্রমাগতই ঘোষিত তার প্রতিবাদ। তাই বঞ্চিতের যা কিছু সম্পদ, দুর্বলের যা কিছু বল, কবি সেখানেই শক্তি যোগান।—
"I sing the song of the Defeat."

জাপানের প্রসঙ্গে তিনি আর-এক জায়গায় বলছেন: "আমি জাপানে দেখেছি সাধারণ মজুররাও নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কখনো পনেরো মিনিট পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মগ্ন হয়ে আছে, তাদের কালো চোখের দৃষ্টি যেন সুরে কোমল, এই দৃশ্যের সঙ্গে লন্ডন শহরের জনতার দৃশ্যের তুলনা করেছি, জনতা ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাস, তাদের মুখ উদ্‌ভ্রান্ত। তারা ছুটেছে যেন কোথাও যাবে, যে-কোনোখানে যাবে, সেই মত্তবেগে তারা দেখছে না কিছুই—আমি বলতে পারি না জাপানীদের এই শিল্পবোধ সৌন্দর্যবোধ আমাকে কী রকম অভিভূত করে। বংশপরম্পরাক্রমে বহু যুগ ধরে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধার এ ফল।"[১]

"কবি বেলভিউ হোটেলের একটি ঘরে বসে আছেন আর একদল অত্যুৎসাহী তরুণ সাংবাদিক তাঁকে জীবনের অর্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাদের নিজেদের গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত জানিয়ে আমোদ দিচ্ছে! নাছোড়বান্দা সেই যুবকবৃন্দ তাঁকে কোণঠাসা করে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে আদায় করে ছেড়েছে যে আমেরিকানদের তাঁর নিতান্ত গ্রাম্য মনে হয়—ইয়োরোপীয়দের চেয়েও অনেক বেশী গ্রাম্য।

"কিন্তু কতকগুলি বিষয় তাঁকে কিছুতেই আলোচনা করাতে পারেনি। তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস, আচরণের নিয়ম, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি কোনো কিছু সম্বন্ধে আলোচনা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়েছেন। খুব সম্ভব তিনি ভেবেছেন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আলোচনার ফলে সমুদ্রতীরে ভ্রমণকারী ব্যক্তি তাঁর পোশাক সম্বন্ধে যেমন সৌজন্য দেখিয়েছিল তেমন কিছু ঘটবে।"

একটা বিষয় আমেরিকান বন্ধুদের জানবার কথা নয় যে কবি নিতান্ত পরিচিতজনের সঙ্গেও ব্যক্তিগত আলোচনা পছন্দ করতেন না। খাওয়া-পরা, রোগ, শোক, দৈনিক অভ্যাস ও দৈহিক কোনো প্রসঙ্গই তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির

---

[১] *Detroit Mich News*, Nov. 10, 1916.

সঙ্গে একান্ত প্রয়োজন না হলে উত্থাপনই করতেন না এবং অন্য কেউ আলোচনা করতে চাইলে অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করে দিতেন। তাঁর অতি সূক্ষ্ম শালীনতাবোধের চারুতা সাধারণ লোকের অনধিগম্য ছিল, দেশে বিদেশে।

একটা বিষয় খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমেরিকার এই প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন (organization) ব্যারাম-এর জন্য মানুষ ক্রমে পোকার মত হয়ে উঠবে। দম-দেওয়া কলের মত নিয়মানুবর্তী গতিতে চলবে।

এই সংগঠনপ্রিয়তাতেই নেশন-তন্ত্রের সৃষ্টি। এবং তাঁর নিজের দেশ যে এই নেশন-তন্ত্রের কাছে একটি বলি একথা তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন।

"কোনো একটি বিশেষ 'নেশন'এর কথা নয়—কিন্তু এই নেশন-তন্ত্র...এরই জন্য ভারতবর্ষের মানুষের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। চিরদিনের জন্য তার আত্মরক্ষার পৌরুষ ও উপায় থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে!"

সাংবাদিক বাহিনী তখন চলে গিয়েছিল, ঘরের মধ্যে শুধু আর একটি দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল, কবি তার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে যেন কতকটা নিজের মনেই বলছিলেন। যতক্ষণ সাংবাদিকরা ছিল ততক্ষণ খুব কৌশলে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলেছিলেন। এখন তাঁর গভীর বেদনা প্রকাশ পেল।

"ওরা কেন নিরস্ত্র করেছে? যাতে তারা নিরাপদে রাজ্য শাসন করতে পারে। ভারতবর্ষের নিজেকে মুক্ত করার পথ বন্ধ করেছে। একটি বৃহৎ জাতির স্বাভাবিক আত্মরক্ষার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। নেশন-তন্ত্রের এই কীর্তি! আশ্চর্য কি আমি এই নেশনের আইডিয়ার বিরুদ্ধে বলে থাকি। এ আর কিছু নয় একটা জোট বেঁধে স্বার্থ সাধন করা।"

কবির আমেরিকা সম্বন্ধে ঐ দেশে থাকাকালীন আলোচনা ও প্রদত্ত বক্তৃতা প্রভৃতির সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে সে সময়ে ভারতীয়দের সঙ্গে আমেরিকানদের সম্বন্ধটি সঠিক জানতে হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকায় বহু ভারতীয় বসবাস করছিল। ১৯১৬ সালে লিখিত লালা লাজপত রায়ের প্রবন্ধে জানতে পারি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সর্বত্র ভারতীয়রা ছড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী ও শিখ, কিছু বাঙালী, সামান্য কিছু মাদ্রাজী ও শতকরা দু-একজন মুসলমান ও অন্যান্য জাতি। একেবারে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা না গেলেও জানা যায় প্যাসিফিকেই দশ হাজারের উপর ভারতীয় ছিল।

কাজেই ইংল্যান্ডে ও ইয়োরোপের চেয়েও আমেরিকাতেই ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল বেশী। এর মধ্যে কিছু ছিল মজুর, যারা নিরক্ষর। শুধু বেশী মজুরি পাওয়ার লোভে ভাসতে ভাসতে সেই অজানা সমুদ্র-তীরে পেঁাছেছে, আর কিছু ছিল ভদ্রশ্রেণী, যারা নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে পড়ার খরচ জুটিয়ে পড়াশুনো করত। সামান্য কিছুসংখ্যক ছাত্রই বাড়ি থেকে টাকা পেত। এ ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা ছিলেন, এবং 'স্বামী' নামে পরিচয় দিয়ে কিছু ভেকধারীও যথেচ্ছ বিচরণ করত। এই বিরাট ভারতীয় জনতার মধ্যে যে সমস্ত ছাত্র স্বোপার্জিত অর্থে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করতেন তাঁদের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও কর্মক্ষমতার প্রশংসা সকলের কাছেই শোনা যেত।

লাজপত রায় লিখছেন, 'আমার দুঃখ এই যে দেশে ফিরে এঁরা সেইরকম কর্মোৎসাহ দেখান না।'

ভারতীয় ছাত্ররা তাঁদের নম্র স্বভাবের গুণে আমেরিকান অধ্যাপকদের স্নেহ পেতেন, তাঁদের স্ত্রীরাও অনেকের মাতৃস্থান নিতেন। তবু সাধারণ-ভাবে এসব ভারতীয় ছাত্রদের দুঃখের অন্ত ছিল না। ভারতীয় হোটেল ছাড়া অন্য হোটেলে রেস্তোরাঁতে তাঁদের ঢুকবার উপায় ছিল না, বিশেষ মাথায় পাগড়ি থাকলে। আমেরিকানদের ভাষায় ভারতীয় মাত্রই 'হিন্দু', এই হিন্দুদের ঘৃণার চোখে দেখার কারণ এরা পরাধীন জাতি, এবং মিশনারিরা প্রমাণ করেছে হিন্দুরা অত্যন্ত কুসংস্কারী; অস্পৃশ্যতা, পৌত্তলিকতা ইত্যাদি নানা কুপ্রথায় বিশ্বাসী বর্বর জাতি। তা ছাড়া প্রধান কথা, তাদের গায়ের রং ময়লা, মাথায় পাগড়ি পরে এবং কার্যক্ষেত্রে কুশলী প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারতবর্ষীয় ছাড়াও জাপানী ও চীনারাও সে দেশে নানা কাজে বিশেষত শিক্ষার্থী হয়ে আসত। সমস্ত এশীয় জাতির প্রতিই আমেরিকান-দের অবজ্ঞা ও ঘৃণার চরম প্রকাশ—Immigration Law—এই আইনের উদ্দেশ্য হল যাতে এশিয়াবাসীরা সহজে আমেরিকায় ঢুকতে না পারে। যদিও এ আইন সমস্ত এশিয়াবাসীর প্রতিই প্রযোজ্য তবু চীন ও জাপান স্বাধীন জাতি, তাদের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সম্মান ও সুবিধা কিছু ছিল। অপর পক্ষে ইংরেজও চায় না যে ভারতীয়রা বেশী বিদেশে যায়। কারণ বিদেশ থেকে রাজদ্রোহী কার্যকলাপ চালাবার সুবিধা আছে। কাজেই বিশেষ করে হিন্দুদেরই এই আইনে ক্ষতি হল বেশী। Burnett Immigration Bill যখন পাশ হবার উদ্যোগ চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় ছিলেন এবং নানা স্থানে এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন।

ঐ আইন সম্পর্কে ক্ষুব্ধ ভারতীয়দের সাধারণভাবে বক্তব্য ছিল এই যে

তারাও ইন্দো-এরিয়ান-ভাষাভাষী ককেশীয়-গোষ্ঠী-সম্ভূত আর্য-জাতি। বর্বর নয়। এমন কি চীনা, জাপানী প্রভৃতি অন্যান্য এশীয় জাতিদের চেয়ে তারা আমেরিকানদের নিকট গোত্র! লালা লাজপত রায় আমেরিকার সেনেটরদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে লিখছেন :

"পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দু জাতিকেই শুধু সে হিন্দু—এই অপরাধে আমেরিকায় ঢুকতে না দেওয়ায় এই জাতির প্রতি যে কটাক্ষ করা হয়েছে তা ঘোর অবিচার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পন্ডিতদের দ্বারা হিন্দুরা আর্য-বংশসম্ভূত বলে স্বীকৃত হয়েছে. তাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত এবং তাদের বর্তমানের বহু চলতি ভাষাই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ইন্দো-এরিয়ান ভাষার শাখা। বাস্তবিক এশিয়া মহাদেশে অন্য যত জাতি বাস করে তাদের মধ্যে পার্শিয়ান, ককেশিয়ান এবং ভারতীয়রাই আমেরিকানদের নিকটতম গোত্র।"

ককেশীয়-বংশোদ্ভূত অর্থাৎ আর্যজাতি বলে যারা স্বীকৃত, তাদের আমেরিকায় প্রবেশে কোনো বাধা ছিল না। এমনকি তুর্কী প্রভৃতি যেসব মুসলমানদের আর্যতুল্য আকৃতি ও বর্ণ বশত তারা হোটেল প্রভৃতিতে সহজেই ঢুকতে পারত। এই কারণে কোনো কোনো ভারতীয়, আদালতে গিয়ে, সম্ভবত ম্যক্সমূলারের সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে, আর্যত্ব প্রমাণ করে, আমেরিকান নাগরিক অধিকার দাবি করেছিলেন! তাতে বিশেষ ফল ফলেনি। আসল কথা—এ হচ্ছে সংস্কারের গোঁড়ামি, যুক্তি দিয়ে খন্ডনীয় নয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এ যুক্তি কখনো উচ্চারিত হয়নি। বলা বাহুল্য যে লাজপৎ রায়ের এই আবেদনের মধ্যে ভারতীয় তথা সমগ্র মানবজাতির অপমান আছে। যারা আর্য নয়. তারা কি মানুষ নয়? মানুষের কাছে মানুষের যে দাবি, সে কি গাত্রত্বক আর নাকচোখের গড়নের উপর নির্ভর করবে? আমেরিকার ইমিগ্রেশন আইনের মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রতি যে অন্যায় কবি তারই প্রতিবাদ করেন; তিনি বলেন,—তোমাদের দম্ভে ঔদ্ধত্যে ও মনের insularity-র জন্য তোমরা দেখতে পাও না পৃথিবীতে অন্য জাতির অন্য দেশের কাছেও তোমাদের কী শিক্ষণীয় আছে। আমাদের কাছ থেকে তোমাদের গ্রহণীয় কি কিছুই নেই? তিনি অস্বীকার করেন না যে আমেরিকার কাছ থেকে বা পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ থেকে ভারতের শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্টই আছে কিন্তু তাই বলেই আমরাই কি রিক্তহস্ত? তোমাদেরও কি কোনো দৈন্য নেই? তাই তিনি বললেন. শুধু বিশ্বে. কোন্‌খানে তোমাদের ত্রুটি. কোথায় তোমাদের চরিত্রে অপরাধ গহ্বর সৃষ্টি করেছে. সেইখান দিয়েই ভাঙন নামবে। পশ্চিমের প্রতি তাঁর এই শাসন-বাণী মানুষে মানুষে সত্য সম্বন্ধ স্থাপনের বৃহত্তর প্রয়োজনে উচ্চারিত.

কোনো কৌশলে স্বজাতীয়ের কোনো সুবিধা করে নেবার উদ্দেশ্যে নয়। সাম্যবাদী মানবপ্রেমিক কবি আর্যত্বের মহিমা নয়, মনুষ্যত্বের মহিমাই ঘোষণা করতে চান।

তাই তিনি সাংবাদিকদের বলছেন :

"তোমাদের মঙ্গল সাধনে প্রাচ্যেরও কিছু দেয় আছে। আমরা শিক্ষার্থীরূপে এদেশে যাদের পাঠাই তাদের ভিতর দিয়ে তা পেতে চেষ্টা কোরো। তোমাদের সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তো তারা গ্রহণ করতে এসেছে এবং সেইজন্যই তাদের স্বদেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তোমাদের গোচরে আনতে পারলে তারা আনন্দিতই হবে। তোমাদের কাছ থেকে তাদের দূরে ঠেলে রেখো না..এদেশের আইনকর্তারা প্রাচ্য ছাত্রদের আমেরিকায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করবার উপায় চিন্তা করেছেন...কিন্তু এই শিক্ষার্থীদের দাবি কম এবং এরা এত বেশী দিতে উৎসুক...এরাই তো পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটাবে। এই দেশ এমন বিরাট; এমন সম্পদে পূর্ণ, এমন মানবপ্রীতিতে প্লাবিত, এখানে সামান্য কয়েক বছরের জন্য যে ক'টি ছেলেমেয়ে তোমাদের মধ্যে শিক্ষা পেতে এসেছে তাদের কি একটু সহ্য করে, এতটুকু আতিথ্য দিয়ে, তোমাদের সাম্যভাবের (democracy) একটু অংশ দিতে পার না?"[১]

শুধু কাগজের মারফত নয়, ব্যক্তিগতভাবেও নানা উচ্চপদস্থ চিন্তাশীল আমেরিকানদের সঙ্গে কবির এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে :

"আমি হেন্‌রি ফোর্ড-এর সঙ্গেও পরজাতিপীড়ন ও দুর্বল জাতির শোষণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। শ্রীযুক্ত ফোর্ড আমার বন্ধু। আমার বিশ্বাস তিনি আদর্শবাদী। যে বিপুল প্রচেষ্টায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি মানুষের বিরাট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন আমি তার প্রশংসা করি। কিন্তু যখনই তাঁর সঙ্গে আমি পরপীড়ন প্রসঙ্গটি তুললাম এবং এশীয় জাতির সঙ্গে তোমাদের দুর্ব্যবহারের প্রশ্ন তুললাম, আমার মনে হয় আমার বক্তব্য তাঁকে আমি বোঝাতে পারলাম না। তোমাদের জাতীয় চরিত্রের এইটাই অন্ধকার দিক...এবং অন্ধকার দিক থেকেই বিপদ আক্রমণ করে...

"যে সব এশীয় ছাত্র এখানে শিক্ষা নিতে আসছে তাদের পথ বন্ধ না করাই কর্তব্য। কারণ শিক্ষাই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান যা তোমরা জগৎকে দিতে পার। আমি তোমাদের বলতে এসেছি যে, আমাদেরও কিছু দেয় আছে, আমরা কেবলি নিতে চাই না।"[২]

পরবর্তীকালে এই উদ্দেশ্যেই বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছিল—যত্র বিশ্বং

---

[১] *New York Eve. Post,* 1916.

[২] *New York City Eve. Post,* Nov. 20, 1916.

ভবত্যেকনীড়ং—যেখানে বিশ্ব একনীড় হবে। এবং যেখান থেকে ভারতবর্ষ আপনার শ্রেষ্ঠ দান বিশ্বের কাছে পাঠিয়ে সমস্ত জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা লাভ করবার অধিকারী হবে।

ন্যাশনালিজম্ প্রভৃতি নিবন্ধের আলোচনা সমালোচনা যাই হোক না কেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের আলোচনায় চিন্তার অভিঘাতে বিমুখতা যতই প্রকাশ পেয়ে থাকুক—তৎকালীন শিক্ষিত আমেরিকান মন রবীন্দ্রানুরাগী হয়েছিল। লালা লাজপৎ রায় আমেরিকা থেকে লিখছেন : "এদেশের যথার্থ শিক্ষিত লোকেরা যে সব আধুনিক কাব্য পড়েন তার মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য থাকবেই"[১] এবং বেশীর ভাগ কাগজেই রবীন্দ্রচিন্তার অনুশীলনে গভীর প্রীতির চিহ্ন পাওয়া যায়। তর্ক যতই ধূলিজাল বিস্তার করুক তার ভিতর দিয়ে প্রীতির জ্যোৎস্নাবিকাশে দেখি পূরবে পশ্চিমে বন্ধুসঙ্গম...

"আমরা আমেরিকাবাসীরা প্রধানত পাঁচটি কারণে ঠাকুরকে ভালবেসে ফেলেছি। প্রথমত, তিনি আমাদের বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়েরই বেশী কাছে এসেছেন, দ্বিতীয়ত, তিনি পাশ্চাত্য জীবনের শূন্যতা পূরণ করেন, তিনি আমাদের বাকি অংশ—তিনি আমাদের সম্পূর্ণ করেন। পশ্চিমের প্রাচ্যকে প্রয়োজন, প্রাচ্যেরও পশ্চিমকে প্রয়োজন। তৃতীয়ত, ঠাকুর হোমারের মত সহজ, পার্বত্যনদীর মত স্বচ্ছ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মত স্বাভাবিক এবং এ সমস্তরই মতন অর্থের ভিতর নিহিতার্থে গুহায়িত গভীর (and like all these as deep they are with meaning beneath meaning)। ঠাকুর স্বদেশপ্রেমিক এবং বিশ্বপ্রেমিক। তিনি ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, তার মুক্তির কামনা করেন, ইংরেজকেও ভালবাসেন, আমাদেরও ভালবাসেন এবং জাতির চেয়ে মনুষ্যত্বই তাঁর কাছে বড়—তাই তাঁর বাণীতে এ যুগের মহত্তম ভাব ভাষা পেয়েছে। পঞ্চমত, ঠাকুরের মধ্যে অহংকার নেই, তিনি বাকসর্বস্ব নন, তিনি যেমন সুন্দর কাব্য রচনা করেছেন তেমনি সুন্দর তাঁর জীবনরচনা। শুনতে বিস্ময় বোধ হয় যে শুধু দেশপ্রেম কাব্য ইত্যাদির জন্যই তাঁর খ্যাতি নয়, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের যশও তেমনি ছড়িয়ে পড়েছে। খৃষ্টের কল্পিত ছবির সঙ্গে তাঁর আকৃতির কি বিস্ময়কর সাদৃশ্যই না আছে!"

এই উদ্ধৃতির মধ্যে রবীন্দ্র-জীবন ও -বাণীর যে সহজ অনুভব প্রকাশ

---

[১] *Modern Review*, May 1916.

[২] *Calif. Republican*, Dec. 11, 1916.

পেয়েছে সম্পূর্ণ বিদেশীর কাছ থেকে তা সত্যিই বিস্ময়কর। জানি না এদেশেও সে সময়ে কজন সাহিত্যিক জ্ঞানী, গুণী এভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও বক্তব্য বুঝতে পেরেছিলেন। আমার এই গ্রন্থে স্বদেশী কাগজের উদ্ধৃতি তুলতে গেলে স্থানাভাব ঘটবে কিন্তু আমার প্রাচীন পাঠকেরা তৎকালীন বসুমতী, হিতবাদী ইত্যাদির রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে মন্তব্যগুলো স্মরণ করলেই বুঝতে পারবেন।

"The weak are as great a danger for the strong as quick sand for an elephant. They do not assist progress because they do not resist, they only drag down." ("যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিছে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।)"

"Politicians calculate upon the number of mailed hands that are kept on the swordhilts; they do not possess the third-eye to see the great invisible hand that clasps in silence the hand of the helpless and waits its time." (শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরো, আমাদের সহায় ভগবান।)

কবি তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করে দৃষ্টিপাত করছেন। সেই শক্তিমদগর্বিত, পরশোষণরত, হিংসাবিক্ষুব্ধ পাশ্চাত্য জাতির সামনে দাঁড়িয়ে যখন কঠোর ভবিষ্যৎ বাণী করছেন তখন তাঁকে কেমন দেখায়? সুধীন্দ্রনাথ বসু লিখছেন, "আইওয়াতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণটির অপূর্ব জ্যোতির্বিকীর্ণ মননা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে স্মরণ থাকবে।

"তাঁর নরম কেশগুচ্ছ ঘাড়ের কাছে কুঞ্চিত, শ্বেতশ্মশ্রু বুকের ওপরে ঝরে পড়েছে। ধূসর রঙের আঙরাখায় আবৃত দেহ, আর করুণা-উজ্জ্বল মুখচ্ছবি প্রথমেই দর্শকদের মনোহরণ করেছে। অনির্বচনীয় শান্ত মহিমাময় মূর্তি। আমার মনে হল যখন উত্তোলিতবাহু এই হিন্দু ক্রিশ্চান শ্রোতাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁকে একেবারে তাঁদেরই সনাতন সাধুসন্তদের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়েছিল। একজন মহিলা যিনি Obermmergam-এ Passion Play[১] দেখেছেন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, 'Anton Lang নামে যে ব্যক্তি তিনবার ক্রাইস্টের চরিত্র অভিনয় করেছেন তার চেয়ে, নম্র-গম্ভীর মহিমায়, সংবুদ্ধিপ্রণোদিত অন্যায়ের প্রতি ধিক্কারে, এবং দীপ্যমান ধর্মবোধের শিখায় উজ্জ্বল কবিকে, অনেক বেশী খৃষ্টের অনুরূপ মনে হয়েছিল।'

---

[১] জার্মানিতে ঐ স্থানে Passion Play অর্থাৎ খৃষ্টের জীবনী কয়েক বৎসর অন্তর অভিনীত হয়। ঐ অভিনয় দেখতে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা দূরদূরান্তর থেকে একত্র হয়। কতকটা আমাদের রামলীলার মত।

“কবি বলে চলেছেন ‘নেশন-তন্ত্র’ সম্বন্ধে—‘পাশ্চাত্য ন্যাশনালিজম্ নেশনের অন্তর্বর্তী মানুষের পার্থিব উন্নতি সাধনের জন্য একটা যান্ত্রিক কৌশল। সেইজন্যই অন্য মানুষ যারা কোনো নেশন নয় তাদের মধ্যে, যেমন চীনাদের বা ভারতীয়দের মধ্যে, নেশনরা লোভের হাত বাড়িয়ে তাদের রক্ত শোষণ করে ফেলতে পারে। এই নেশন-তন্ত্র একটা সমগ্র জাতিকে স্বার্থপর স্বার্থাভিসন্ধিগ্রস্ত করে ফেলতে পারে। পাশ্চাত্য নেশন-তন্ত্র ব্যবসায় বুদ্ধি ও ধনলোভের দ্বারা সৃষ্ট। ইয়োরোপ ও আমেরিকা ব্যবসায়ের শক্তি ও প্রেস্টিজ লাভ করবার উগ্র উদ্যমে ব্যক্তিগত মানুষকে হারিয়ে ফেলেছে...বর্তমান যুদ্ধ যন্ত্র ও নেশন-তন্ত্রের আত্মঘাতী ক্রিয়া’...

“কবি মনে করিয়ে দিলেন আমরা হয়ত সত্যকে ভুলে থাকাই সুবিধা মনে করি কিন্তু সত্য আমাদের ভুলে থাকে না।...

“বক্তৃতার পর কবি ইংরেজিতে অনূদিত তিনটি সময়োপযোগী কবিতা পড়লেন। আলফ্রেড টেনিসনের মত রবীন্দ্রনাথও আবৃত্তির দ্বারা কবিতার গভীর নিহিতার্থ ব্যক্ত করে তুলতে পারেন। তাঁর সুর-উদ্বেল কণ্ঠের জাদুমন্ত্রে লোকেরা চেয়ার থেকে অর্ধোত্থিত হয়ে উদগ্রীবভাবে বসে ছিল। বক্তৃতাটি সাহিত্যের রত্ন। এবং যদিও খাতা থেকেই পড়া তবু তার জোর একটুও কমেনি। ঠাকুর জানেন কোথায় সম ও যতি দিতে হয়, কিন্তু তার ব্যবহার করেননি; কিছুই এড়িয়ে যাননি, সুবিধানুযায়ী করেন নি, নরম করেও বলেননি। তিনি উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে বলে গেছেন এবং তাঁর বাণী কখনো কখনো শক্তিশেলের মত এসে পড়েছে। তবু প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন—কেন তা বলা কঠিন। হয়ত তাঁর বাণীর চিত্তজয়ী ক্ষমতাই এর কারণ। বক্তৃতার পর অনেক মন্তব্যই আমার কানে ভেসে এসেছে। একজন গ্রাজুয়েট ছাত্র নিম্নশ্রেণীর ভাষায় বলছিল—‘আমি তো ভাবতুম হিন্দুগুলোকেই শেখানো দরকার, কিন্তু কাণ্ড দেখো একবার, এমন একজন হিন্দু এসেছে যে সত্যই আমাদের আমেরিকানদেরও শেখাতে পারে—মাইরি বলছি, অবাক করলে বটে!’ আমি আরও শুনলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলছেন যে, “ঠাকুরের বক্তৃতার কোনো কোনো অংশ এমন উন্নত, এমন গভীর নৈতিকভাবে পূর্ণ যে এমার্সনের কথা পড়ে, এত কবিত্বময় যে শেক্সপীয়রের তুল্য·বোধ হয়, আর এমন আধ্যাত্মিক বোধের প্রভাব ফেলে যে বাইবেলের মতই মনকে ঊর্ধ্বমুখী করে।’

“যখন আমি (সুধীন্দ্র বসু) কবিকে সেই রাত্রে স্টেশনে পুলম্যান গাড়িতে তুলে দিতে গেলাম আমার মনে হল তিনি যেন হিন্দুস্থানের বৈদিক ভাবের বিগ্রহমূর্তি। মনে হল যেন তাঁর মধ্যে ভারতীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের

চেয়ে আর কোনো ভাবই প্রবল নয়। এই আনুগত্য কোনো বইপড়া নিয়মে গাঁথা নয়, এ কোনো লোকদেখানো ভঙ্গী নয়। একেবারে সত্য। এ আদর্শ তাঁর সামনে প্রাণবন্ত—কার্যকরী, এই আদর্শ বহনের জন্যই তাঁর জীবন, কর্ম ও আনন্দ। তিনি বলছিলেন—'আমি বারে বারে এই ভারতবর্ষে জন্মাব।' বলতে বলতে গৌরবস্মিত তাঁর মুখ আলোকিত হয়ে উঠল—

"'দারিদ্র্য দৈন্য আর দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও আমি ভারতবর্ষকে সবচেয়ে ভালোবাসি'"১

আমেরিকার আর্বানাবাসী মিসেস্ আর্থার সিমুর 'কবির বিশ্রাম' এই নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের 'মডার্ন রিভিউ'তে পুনরুদ্ধৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ আর্বানাতে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে লেখিকা কবিসান্নিধ্যে সেই কয় দিনের স্মৃতির কথা লিখেছেন। আমার এ গ্রন্থের আরম্ভে একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে দেশবিদেশের নানা লোকের দৃষ্টির মাধ্যমে কবির আশ্চর্য ব্যক্তিস্বরূপকে দেখব কিন্তু তার সুযোগ কমই ঘটেছে। উপযুক্ত স্মৃতিলেখন বিশেষ লেখা হয়নি। যেগুলি পেয়েছি তা প্রকারান্তরে লেখকের নিজেরই কথা। নির্লিপ্তমন ও শিল্পীর দৃষ্টি—এ দুইয়ের বিরল সংযোগ না ঘটলে জীবনীর উপাদান সৃষ্টি হয় না।

"এক রৌদ্রোজ্জ্বল বিকালে, খৃষ্টমাসের তিন দিন পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যথাবিহিত উপহারের মত আমাদের কাছে এসে পেঁছিলেন। এ উপহার সরিয়ে রাখবার নয়, বা আমাদের দেরিও সইত না।...এসে পেঁছবার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় বন্ধুরা সবাই যখন তাঁকে ঘিরে বসেছেন তিনি বলতে লাগলেন কী ভাবে একটার পর একটা শহরে হোটেল মরু পার হয়ে তাঁকে দৌড়ে ফিরতে হয়েছে, কোনোখানেই তিনি তাঁর সম্পূর্ণ বাণী বলতে পারেন নি। তারপর যখন তিনি এখানে আমাদের জন্য কী করবেন স্থির করেছেন তা জানালেন তখন আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। তিনি বললেন, যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহলে এবারে আমেরিকা ভ্রমণের জন্য যতগুলি বক্তৃতা লিখেছেন তা সব আমাদের শোনাবেন। এই তাঁর চরিত্রের নিখুঁত প্রকাশ, তাঁর যে করার এবং দেবার পরম প্রয়োজন। সাধারণ দৈহিক নিয়মানুসারে তিন মাস ধরে এই লেক্চার টুরের দারুণ শ্রমে তাঁর নিতান্তই ক্লান্ত হয়ে পড়বার কথা। আমরা ভেবেছিলাম আর্বানায় এ কয় দিন একান্ত আবশ্যক বিশ্রাম নিতেই তিনি আসছেন...আমরা ভেবেছি তাঁকে শুধু

---

১ *Modern Review*, Feb. 1917.

আমাদের মাঝখানে আর-একবার পাওয়া, আর-একবার তাঁকে দেখা—তাতেই আমাদের কী পরম আনন্দময় তৃপ্তি...কিন্তু বিশ্রাম দূরের কথা, নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই আমাদের এমন উদার অনুগ্রহ দেখালেন—তবু বিশ্রাম যে তাঁর কত প্রয়োজন সে কথা মনে করে আমরা এ সৌভাগ্য গ্রহণ করতেই পারতাম না যদি তাঁর অফুরন্ত জ্যোতিরুদ্ভাসিত মূর্তি, পূর্ণ স্বাস্থ্য, পূর্ণোদ্যম না দেখতাম। এইভাবে একটি আশ্চর্য ঘটনাই ঘটল। পশ্চিমের প্রতি তাঁর উপদেশের সম্পূর্ণ বাণী উচ্চারিত হল, মান ধন বা জনতার উচ্চকিত বাহবা দিয়ে প্রলোভিত করা যায় এমন কোনো বড় শহরে নয়, ছোট একটি তৃণপ্রান্তরের (Prairie) শহরে—যেখানে আমাদের নীরব ভালবাসাটুকু ছাড়া পরিবর্তে দেবার আর কিছুই নেই।

"মানুষের এমন অভিজ্ঞতা আছে যা সমস্ত জীবনে একবারই মাত্র ঘটে—আমাদের জীবনসীমায় ঘটল তারই আবির্ভাব।

"এর পরও যদি বলি যে Tagore Circle-এর Dr. & Mrs. Kunz-এর বড়দিনের নিমন্ত্রণসভায় কবির সেক্রেটারি শ্রীপিয়ার্সনের শান্তিনিকেতন স্কুল সম্বন্ধে সচিত্র বক্তৃতা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছোট্ট সমাজের পরমানন্দদায়ক হয়েছিল এবং কবি নিজে তাঁর 'সন্ন্যাসী' নাটকটি পড়ে শুনিয়েছিলেন তাহলে ঈর্ষান্বিতেরা ভাববে দেবতারা যে স্বর্গে বাস করেন সে কি কোনো পর্বতশিখরে বা দীন দরিদ্র অজ্ঞাতনামা আমেরিকার তৃণভূমিতে?"

মিসেস সিমুরের এই রচনা পড়তে পড়তে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি মনকে অভিভূত করে। ১৯১৭ সালে আমেরিকাবাসী বিদেশিনী যা লিখেছেন ১৯৩৮ সালে আমাদের অভিজ্ঞতার তা যেন একেবারেই প্রতিলিপি। দেবতাদের বাসভূমি যে পর্বতশিখরেও তা আমরা অনুভব করেছিলাম—স্বর্গ রচিত হয়েছিল 'দীন দরিদ্র অজ্ঞাতনামা' মংপু পাহাড়ে একেবারে অনুরূপ আনন্দময় অনুভূতিতে। আপনাকে আনন্দে দান করবার জন্য উন্মুখ কবির অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বরূপ যে নাম খ্যাতি কীর্তি ও কর্মের দীর্ঘদিনব্যাপী দুষ্কর বোঝা বহন করেও একান্তই অপরিবর্তনীয় ছিল এই রচনাটিতে তার আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গেল।

মিসেস সিমুর আরো লিখছেন: "ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা 'নেশন-তন্ত্র', আমেরিকার প্রতি এইটি তাঁর বিশেষ বাণী—তখন এই বক্তৃতার যে সমালোচনা চলছিল তা প্রধানতই এই যে তিনি Organization-এর বিরুদ্ধে বলেছেন, কিন্তু তার পরিবর্তে উপযুক্ত কিছু দিতে পারেন নি। একটা মত ভাঙতে চান কিন্তু আর-একটা মত গড়েন নি।" এই প্রচলিত সমালোচনার বিরুদ্ধেও আমেরিকান নারীর সুচিন্তিত মতামত সত্যোদ্ভাসিত।

"আমেরিকানরা যেমন অর্ডার করেছে সেইরকম কোনো কিছু একটা 'গড়ে তোলা' তাঁর উদ্দেশ্য নয়—তিনি যে তাঁর বক্তৃতার নাম Cult of Nationalism দিয়েছেন সেই নামের মধ্যেই এই ঘোষণা রয়েছে যে তিনি কোনো তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। তিনি কোনো Cult-এর জন্য ওকালতি করতে চান না। তিনি শুধু আমাদের মনকে সবরকম Cult-এর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চান, মনুষ্যত্বকে আমাদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় এসেছিলেন আমাদের জীবনের কোনো বৃহত্ত্ব দেখে নয়—নিশ্চয় তাঁর কাছে আমাদের আচরণ নিতান্ত স্থূল এবং ব্যর্থ বোধ হয়ে থাকবে, তবু তিনি আমেরিকায় এসেছেন কারণ এদেশে জীবন এখনও একেবারে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে যায়নি। আমেরিকা এখনও মানুষের দেশ, বিভিন্ন জাতির মানুষের মিলনস্থল এবং তিনি মনে করেন এখানে বিশ্বসৌভ্রাত্রের আদর্শ পূর্ণ হতে পারে যদি আমরা আমাদের স্বার্থান্ধতা দমন করে মনুষ্যত্বকে পূর্ণ প্রকাশিত করতে পারি। তাঁর বিদায়কালীন শেষ বাণীতে তিনি আমাদের মহান্ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা প্রকাশ করেছেন, আশা প্রকাশ করেছেন যে মানব-ইতিহাসে আমাদের অস্তিত্ব একটি বৃহৎ অধ্যায় রচনা করবে।

"আমি প্রথমে বলেছিলাম যে ঠাকুর আর্বানাতে বিশ্রাম নিতেই এসেছিলেন এবং শেষ বিদায়সন্ধ্যায় আবার মনে হল তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে তাঁর এই বিশ্রামকে ঘূর্ণ্যমান চক্রের স্থৈর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দ্রুত বেগের জন্যই তাকেও স্থির মনে হয়। তিনি এখানে তাঁর বিশ্রামের ক'দিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, প্রুফ সংশোধন, চিঠি লেখা ও অনুবাদের কাজে কাটালেন এবং দিনটা সর্বদাই শেষ করতেন একটি বক্তৃতা পাঠ করে। এই তিন-চার দিনে তিনি অনেক কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন...আমাদের কাছে এত কাজ একেবারে রীতিমত কীর্তি বলেই গণ্য হবে, কিন্তু আমি কবিকে তাঁর ভাষাতেই আমার হয়ে বলতে বলব যে কাজের ভিতর তিনি খেলার আনন্দই উপভোগ করেছিলেন :

I know that only as a singer
I come before thy presence

তাই আমাদের মনে হয় যে এই কবি প্রভাতের সূর্যালোকে বসে গানের সুরে, বিশ্রাম ও পরমের মিলনানন্দ উপভোগ করেছিলেন।"

এই সহজ রচনাটির মধ্যে কবির যে অতিপরিচিত ছবিটি দেখা গেল তা যেন তাঁর এক শাশ্বত রূপ। কোনো বিদেশীর পক্ষে অল্প পরিচয়ে এমন গভীরভাবে তা চিনতে পারা গভীর সহানুভূতির দ্যোতক। এমনটি ঘটতে

পারে কেবলমাত্র আত্মিক সাযুজ্যে। কবির ব্যক্তিগত সান্নিধ্য যে কত সহজে কত নিঃসংশয়ে মানুষের মনে তাঁর জীবন-সত্যকে উদ্ভাসিত করত এইরকম রচনায় তারই প্রমাণ আছে।

'নেশন-তন্ত্র' সম্বন্ধে মতভেদ হয়েছিল, তবু সে মতভেদ তাঁর প্রভাবকে খণ্ডিত করতে পারেনি। মতভেদ ঘটে বুদ্ধির কোঠায়—যেখানে মানুষের মগজের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট খুপরিতে নানা অবস্থায় নানা কারণে সংগৃহীত এক-একটি মত নিশ্চল হয়ে বসে আত্মরক্ষা করতে চায়, বাইরে থেকে তাকে স্থানচ্যুত করতে চাইলে সে একবার ফোঁস করে উঠে আবার স্বস্থানে স্বভাবে ফিরে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের মন প্রাণ? তার উপরে যখন সত্যবাণী অনুভূতির আলোতে রঙীন হয়ে সহস্র ধারায় ঝরে পড়ে তখন মত যাই বলুক, প্রাণ সেখানে রস পায়, পথ্য পায়। কবির বিদেশে বক্তৃতাসভার যেখানেই বর্ণনা পড়ছি, দেখছি অন্তত কতকগুলি মানুষের দেহমন আনন্দে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। ক্ষণকালের জন্য হলেও তাদের বাক্যে লাগছে সুর। একটি ইংরেজি কাগজ তাই মন্তব্য করছে যে আমেরিকায় কবির লেকচার টুরের ফলে রিপোর্টাররাও কবি হয়ে গিয়েছে। তাদের খবর দেবার ভাষায়ও লেগেছে কবিত্বের ছোঁয়াচ—! কথাটি কত সত্য তা পরবর্তী দুটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে :

“প্রাচ্যের নীরব প্রশান্তির অন্তর থেকে, ঈশ্বরের ধ্যান থেকে, সাধু, কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের তীরে এসে পৌঁছেছেন—এখানকার নিরন্তর দৌড়াদৌড়ি, অবিশ্রাম কোলাহল, অর্থহীন কর্মস্রোত, যার ফলে আমেরিকার জীবনের বিচিত্র রকম অশান্তির ঘূর্ণী বইছে তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন। তাঁর মতে এই ঘোর বস্তুতান্ত্রিকতা ধৌত না হলে আমাদের অদৃষ্টে দুর্ভোগই থাকবে যতদিন না System-এর পরিবর্তে Soul এবং মানুষের শক্তির চেয়ে ঈশ্বরের উপর আস্থা ফিরে আসবে। তাঁর সুন্দর সুগঠিত মাথার ডৌলটি মখমলের মত। তার মধ্যে বিভক্ত কুঞ্চিত কেশদামের উপরিভাগে রুপালী তুষারের কণার মত সাদার আভাস—মহিমাময় উন্নত ললাট, অপূর্ব চোখে আশ্চর্য অপার্থিব দৃষ্টি, অভিজাত 'পাঁশনে'র গোল রেখা, সর্বোপরি তাঁর মুখের শান্ত সুকুমার স্বর্ণাভ সৌন্দর্য যেন সূর্যালোকিত ভারতের আলোর রঙে রঙীন। তাঁর মধুময় দীর্ঘ নবনী-রঙের পরিচ্ছদমণ্ডিত শান্ত মনোজ্ঞ আকৃতি দেখে মনে প্রশ্ন জাগে কী করে তিনি আমেরিকান জীবনের দ্বন্দ্বমুখর বিরক্তিকর অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে রয়েছেন।

“‘আপনার mission কী?’ উত্তরে তিনি হাত জোড় করলেন, তাঁর

আঙরাখার ভাঁজের উপর ন্যস্ত উজ্জ্বল মসৃণ নখে শোভিত সেই সুন্দর করযুগল দেখলে মনে হয় যেন চিরকালই তা অমলিন—কোনো দিনই কোনো মলিন বস্তু তা স্পর্শ করে নি। তাঁর বক্তৃতার স্বর এক গ্রাম নীচে বাঁধা ছিল তবু কি রকম চড়াও তাকে বলা চলে, তাতে ধ্বনিত হচ্ছিল আবৃত্তির মতন ছন্দের তাল। পরিষ্কার শুদ্ধ উচ্চারণের মধ্যে একটি নরম মধুর সুর, সুকুমার শিশুর মত একটি ললিত ধ্বনি মাঝে মাঝে বেজে উঠে, যেমন ওড়নার আচ্ছাদনে মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে সুন্দর নিখুঁত সুগঠিত মুখের ভাস্কর্য লাবণ্যময় হয়, তেমনি তাঁর উচ্চারণকে সুন্দরতর করে তুলছিল।"[১]

এ বর্ণনা পড়ে যদি কোনো ইংরেজ মনে করে যে সাংবাদিকরাও কি কবি হয়ে গেল, তাহলে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের এখন মনে পড়ে তাঁর উচ্চারণের মৃদু মধুর ধ্বনির মধ্যে শিশুসুলভ লালিত্য কখনো প্রকাশ পেত—বিশেষত 'ল' উচ্চারণে—যাঁরা শুনেছিলেন স্মরণ করে দেখবেন। কী নিখুঁত মনোযোগের সঙ্গে কী অভিনব হৃদয়দ্রাবী অনুভবের শ্রবণ পেতেই না বিদেশীরা তাঁর প্রত্যেকটি ভঙ্গী প্রত্যেকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করে গেছে। এমন করে যে দেখে সে কি শুধু খবরের কাগজের রিপোর্টার? না, না, সে সৌন্দর্যোপাসক। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কবির নিজের দেশে কোথাও সে সময়ে এ আগ্রহ প্রকাশ পায়নি। শুধু গান নয়, তাঁর আচরণ, বাক্য ও ভাব সবকিছুরই উপর দিয়ে স্টীমরোলার চালিয়ে লোক তাঁকে নিজের উপযোগী করে নিয়েছে। বারে বারেই তাঁকে সইতে হয়েছে 'স্থূল হস্ত-অবলেপের দুঃখ'—।

ব্যক্তিস্বরূপের মহিমায় অভিভূত সাংবাদিক তারপর কবির বক্তব্য যেমন শুনেছেন বা অন্তরে যেমন বুঝেছেন লিখে যাচ্ছেন।

"দেখো, আমি বিধাতার বিধানে বিশ্বাস করি—নিজেকে প্রস্তুত ও শান্ত রেখে আমি অপেক্ষা করি বিধাতার ইচ্ছা যেন আমার মধ্যে ব্যাহত না হয়। তাই যখন বিদেশের নিমন্ত্রণ পেলাম, বারে বারে ডাক এল, আমি মনে করলাম এ আহ্বানে আছে বিধাতার আদেশ—তোমাদের কাছে আমার কথাটি বলা চাই—আমি জানতাম না কী বলব, যখন লিখতে বসি জানি না কী লিখব—কী কথা প্রকাশ হবে। আমি অপেক্ষা করে থাকি, তারপর যা প্রকাশ পেতে চায় তাকেই ভাষা দিই।..."

কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই—
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই

---

[১] From *The Evening Wisconsin*, America, Quoted by *M. R.* 1917.

কবি যখন এইভাবে বলে যাচ্ছিলেন তাঁর শ্রোতার মনে হচ্ছিল কবির জীবনে ও কাব্যে তো কোনো পার্থক্য নেই—

"যখন তিনি বলছিলেন কী করে বস্তুতান্ত্রিকতার চাপে পড়ে এদেশ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে আমাদের মনে পড়ছিল তাঁরই সেই কবিতা যেখানে কৃপণ তার নিজের ভাণ্ডারে বন্দী হয়েছিল। যে শিকল দিয়ে বিশ্বের ঐশ্বর্যকে বাঁধবে ভেবেছিল সেই শিকলে নিজেই হয়ে ছিল বন্দী—কবির কথা শুনতে শুনতে আমাদের সেই গানটি মনে পড়ছিল—

যে দিন ফুটল কমল
আমি কিছুই জানি নাই
আমি ছিলাম অন্যমনে—

আহা, এত সহজে যা পাওয়া যায়, এত যা অনায়াসলভ্য, তা থাকে দুর্লভ হয়ে—।"

ইংল্যাণ্ডে

ইংল্যান্ডে রোটেনস্টাইন প্রভৃতি সুধীবৃন্দের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে সর্বদা নানা গভীর বিষয়ে আলোচনা করবার সুযোগ কবিকে নিয়ে গিয়েছিল চিন্তার মুক্ত ক্ষেত্রে—স্বদেশে এটি সে যুগে সহজ ছিল না। তিনি রোটেনস্টাইনকে বলেছিলেন—“তোমরা এখানে যখন কথা বল, চিন্তা কর, আলোচনা কর সর্বদাই থাক বিচক্ষণ চিন্তার তীব্র আলোর নিচে। এতে সামাজিক সভ্যতা ক্রমে উন্নত হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে এমনটি হয় না। সেখানে আমরা আত্মীয়স্বজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ। সেই আত্মীয়স্বজনের দলের মধ্যে আমাদের যেমন তেমন করে কথা বললেও চলে, যা বাইরের জগতে চলে না। এর ফলে আমাদের সামাজিক সভ্যতার আদর্শ নেমে যায়।”[১]

অবশ্য পরিবারের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকার সুফল কুফল সবই ভোগ করবার পর কবি সে বন্ধন ছিন্ন করে যে বিরাট সমাজে বাস করতেন, সেখানে দূর নিকট বন্ধু হয়েছিল—নিঃসম্পর্কীয় আত্মীয় হয়েছিল। ইংল্যান্ডে বন্ধুবর্গের সঙ্গে কবির কথোপকথনের আনন্দ, কৌতুক, যা চিন্তার উজ্জ্বল আলোর নিচে প্রত্যহ দীপ্ত হয়ে উঠত সে রকম কত শত রক্ষণীয় গল্পকাহিনী হারিয়ে গেছে। মনীষিবৃন্দ বন্ধুভাবে মিলিত হতেন, সকলেরই ক্ষুরধার বুদ্ধি, রসোজ্জ্বল ভাব, কিন্তু সেই স্বর্গসভার খবর আমাদের আর জানবার উপায় নেই।

কাগজে একটা নিমন্ত্রণ বৈঠকের সংবাদ আছে। কবির লন্ডন ত্যাগের পূর্বে রোটেনস্টাইন, ইয়েটস, বার্নাড শ' প্রভৃতি তাঁর অভ্যর্থনার জন্য ভোজের ব্যবস্থা করেছেন। খাওয়া শেষ হলে তাঁরা কবিকে ভারতের জাতীয় সংগীত বন্দেমাতরম্ গাইতে বললেন। কবি গুনগুন করে সবটা সুর ভাঁজলেন কিন্তু কয়েক লাইন পরেই আর কথা মনে পড়ল না। ইয়েটস তখন আইরিশ জাতীয় সংগীত শুরু করলেন, তাঁর স্মৃতিও দেখা গেল দুর্বল। আরনেস্ট রীস্ তো কিছুতেই ওয়েলস্ জাতীয় সংগীতের কথাগুলি মনেই আনতে পারলেন না। উইলিয়াম রোটেনস্টাইন বললেন, ‘বেশ দলটি জুটেছে।’ তারপর গড্ সেইভ দি কিং গাইতে উঠে তিনিও খেলেন হোঁচট!

কবির সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে বার্নাড শ'র খ্যাতি অনন্যসাধারণ।

---

[১] *Men & Memories*

ইংল্যান্ডে কবির সঙ্গে বার্নাড শ'র সাক্ষাৎকারের খুচরো বিবরণ এদিক ওদিক ছড়ানো আছে। দুজনেরই একটি বিষয়ে ঐক্য—রহস্যপ্রিয়তা। কবির প্রাণপ্রবাহই প্রহাসিনী। মানবজীবনের অসামঞ্জস্যের নানা অভিঘাত কৌতুকের হাওয়া লেগে হাস্যমুখর হয়ে চতুর্দিক করে রসপূর্ণ।

কবির এই কৌতুকপ্রিয়তার কথা স্মরণ করে রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন—"ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হলেই লোকের মনে আসে ক্রান্তদর্শী কবির গভীরতামগ্ন মুখচ্ছবি। সেই প্রভাবপূর্ণ রহস্যাবৃত মূর্তি—যাঁর ধীর বাক্য, লাবণ্যময় ভঙ্গী, আর সুন্দর পক্ষ্মছায়ার তল থেকে আলোকবিচ্ছুরণকারী দুটি চক্ষু গম্ভীর মহিমা বিকীর্ণ করছে। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হলে লোকের স্বভাবতই মনে হয় সে যেন চার্চে এসেছে, তার স্বর মৃদু হয়ে যায় সম্ভ্রমে...এই ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর তাঁর মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদেরই মত, সে যেন পর্বতশিখর থেকে যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণের জন্যই নির্দিষ্ট, কারু মনেই হয় না যে ঐ স্বরে কখনো ঘরোয়া কথা উচ্চারিত হতে পারে।"

"ইয়োরোপ যখন ভারতের প্রতিভাশালীদের কথা ভাবে, সে খালি গাম্ভীর্যের মূর্তি স্মবণ করে। ভুলে যায় বুদ্ধের ঠোঁটের উপরে যে হাসির খেলা ভাসছে; ভুলে যায় তাঁর কথাবার্তার মধ্যে যে পরিহাস-কৌতুক আছে। এশিয়ার ঋষি ও দেবতারা সকলেই পরিহাস-রসে রসিক ছিলেন, কেবল ওল্ড টেস্টামেণ্টের ভয়ানক রাগী দেবতারা হাসতে জানতেন না। গল্প আছে, এ গল্প রবীন্দ্রনাথের কাছেই শোনা,—

"একদা এক রোরুদ্যমান ছাগশিশু ব্রহ্মাকে গিয়ে বললে, 'প্রভু আমি কেন সকল প্রাণীর খাদ্য হয়েছি?' ব্রহ্মা তার নধরকান্তির দিকে চেয়ে বললেন, 'বৎস, উপায় কী? তোমাকে দেখে আমারই জিভে জল আসছে।' তা স্বয়ং প্রজাপতিই যদি তাঁর সৃষ্ট প্রজার সঙ্গে রহস্য করতে লজ্জিত না হন, তবে অন্য মুনিঋষির বা ছোটখাট দেবতার হাসতে মানা থাকতে পারে না।"

সি এফ এনড্রুজও নাকি রোমাঁ রোলাঁকে বলেছিলেন যে প্রথমেই যেদিন তাঁর কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তিনি মনে করেছিলেন অতি ভব্যতার সঙ্গে গভীর বিষয়ে সুধীর আলোচনা ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না...কিন্তু দিন শেষ হবার পূর্বেই গুরু তাঁর সঙ্গে এমন একটি মজা করেছিলেন যা এনড্রুজকে চিরদিন হাসিয়েছে। কবির রহস্যপ্রিয়তার সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁ আরো বলেছেন—

"ভারতবর্ষের কবি ও মনীষীদের মধ্যে রহস্যপ্রিয়তার অভাব ছিল না (সত্য কি? রামায়ণ-মহাভারতে হাস্যরস আছে কি?) এটা ধ্যানের বিপরীত মুখ—চিন্তার ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই কৌতুকবোধ অপরিহার্য।

যে দ্রষ্টাকে সাধারণ মানুষ কল্পনা করে ধ্যানমগ্ন মূর্তিতে, যাঁরা স্মিতমুখে জগতের বিরহমিলনের নাট্যলীলার দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁদের দর্শন পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। এ সম্বন্ধে কার্ল স্পিটলার ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনা চলে, এঁরা দুজনেই জীবন-নাট্যের অসংখ্য অঙ্কের কোনো খেলাই বাদ দেন না।"

রোমাঁ রোলাঁ বার্নাড শ'র সঙ্গে কবির হাস্যকৌতুকের কোনো তুলনা করেননি। বস্তুত দুজনের পরিহাস-রস ভিন্নমুখী। একজন আমেরিকান সাংবাদিক লিখেছিলেন, "কবি সমালোচনা করেন কিন্তু তার মধ্যে কখনো যে বিষ উদ্গীরিত হবে তা ভাবাই যায় না। তাঁর বিশ্লেষণকারী সমালোচনা কৌতুকে, উপমায়, বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করে, কিন্তু তাঁর হাস্যে খোঁচা নেই, অন্যের স্খলনে আমোদ নেই, বিষাক্ত বিদ্রূপানিষিক্ত শর ছুঁড়তে তিনি জানেন না, শুভ্র প্রভাতের মত নির্মল হাস্য বিকীর্ণ করে জীবনের তাপ জুড়িয়ে দেন--তখন আমরা দেখি তিনি কবি, দণ্ডধারী শাসক নন।"

আবার বার্নাড শ'র কোনো জীবনীকার নাকি লিখেছিলেন যে, "বার্নাড শ' বস্তুটি, অহমিকার পর্বত না বিনয়ের মূষিক তা বোঝা অসম্ভব।" রবীন্দ্রনাথকে ইদানীং বার্নাড শ' সম্বন্ধে কথাচ্ছলে প্রশ্ন করায় তিনি অবশ্য বলেছিলেন যে অহমিকা কখনই নয়।—'অমন করে সত্যিই কি কেউ নিজের কথা বলতে পারে। ওটা একটা রকম আর কি।' বার্নাড শ'র পাঠকরাও নিশ্চয়ই তাই অনুমান করেন, কারণ বার্নাড শ'র বিদ্রূপের কশা তো নিজেকেও ছেড়ে দেয় না।

১৯৩৩ সালে সুধীন্দ্র বসু 'আমেরিকায় বার্নাড শ' নামে একটি প্রবন্ধে লিখছেন—'আমেরিকায় একদা রসিক বলে প্রশংসিত হলেও, পরে তিনি ভাঁড় রূপে আবিষ্কৃত হন।' সুধীন্দ্র বসুর মন্তব্য কিছু কড়া, কিন্তু উত্তাপ অকারণ নয়—আমেরিকার নিন্দায় পঞ্চমুখ বার্নাড শ' নাকি অন্ধ বধির ও মূক মহীয়সী হেলেন কেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বলেছিলেন—'এ আর আশ্চর্য কি, সব আমেরিকানই তো অন্ধ, বধির ও মূক।' এরকম কৌতুক আমেরিকার শত্রুপক্ষের হাস্যোদ্রেক করলেও নিশ্চয়ই এটি ঠিক ঠাট্টার বিষয় নয় এবং অভদ্রতাও পরিহাস নয়। তুলনায় শ্রীমতী হেলেন কেলারের সঙ্গে কবির পরিচয়ের মাধুর্যপূর্ণ ছবিটি মনে আসে।

বার্নাড শ'র ভাবখানা হচ্ছে, যা কিছু জনমত, যা কিছু সর্বজনগ্রাহ্য আমি তার প্রতিবাদ করবই। সেই ভাব মনে নিয়েই হয়ত ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া' নামে কদর্যতম বইর সমর্থন করেন ও রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি প্রাচ্য সভ্যতার গুণগ্রাহীদের স্বধর্মত্যাগী (renegade) বলেন ও টলস্টয় সম্বন্ধে নির্মম নিন্দাবাদ করেন। শ'র মতে টলস্টয় তেমনি সাধুর গেরুয়া

পরেছেন যেমন ডন কুইকসট যুদ্ধের পোশাক পরেছিলেন। বার্নাড শ' কোনো কিছু মেনে নেবার পাত্র নন—কিন্তু এমন ভাব আছে, এমন চিন্তা আছে, এমন আনন্দ আছে, যা বিমুখ মনের কাছে ধরা দেবে না। সেজন্যই হয়ত বার্নাড শ'র রসবোধ রবীন্দ্রনাথের থেকে ভিন্নমুখী এবং অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ও বার্নাড শ'র কথোপকথন ও পরিচয়ের যে দু-একটি খবর আছে তার একটি সুন্দর বিবরণ 'Jcsting Prophets' নামক বই থেকে শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

রোটেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের কথা ১৯১২ সালে শ'কে লিখলেন—'আমি চাই তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখো, কারণ তুমি তো এ-জীবনে বেশী সাধুও দেখনি কবিও কমই দেখেছ। তিনিও দেখছেন এবং আরও দেখুন যে ইংল্যন্ড অ্যাংলো ইন্ডিয়া নয়—তাই তুমি নিশ্চয় এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করো। তিনি বাংলাদেশের ধর্ম সাহিত্য সাম্য জ্ঞান ও আভিজাত্যের পূর্ণ প্রতীক। ভারতের যদি এমন প্রতিনিধি আর নাও থাকে তবু এঁরই জন্য ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতাপ্রাপ্ত দেশ বলে আমাদের গণ্য করা উচিত। এ আমার যৌবনোচিত অত্যুৎসাহের মত শোনাচ্ছে। কিন্তু আমাদের যা কিছু দেবার তা ক্ষমতা কৌশল ও প্রাণশক্তির পথেই, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় নয়। এই যেসব গুণের কথা অনুমান করা যাচ্ছে হয়ত এখনো তা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়নি, তবু তোমরা উভয়ে পরস্পরের কাছে তারই পরিচয় দেবে।'...

রোটেনস্টাইনের চিঠি বার্নাড শ'কে চিন্তিত করে। বার্নাড শ' বহু সাধু-সজ্জনের সঙ্গ পেয়েছেন, একত্র কাজ করেছেন, উইলিয়াম মরিস, প্রিন্স ক্রোপটকিন, অ্যানি বেসান্ট ইত্যাদি ইত্যাদি—এঁরা কেউ কম নন। কবিও অনেক দেখেছেন, সুইনবার্ন, মেরিডিথ, ইয়েটস্ এমন কত, এঁরা কি কবি নন? কাজেই চিঠিটা কিছু দুর্বোধ্য সন্দেহ কি। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর প্রাচ্য সভ্যতার সর্বকিছুর প্রতিই অনুরাগ। তাই স্ত্রীর অনুরোধে পড়ে কবি-সন্দর্শনে যেতে রাজী হলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাক্যালাপের মনে মনে একটি খসড়া করে নিলেন। তাঁর লেখা পড়লেন যা হুইটম্যানের লেখার মতই তাঁর দুর্বোধ্য ঠেকল.. তাঁর স্ত্রী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে নিজেই সব কথা না বলে যেন রবীন্দ্রনাথকেও দু-একটা কথা বলতে সুযোগ দেন!

খাবার টেবিলে শ' কিছুই খেলেন না কাজেই প্রচুর কথা বলতে পারলেন। তিনি ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিলেন ধর্ম বলতে ঠিক কী বোঝায়, জানিয়ে দিলেন গান্ধীজী, টলস্টয় থুরো প্রভৃতির প্রভাব ধর্মপ্রাণিত। আরো বললেন যে সাধুর বেশে অনেক অসাধু তাঁর দেখা আছে, আবার অসাধুর মধ্যেও সাধু দেখেছেন।—'দেখুন, ভারতবর্ষে সাধুসজ্জনকে সম্মান কবা হয়,

তাঁরা পূজা পান—কিন্তু এদেশে আমার মত লোক উপহাসের পাত্র! (অর্থাৎ তিনি সাধু!) তাই আমাকে ধর্মের তৃষ্ণা চেপে রাখতে হয়, আমার বাবাকে যেমন মদ্যপানতৃষ্ণা চেপে রাখতে হত।'

তারপর যখন চা এল, শ' বললেন ও-বস্তুতে তাঁর রুচি নেই। সভ্যতার তিনটি বিষ প্রাচ্য থেকে এসেছে—চা, সংস্কৃতি ও মার্জিত রুচি! কবি উত্তর করলেন—পাশ্চাত্য দেশও তিনটি ভয়ানক বিষ পাঠিয়েছে, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তখনই অর্থসম্পদ সম্বন্ধে বিতর্ক উঠল। বার্নার্ড শ' বললেন, টাকাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পদার্থ এবং সংসারসুদ্ধ লোক যে টাকাই চায় এইটাই বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে আশার কথা! ঠাকুর এ কথায় আমল দিলেন না এবং দারিদ্র্য, নম্রতা ও সরলতার গুণগুলি বললেন।...

বার্নার্ড শ' নাকি বলেছিলেন, 'আমি সেদিন রবীন্দ্রনাথকে জয় করতে পারিনি। আমি একটু কাবু হয়ে পড়েছিলাম—হয়ত তাঁর সুদীর্ঘ সাদা দাড়ি দেখেই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—এমন সুন্দর সিল্ক-মসৃণ দাড়িও মানুষের হয়।'

১৯৩১ সালে বার্নার্ড শ' ও রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দুই মহাজ্ঞানীর সাক্ষাতের একটি বিবরণ আছে। কাগজে লিখছে—"যতক্ষণ ঠাকুর কথা বলছিলেন বার্নার্ড শ' পিছনে দুটি হাত নিবদ্ধ করে উৎসুক মনোযোগে নীরবে তাঁর কথা শুনছিলেন। পরে তাঁরা একত্রে ফোটো তোলবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু ঠাকুরের শুভ্রশ্মশ্রুদাম—আইরিশ গুম্ফের চেয়ে অধিক সুন্দর—দুজনের মুখশ্রীর মধ্যে শ্মশ্রুর ঐক্য থাকলেও ব্যক্তিত্বের এমন বিপুল পার্থক্য ধারণা করা যায় না—ডাঃ ঠাকুর শান্ত, সমাহিত; বার্নার্ড শ' চঞ্চল এবং সজাগ।"[১]

১৯৩১ সালের লন্ডনের 'ইভনিং নিউজ' পত্রিকা আর-একটি খবর দিয়েছে যা আমাদের বর্তমানে একেবারেই অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ নাকি বার্নার্ড শ'র একটি কার্টুন এঁকেছিলেন! লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডের একটি হোটেলে বার্নার্ড শ' ও মিঃ ম্যাক্সকে কবি অন্যান্য ছবির সঙ্গে সেটিও দেখান। ম্যাক্স ইংল্যান্ডের একজন শ্রেষ্ঠ ক্যারিকেচারিস্ট—তিনি নাকি সেই ছবিটির প্রভূত প্রশংসা করেন। জানি না সে ছবি কোথায় আছে। ক্যারিকেচার মানেই কোনো অসংগতিকে বাড়িয়ে তোলা—বিদ্রোহী বার্নার্ড শ'র অসংগতির অভাব নেই—আর কল্পনাপ্রবণ রবীন্দ্রনাথই বা একটু বাড়িয়ে কেন বলতে পারবেন না—অতএব ছবিটি অনুমান করা যায় ভালই ক্যারিকেচার হয়ে থাকবে!

---

[১] *Pioneer*, Allahabad. 25. 1. 31.

আমরা জানি কবির স্বাদেশিকতা কোনো ভূগোলের গণ্ডি দিয়ে আবদ্ধ নয়। স্বদেশে তিনি বিদেশী শিক্ষা ও সাহিত্যকে মুক্ত বাতায়ন বলে মনে করেন, যে পথ দিয়ে নূতন চিন্তা, সংস্কারমুক্ত ভাব ও যুক্তিবাদের শুদ্ধতা এসে বহু সংস্কারাচ্ছন্ন পঙ্কবদ্ধ জীবনস্রোতকে নির্মল করবে। কিন্তু বিদেশে গিয়ে যখন শক্তিমদগর্বিত সাম্রাজ্যজয়ী পাশ্চাত্য জাতিদের দুর্বল জাতির সঙ্গে ব্যবহার লক্ষ্য করেন, যখন দেখেন দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড ক্রমাগতই এক দিকে ভারি হয়, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলভিত্তি ন্যায়বোধে প্রতিষ্ঠিত কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে! বারেবারেই তিনি বলেছেন যে তাঁদের বাল্যকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর তাঁদের যে বিশ্বাস ছিল আজ তা স্থির রাখা কঠিন হয়েছে। ঐ সময়ে লন্ডনের একটি কাগজে এফ এল্ মিন্নিগেরোডি নামে এক ব্যক্তির রবীন্দ্র-সন্দর্শনের বিবরণ পাওয়া যায়। লেখনটির শিরোনামা—'এশিয়া খৃশ্চান সভ্যতাকে কী চোখে দেখে' :

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে মহিমান্বিত কোনো আকৃতি অনুমান করা যায় না—তাঁর মুখশ্রী সুকুমার, অমন সৌকুমার্য সারা জীবন সুন্দর চিন্তা করলে, মানুষের প্রতি শুভ ইচ্ছা বহন করলে তবেই জন্মাতে পারে। তাঁকে প্রায়ই মিস্টিক বলা হয়, কিন্তু তিনি মানুষের প্রতি এমনি সহৃদয়, এমনই করুণাপূর্ণ যে তাঁকে মিস্টিক বলা চলে না। প্রথমেই তিনি বললেন যে, সমস্ত এশিয়াতেই আজ ইয়োরোপ সম্মান হারিয়েছে...পূর্বে এশিয়া ইয়োরোপকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখত। অল্প বয়সে আমি ইয়োরোপ দেখবার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকতাম...আমি উৎসুক হয়ে ভাবতাম যে সেখানে যে মনুষ্যসমাজের সঙ্গে আমার দেখা হবে তারা বিবেকচালিত, তাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয় সমগ্র জাতির মধ্যেই ন্যায়বুদ্ধির প্রভাব দেখতে পাব। আমার মনে কীট্স, শেলী, বায়রন ও অসংখ্য অন্য অনেক মনীষীর ভাবের প্রতি ছিল অত্যধিক বিশ্বাস, জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তারই প্রতি উদ্বোধিত তাঁদের আহ্বানে আমার মনে সে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছিল..."

কবি নানা স্থানে বারবার বলেছেন তাঁদের অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্য সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁদের মনে গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল। বিশেষত কীট্সের কবিতার কথা বলতে গিয়ে একটি ঘটনার তিনি অন্যত্র বহুবার উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁরা ঐ কবিতার রসে ভরপুর হয়ে থাকতেন, একদিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের [অবনীন্দ্রনাথের] মধ্যরাত্রে কীট্সের একটি লাইন স্মরণ করে এমনি আনন্দ হয় যে উচ্ছ্বাসভরে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে তুলে, 'রবিকা, এমন কথা কেউ লিখতে পারে' বলে কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন।

"পরবর্তী যুগের মহামতি লিঙ্কনও মহিমাময় হয়ে উঠলেন, গ্যারি-

বাল্ডকে মনে হত সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে নিরত...এই সমস্ত মানুষরা আমার মনে এই বিশ্বাস এনেছিলেন যে ইয়োরোপের মানুষের মধ্যে আমি সত্যভাব পাব, জাতির মধ্যে পাব, ব্যক্তির মধ্যে পাব, সেই মহাদেশ দেখব যেখানে সমস্ত মানুষ শ্রেষ্ঠ আদর্শে পৌঁছবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট... কিন্তু সভ্য জগতে ভ্রমণের সময় ইয়োরোপে, আমেরিকায়, জাপানে সর্বত্র একই ভাব দেখছি. দেখেছি বর্তমানের যুগধর্ম সমগ্র জাতিকে দুর্নিবার গতিতে কেবল বস্তুমোহে .আকর্ষণ করছে...আজ তাই বড় বড় মানুষেরা, বড় বড় জাতিরা শুধু পরিমাণ দিয়েই মূল্যধার্য করছে...কিন্তু শুধু বস্তুপিণ্ডই তো মূল্যবান নয়...একজন মানুষের এমন কিছুই কৃতকার্যতা প্রমাণ হয় না যদি তার ফ্যাকটরিতে দিন একশখানা মোটরগাড়িই তৈরি হয়। এসব যান্ত্রিক কলা-কৌশল শিখতে পারা এমন কিছু ব্যাপার নয়, কিন্তু মানবজীবনের বিচিত্র কৌশল কে আয়ত্ত করতে পারে?

"...বড় বড় শল্যচিকিৎসকরা শরীরকে চেনে, মাংস ভেদ করতে পারে, কিন্তু মানবাত্মাকে চেনবার চেষ্টা কে করে? হিসাবের যন্ত্র (calculating machine) আজ দশানুশাসনের (Ten Commandments) চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে...পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ বহু উৎপাদনের (mass production) মাপে সব কিছুর মূল্য বিচার করছে...তুমি সাংবাদিক হিসাবে নিজেও কি মনে কর যে ঐ মোটা মোটা খবরের কাগজের বোঝা যা লন্ডনের রাস্তায় বিক্রি হয় চার পাতা পাঠযোগ্য জিনিসের চেয়ে তা শ্রেষ্ঠ? আর ঐ বিশ-চব্বিশ পাতাওলা খবরের কাগজের পাঠকরাই বা কি নির্বোধ!

"আজ এশিয়ার মানবসমাজ সভয়ে লক্ষ্য করছে ইয়োরোপের জাতিগুলি যে উগ্র জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের অভ্যাস করছে জগতের পক্ষে তা কী অমঙ্গলজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে আজ জাপানের মনও গেছে বদলে। প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা, বস্তুসম্পদের লোভ ও অন্যকে হুমকি দেবার ইচ্ছা তার মনকে চেপে ধরেছে...মানুষের নৈতিক মর্যাদা তার সম্পদ-গৌরবের চেয়ে অনেক বড়। সাম্রাজ্যলিপ্সা সেই আত্মমর্যাদা নষ্ট করে.. মানুষকে দাস করে...আমি বার বার বলেছি যে উগ্রজাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদ, আজ পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে যার তালিম হচ্ছে তাতে সমগ্র জগতের সর্বনাশ আসন্ন করে এনেছে... একথা ভাবাও অদ্ভুত যে আমি কখনো এমন কোনো মত বা কার্যক্রমকে সমর্থন করতে পারি যার ফলে মানুষের উপর জবরদস্তি করা হয় বা তার কণ্ঠরোধ করা হয়। [এখনো মুসোলিনী সংক্রান্ত ঘটনার ইঙ্গিত করা হয়েছে।]

সাংবাদিক লিখছেন—'কবি অনন্ত বলেছেন যে এ জগতে ন্যায়ধর্মের একটা

নিয়ম আছে...সে নিয়ম দল বাঁধলেই উল্টে যায় না—যা ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় জাতির পক্ষেও তা অনুচিত—ন্যায়ধর্মকে জাতির দোহাই দিয়ে অমান্য করে ব্যক্তিগতভাবে তার সুবিধা আশা করা যায় না।' সাংবাদিক আরো বলছেন, 'সেদিন ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন যে আজ যদি যীশু খৃষ্ট নিউইয়র্কে আসতেন তাহলে অন্য কোনো কারণে না হলেও যথেষ্ট ডলার নেই বলে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হতই...আর যদি তিনি আমেরিকার নাগরিক হতেন তাহলে কু ক্লুক্স ক্ল্যান তাঁকে শেষ করতই।'

এ কথার পরে সাংবাদিক করুণভাবে কবিকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'আপনি কি মনে করেন আমরা অতটাই খারাপ?'

তিনি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে চলেন—

'আচ্ছা, আজকের দিনে Blessed are the meek এই উক্তি কি রাষ্ট্রনৈতিক অপযশ নয়? ধরো, যদি আজ ক্রাইষ্ট আমেরিকায় দাঁড়িয়ে বলেন Blessed are the poor, তাহলে সে কথা কি অর্থনীতি অনুসারে অশাস্ত্রীয় বলে গণ্য হবে না (economic heresy)? আজ যদি তিনি তোমাদের দেশে এসে বলেন যে উটের পক্ষে ছুঁচের ছিদ্রে প্রবেশ করা যত সহজ ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করাও তেমনি সম্ভব (It is easy for the prosperous to reach the kingdom of heaven, as for a camel to pass through the eye of a needle) তাহলে কি তাঁকে জেলে দেওয়া হবে না? হয়ত আজ আমেরিকায় খৃষ্টকে তাঁর মুখের কথার জন্য কেউ শারীরিক শাস্তি দেবে না, কিন্তু একথা তো সত্য যে আমেরিকায় কেউ যদি নত বা দরিদ্র হয় তবে সে অপমানিত হবে?'[১]

এই সাক্ষাৎকারের বিবরণটির বিষয় *Edinburgh Evening News*-এ একটি সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয় যেখানে প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে প্রচুর নিন্দাবাদ করে সম্পাদক বলেছেন, "তবু আমেরিকায় নিশ্চয় অন্য দেশের মত অনেক লোক আছেন যাঁরা ন্যায়ধর্মের সম্মান ও শুদ্ধ মনুষ্যত্বে পূর্ণ—কবি বাইরের জীবনকেই বড় করে দেখেছেন।" তথাপি কবির কথার সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়েছিল ক্যানাডা থেকে প্রত্যাবর্তনের মুখে—সে কাহিনী যথাস্থানে বলব।

সে সময়ে কবি ইংল্যান্ডে হিবার্ট লেক্‌চার দিতে এসেছেন। স্বাধীনতার যুদ্ধ তখন প্রবল। রবীন্দ্রনাথও সে যুদ্ধের সৈনিক তথাপি ইংল্যান্ডের কাগজে আমরা তাঁর বিপুল সমাদরের খবর পাই।

"ইয়োরোপে বহু লেখক নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ

---

[১] Extract from *Referee*, London, 5. 8. 28

পুরস্কার পেয়ে পুরস্কারকেই পুরস্কৃত করেছেন।" তেমনি গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে বহু মনীষী হিবার্ট বক্তৃতা দিয়েছেন তবু ম্যানচেস্টার গার্ডেন লিখছে তাঁদের স্মৃতিতে এমন করে কেউ সংবর্ধিত হয়েছেন বলে মনে পড়ে না। "রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে উৎসুক বিশাল জনতা সভাগৃহ পূর্ণ করে সিঁড়ির ধাপের উপরে ইতস্তত অপেক্ষমান। যদিও বিষয়টি বোঝা সহজ ছিল না, তবু কৌতুক ও স্বচ্ছ উদাহরণে ঝলমল করে সমগ্র বক্তৃতাটি যেন আলোকিত হয়ে উঠেছিল! সর্বোপরি কবির ব্যক্তিত্বই তাঁর কঠিনতম চিন্তাকে সরল, সহজবোধ্য করে তুলেছিল। তিনি যখন কথা বলছিলেন সূর্যের আলো তাঁর সাদা চুলের উপর ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সুন্দর মুখকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, সেই সৌন্দর্য সহযোগে তাঁর প্রাণময় কণ্ঠস্বরে, উদ্বেলিত ভাবস্পর্শে, যা কিছু অনধিগম্য তা সরল হয়ে সুখ সঞ্চার করে মনে প্রবেশ করেছিল।"১

"বিশ্বভারতীর জন্য আবেদন জানাতে কবি সভায় এলেন! সেখানে শ্বাসরুদ্ধকারী জনতা উদগ্রীব হয়ে আছে তাঁর মহিমাময় শিরোরেখাটি দেখবার জন্য, তাঁর স্বরধ্বনি বাঁশির স্বরগ্রামের মত হালকা সূক্ষ্ম—কবি কোনো সাধারণ ভাববিলাসী নন। তিনি বলছিলেন, বিশ্বে শান্তি সদ্ভাব স্থাপনা পরস্পরের জ্ঞানের চিন্তার আদানপ্রদানের দ্বারাই গড়ে উঠতে পারে—তিনি বিশ্বাস করেন না যে, কিছু মানুষকে জাতি অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধ করে দল পাকিয়ে এ কার্যসাধন সম্ভব। তারপর তিনি যা বললেন এ রকম কঠিন কথা আমি পূর্বে শুনিনি, তিনি বললেন জাতি অনুসাবে দল বেঁধে এ কাজ করতে যাওয়া যেন ডাকাতকে দিয়ে পুলিশের কাজ করাবার মতই।"২

কবির এই উক্তিটির বিষয় আর-একটি কাগজে লিখছে—"লন্ডনে ৮ই জানুয়ারি পূর্ব ও পশ্চিমের মনীষীদের সাক্ষাৎ হল। হাস্যমুখে বার্নাড শ' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'হ্যান্ডশ্যাক' করলেন।. আইরিশ নাট্যকার ও ভারতীয় কবির একটি নিমন্ত্রণসভায় সাক্ষাৎ হলে, কবি বলেছিলেন যে পলিটিসিয়ানরা যে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করে এটা শোচনীয়, যেন একদল ডাকাত জুটিয়ে পুলিশের কাজ করানো। শ' ঠাকুরকে বললেন, 'আমি আমার দেশবাসীকে সর্বদা বলছি—পলিটিসিয়ানদের কথা শুনো না।—আমার লেখা দিয়েও সে চেষ্টা করেছি। কিন্তু জানেন তো, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে কোনো মতে আনা কী কঠিন কাজ।"৩

---

১ *Modern Review*, July, 1930.

২ *Yorkshire Post*, 9. 6. 31.

৩ *Daily Mail & Empire Canada*, 9. 1 31.

বিভিন্ন সময়ে বিদেশে বাসকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ ঐ দেশবাসীরা লিখেছেন, তার মধ্যে দু-একটি এখানে উদ্ধৃত করছি। দুঃখের বিষয় ভাবের প্রতি অত্যধিক লক্ষ্য রাখার জন্য, ভাষার কৌতুকচ্ছটা যা কবির প্রত্যেক কথার মধ্যে ঝলমল করত, অধিকাংশ সাংবাদিক, অনুলেখক তা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করে, নীর ত্যাগ করে ক্ষীর গ্রহণের রীতি পালন করায় বহুস্থলেই প্রাণদায়িনী নীর যেমন সঞ্জীবনী হত তা হতে পারেনি। তবুও পদে পদে উপমার ব্যবহারে তাঁর আলোচনা, বক্তব্য যে সজ্জিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠত তার প্রমাণ আছে। রবীন্দ্রকাব্যের মত তাঁর ভাষণের মধ্যেও বহুদিকব্যাপী, প্রাণসঞ্চারী উপমা সত্যের অব্যবহিত বোধ জাগিয়ে তুলত।

কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ—

“মহত্তের ভাব বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন। সূর্যাস্তের মহিমার সামনে, ঊর্ধ্বোত্থিত গিরিচূড়ার সামনে, আলোকবিচ্ছুরিত হিমপ্রান্তরের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের মনে যে বিস্ময়, ভাষা তা প্রকাশ করবার শক্তি রাখে না—কেবলমাত্র আমাদের অনুভূতিতে যে প্রভাব পড়ে তারই মধ্যে সেই সৌন্দর্যস্বরূপকে ধারণা করা যায়। ঠিক সেইরকমই আমাদের মনের অবস্থা হয় যখন আমরা কোনো মহাজনের সামনে আসি। তাঁদের ব্যক্তিত্বের জ্যোতির্ময় স্পর্শ আমাদের চেতনায় এমনি প্রত্যক্ষরূপে প্রবেশ করে যেন মনে হয় সে শক্তিবিচ্ছুরণ ইন্দ্রিয়গম্য। অনেক সময় এর ফলে আমাদের বড় সাধের অহং-এর উপর আঘাত লাগে, আমাদের অহংকার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সে আঘাতে। আবার কখনো তা আমাদের মনপ্রাণ ভরে দেয় শান্তিতে, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে আমরা ভাবি যে আমরা নিজেরা যতই অকিঞ্চিৎকর হই না কেন মহদাশয়ের দর্শন-সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। এইরকমই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহত্ত্ব।”

কবির সঙ্গে আলাপের কিছু অংশ উদ্ধৃত করে লেখা এই প্রবন্ধটি সে সময়ের অনেক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি বলছেন :

“প্রত্যেক জাতির ভাষাও সেই জাতির মতই. হয় তা এগিয়ে চলবে কিংবা মরে যাবে—অচল হয়ে তা বাঁচতে পারে না। জাতির মত. সমাজের মত, ভাষাও সচল হওয়া চাই। তোমরা আজকাল চসারের ভাষায় কথা বল না, বর্তমানের চলতি কথ্যভাষা ভিক্টোরিয়ার যুগের শুদ্ধভাষাভাষীর কাছে যেমন বোধ হয় চসারের কাছে এলিজাবেথের সময়ের ভাষাও তেমনি বোধ হবে। যে কাল পিছনে চলে গিয়েছে ভাষায় তার প্রতিধ্বনি বাজে, সেই যে কবিত্বের যুগে সে ইতস্তত মন্থরভ্রমণে বিচিত্র পথে চলত সেখান থেকে সে আজকের কর্মাক্রান্ত দিনের ডানাছাঁটা মিলহীন বাক্যে রূপান্তরিত। এতে

নিন্দনীয় কিছু নেই। প্রত্যেক উর্বরা সৃষ্টির পর একটা সময় আসে যখন ভাষা নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকবারই তার নব নব জন্মের সময়ে সে সরল, জোরালো হয়ে ওঠে, অর্থাৎ শক্তির প্রেরণার জন্য সে আদিম উৎসে ফিরে যায়।”...সাংবাদিকরা সর্বদাই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে নেন। কবি বলেছেন—“সত্যকার সংস্কৃতির কোনো সীমা-রেখা নেই—তা সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বকে পরাবৃত করে ফেলে বাতাসের মত। যেমন আবহাওয়ার মধ্যে উত্তাপের তারতম্য আছে, শীত গ্রীষ্ম নানা পরিমাপে পরিব্যাপ্ত কোথাও গ্রীষ্মমণ্ডলের মহিমা, কোথাও মেরুর হিমসমারোহ, কিন্তু এই সম্পূর্ণ বিপরীত ধীরে ধীরে একে অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যায়—কোনো সীমারেখায় তাকে খণ্ডিত করা যায় না।...

“প্রাচ্য দেশ শান্ত ধৈর্যে স্থির—সে প্রকাশস্বরূপ কালকে চেনে। পশ্চিম, উৎসুক অশান্ত, যৌবনচঞ্চল। কিন্তু এই দুই জগৎ যে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করে তা এক। পাশ্চাত্য জগৎ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখে—দেখে তার নবীন নয়ন দিয়ে, দেখার ইন্দ্রিয় দিয়ে। প্রাচ্য, সকল সৃষ্টির মূলে যে গভীর ঐক্য তাকে জানে। সে দেখে তার কালহীন আত্মার ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে তবু তাদের উভয়ের দ্রষ্টব্য একই। সে এই মানুষের জগতের গূঢ় ঐক্য।...আমাদের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মিক দৃষ্টির শক্তি বাড়ে। আমরা প্রত্যেক ব্যাপারের অর্থ বুঝতে পারি। পিছন ফিরে যখন দেখি তখন মনে হয় না কি সোনার দিনগুলি ফেলে এসেছি? কিন্তু অতীতের দিন যে বর্তমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা নয়, শুধু আমাদের মনের পরিণতি হয়েছে, দূর থেকে দেখে অতীতের পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারছি। বোনার কাজ সম্পূর্ণ হলে তবেই বয়নকারীর নকশাটা বোঝা যায়।..নাম যশ খ্যাতি, সুযোগের ফসলমাত্র, তা ক্ষণস্থায়ী। ধরো, মহাযুদ্ধের সময় একজন একটা দেশপ্রেমের উদ্দীপক গান লিখলেন, জন-সাধারণ তাঁর রচনার মধ্যে নিজেদের মনোভাবের প্রতিচ্ছবি দেখে তাঁকে কাঁধে তুলে নিলে—তাঁর কথা সব দিকে ধ্বনিত হতে লাগল, তাঁর গান সৈন্যপদক্ষেপের তালে তালে স্পন্দিত হল। এল শান্তি। আর-একজন কবি এলেন, গাইলেন শান্তির গান, নিরাপদ আনন্দের গান। উচ্চকিত সেই প্রথম গানটি ভুলে গেল মানুষ। নূতন সওয়ারী আবার চড়ল জনপ্রিয়তার কাঁধে। সমসাময়িকরা রচনার অর্থ যথার্থভাবে বুঝবেন ও পরবর্তীরাও খুশী হবেন এ দুইয়ের সম্মিলন-সৌভাগ্য কম লেখকেরই অদৃষ্টে ঘটে।...”

সাংবাদিক বলছেন—‘যখন আমি বসন্তকালের সূর্যালোকিত রিভিয়েরার পথ দিয়ে ফিরে আসছিলাম আমার মনে হল—আমি এখন একজন মানুষ দেখেছি, সামনে বসে কথা বলছি যিনি জানেন, যিনি প্রজ্ঞাবান।...’

কবির ইংরেজ পাঠকদের কথা আলোচনা করতে গেলে আরনেস্ট রীস ও টমসনের নাম উল্লেখ করতেই হয়। আরনেস্ট রীস কবির জীবনীকার, তিনি তাঁকে পূর্ণভাবে দেখতে পেরেছিলেন, টমসন পারেননি। এঁদের লেখা থেকে এখানে বিস্তারিত উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। কারণ উভয়ের রচনাই বই হয়ে প্রকাশিত ও সহজলভ্য।

সংগীত

নানা খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবিধ নিবন্ধে আমেরিকাবাসীদের কবির সম্বন্ধে যে অভিমত পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে এইটি লক্ষ্যযোগ্য যে তারা তাঁর শিক্ষাসংস্কৃতির ঐশ্বর্য, তাঁর বহুবিধ ও গভীর মানবমূল্যবোধ, তাঁর আপন মহত্ত্ব সম্বন্ধে মধুর অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি তাঁর কার্যিক বুদ্ধি দেখে বিস্মিত ও অভিভূত! কবির কাছ থেকে তারা কবিত্ব আশা করে, আশা করে ভাবাবেগের উন্দামতা, বড় জোর কলাবন্ততা; কিন্তু জীবনের প্রতি কার্যে কার্যকরী বুদ্ধির নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খানুসরণ, একাধারে সর্ববিধ বিষয়ে জ্ঞান ও উৎসাহের সমাবেশ তাদের বার বার বিস্মিত করেছে। একটি কাগজ লিখছে :

“পোর্টল্যান্ডে Dean Collins-এর সঙ্গে তিনি চাষ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করলেন...তিনি এমন কার্যিক (practical) ভাবে কার্যকরী বিষয়ে আলোচনা করেন যে সাধারণত পাশ্চাত্ত্য দেশে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, যে এই প্রসিদ্ধ বাঙালী গুরু এক নূতন ভাবের মরমী কবি, তাঁর চিন্তা সর্বদা ঊর্ধ্বগামী আকাশচারী, এসব ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ধরুন না কেন চাষ সম্বন্ধে তাঁর বিশদ আলোচনার কথা। আমেরিকায় যে যন্ত্রকৌশলে চাষ শুরু হয়েছে কিভাবে বাংলা দেশের উর্বর ভূমিতে তার প্রচলন করা যায় সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে তিনি বলছিলেন—‘একমাত্র কো-অপারেটিভ ফার্মিং কমিউনিটি করেই এই যান্ত্রিক ব্যবহার প্রচলন সম্ভব।’...তারপর ধরুন না কেন সংগীত সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা। হিন্দু সংগীতের যে অপূর্ব মনোহারী ব্যাখ্যা তিনি করলেন সে কি যে সে লোকের কাজ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলেও এমন করে ক'জন লোক বুঝিয়ে উঠতে পারত? কে পারত এমন করে প্রাচ্য আত্মার ধ্বনি প্রতীচ্যের আত্মায় প্রবেশ করাতে?’...যদিও কবি কখনো কখনো আমেরিকাবাসীদের কঠিন সমালোচনা করেছেন তবু তারা তাঁর কথায় ক্ষুব্ধ হবে না কারণ তারা অনুভব করেছে যে তাঁর সমস্ত সমালোচনার ভিতরে গভীর সত্যবোধ, সমবেদনা ও আমেরিকার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার প্রতি অনুরাগ আছে।”[১]

পূর্বে যে সংগীতের আলোচনার কথা আছে সেটি কোথায় ও কোন্

---

[১] *M. R.*, April, 1917.

প্রসঙ্গে হয়েছিল তা জানি না কিন্তু আমরা ১৯১৬ সালের ১২ই অক্টোবরের 'মিউজিক্যাল রিডার' কাগজে একটি সুন্দর আলোচনা পেয়েছি, তার থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করব :

"ভারতের কবি সার রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জগতের মানুষ। তিনি প্রসিদ্ধ পোলিশ সুর-সাধক Paderewski-র কনসার্ট শুনতে গিয়েছিলেন। সেই সংগীত সম্বন্ধে কবির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই কবি, যাঁর আকৃতি পুরা-কালের এব্রাহামের সোদরোপম কিন্তু যাঁর ভাষা অক্সফোর্ডের ছাত্রের মত, সেইরকম আশ্চর্য প্রাচ্য মানুষের কানে পাশ্চাত্ত্য সংগীত কেমন লাগে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

'মানতেই হবে প্রথম প্রথম তোমাদের সংগীত আমার কানে বেসুরো ঠেকত। আমি মাদাম আলবেনির (Albani) গান শুনেছি, তাতে তিনি নাইটিঙ্গেলের অনুকরণ করছিলেন, এটা প্রকৃতির এতই বহিরঙ্গ ভাবের অনুকরণ যে আমি সে গানে কোনোই আনন্দ পাইনি।'"

প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করছেন—"'তাহলে নাইটিঙ্গেলের গান হিন্দুর (অর্থাৎ ভারতীয়ের) মনে কী ভাবের প্রেরণা জাগাবে?'

'শ্রোতার আত্মায় সে গান তেমনি প্রেরণা জাগাবে যে প্রেরণায় কীট্‌স তাঁর নাইটিঙ্গেলের বন্দনা লিখেছিলেন। (অর্থাৎ কীট্‌সের ওড্‌স টু নাইটিঙ্গেল তো নাইটিঙ্গেলের সুরের অনুকরণ নয়!) বাহ্য অনুকরণ নয়, সুরধ্বনিতে উৎসারিত আনন্দ জাগাবে এক নূতন সৃষ্টির প্রেরণা—'

'কিন্তু সুরকারেরা তো ভাবাবেগের (passion) অনুকরণ করেন—দীর্ঘশ্বাস, হৃৎস্পন্দন, অনুনয় প্রার্থনা, শোকোচ্ছ্বাস—এ সমস্তরই গীতধ্বনিতে অনুকরণ হয়ে থাকে।'

'হয়। তবু এ ভাবগুলি মানবিক। নাইটিঙ্গেলের গান তো তা নয়।'

'তবু আমার মনে হয় রুবিনস্টেইনের (Rubinstein) বারকেরোলি (Barcarolle অর্থাৎ ভাটিয়ালের মত গান যা নৌকা বাইতে বাইতে গাওয়া হয়) আপনার ভালো লাগে? ওখানে তো জলের উপর দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দের অনুকরণ আছে।'

'সত্যি আমার বারকেরোলি ভালই লেগেছে, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো যে সেখানে ঐসব বহিরঙ্গ বিষয়গুলি মানুষের অনুভবের রঙে রঙীন করে নেওয়া হয়েছে—'

কবি একটু থেমে চিন্তামগ্ন হলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'আমার মনে হয় মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যে সমস্ত অভিজ্ঞতা তার চেয়ে যেসব অনুভব ধর্মভাবনার দ্বারা বিধৃত হিন্দু সংগীতে সেই ভাবেরই প্রাধান্য। আমাদের কাছে সংগীতের তাৎপর্য লোকোত্তর (transcendental); সংগীত প্রত্যহের ঘটনাবহুল জীবন থেকে আত্মাকে মুক্ত করে নেয়। মানুষের আত্মার সঙ্গে লোকাতীত আত্মার যে সম্বন্ধ আমাদের সংগীতে সেই মিলন-গানই বাজে।'"

প্রশ্নকর্তা লিখছেন, "সার রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য সংগীত সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন—তিনি পিয়ানোর সংকেত (idiom) বোঝেন এবং পাশ্চাত্ত্য সংগীতের সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্য সবই তাঁর জানা। আমি বললুম—

'বলুন, আপনাদের প্রধান সুরগুলি কি আমাদের পূর্ণ স্বারিক (diatonic) শ্রেণীর সঙ্গে এক? আপনাদের স্বরবিভাগে অর্ধস্বরেরও কম আছে জানি (২২টি শ্রুতি) কিন্তু আপনাদের সংগীতের মূল রূপ তো পূর্ণ স্বারিক?' কবি বললেন, 'হাঁ আমাদের সংগীতের প্রধান স্বরগুলি (notes) তোমাদের পূর্ণ স্বারিক রূপের সঙ্গে এক—সেইজন্যই অনেক ভারতীয় সংগীত পিয়ানোতে বাজানো চলে—তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর ভগ্নাংশ বাদ পড়ে গেলেও মোটামুটি সুরটি চেনা যায় ও ভারতীয় কানে অপ্রিয় ঠেকে না। এই প্রসঙ্গে আরো বলি, শেষ যে সুরটি পেডারউইস্কি বাজালেন সেটা তো একেবারেই ভারতীয়।'"

এই সুরটি ছিল Rakoczy March—Magyer নামক কোনো সুর-সাধকের রচনা (?)। সাংবাদিক বলছেন Magyer একজন হাঙ্গেরিবাসী জিপসি বাদক। আর জিপসিরা তো আসলে ভ্রাম্যমাণ প্রাচ্যবাসী।

এখন অবশ্য ভাষাতত্ত্ববিদরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে ইয়োরোপের জিপসিরা একদা ভারতবর্ষ থেকেই গিয়েছে কারণ তাদের ভাষার মূল কাঠামো ভাবতীয়—অতএব জিপসি গায়কের তৈরি সুর যে কবির কানে ভারতীয় ঠেকবে তা আশ্চর্য নয়—ভাষার মতই সংগীতের মূল ধ্বনিগুলি হয়ত পূর্বজীবনের চিহ্ন ধরে রেখেছে। কবি বললেন, 'কিন্তু তাই বলে সমস্ত সংগীত এক নয়, ধরুন না জাপানী সংগীত, আমার কাছে তার কোনোই মানে হয় না। আমার কানে তার ধ্বনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ঠেকে।'

এই হাঙ্গেরিয়ান জিপসি সংগীতের প্রসঙ্গে বহুদিন পরের প্রকাশিত একটি খবর আলোচ্য। Durban থেকে প্রকাশিত *Natal Advertiser* (২২।১১।৩০) নামে একটি কাগজে Radics Bela নামে একজন হাঙ্গেরিয়ান জিপসি বাদকের মৃত্যুর খবর ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছিল। সমস্ত ইয়োরোপের কাগজে ঐ সুর-রচয়িতার জীবনী ও যশ প্রচারিত হয়েছিল—ডার্বানের কাগজ কোনো একটি ইয়োরোপীয় পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করেছে :

"তিনি জিপসি সুরসাধকের রাজা—তাঁর শেষ শোভাযাত্রার সঙ্গে এক লক্ষ লোক মার্চ করে চলেছিল। বেহালা হাতে Radics এক চিরসৌন্দর্যের

প্রতীক।...যখন প্রসিদ্ধ হিন্দু মহাকবি রবীন্দ্রনাথ (১৯২৬) বুডাপেস্ট-এ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি Radics Bella-কে ডেকে পাঠান। ঠাকুর বলেছিলেন তাঁর আর কোনো ওষুধে দরকার নেই—ঐ সংগীতেই তাঁকে সুস্থ করেছিল।”

জানি না এ খবরের কতটুকু সত্য, মনে হয় না রোগের ঔষধ হিসাবে দেশপ্রসিদ্ধ গায়ক বা বাদককে ডেকে পাঠিয়ে বাজনা শোনা তাঁর পক্ষে সম্ভব—এর মধ্যে একটু যে নাটকীয়তা আছে তা খবর পরিবেশনেরই গুণে। বুডাপেস্টে কবি অসুস্থ হয়েছিলেন এ খবর সত্য, এবং হয়ত সে সময়েই Radics Bella-র বাজনা শুনেছিলেন তাও সত্য এবং সম্ভবতই তাঁর বাজনার সঞ্জীবনীসুধা ছিল তাও সত্য। যাই হোক, এই খবরটুকুর মধ্যেই আমরা বুঝতে পারি ঐ সময়ে কবির যশ, খ্যাতি কী পরিমাণ ছড়িয়ে পড়েছিল—সমস্ত ইয়োরোপে মহিমময় তাঁর সম্মানের আসন—সেই কারণেই অনাদৃত পরাধীন দেশের একজন কবি যে সেদেশের শ্রেষ্ঠ মাননীয় সুর-রচয়িতাকে বাজনা শুনতে ডেকে পাঠাচ্ছেন ডাক্তারের পরিবর্তে, এ খবর সম্পাদক অসম্ভব মনে করেন না! এই সমস্ত ছোট বড় নানা সংবাদের ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই কবির রাজোচিত সংবর্ধনা—যারা তাঁর ভাষা জানে না, সামান্য একটু অনুবাদ মাত্র পড়েছে, তাদেরও অন্তরে তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহন কী বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূর্বে জাপানী সংগীত সম্বন্ধে কবির যে উক্তি উল্লেখ করেছি ১৯২৩ সালের *Musical America*-তে আবার সে প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। অ্যালন হটন বলে এক ব্যক্তি লিখছেন :

“হিন্দু মহাকবি পূর্ব ও পশ্চিম দেশের সংগীতসাধনা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান চান। তিনি বলেন, কেন বিভিন্ন দেশ পরস্পরের শিক্ষা-সংস্কৃতির অর্থ ও ভাব বুঝতে পারবে না বা বুঝতে হলেই নিজের নিজের সংস্কৃতি বিসর্জন দিতে হবে?...নিজের নিজত্ব বজায় রেখেও যে অন্যের শিক্ষা থেকে জ্ঞান লাভ করা যায় আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ঠিক এই চেষ্টাই করছি।

“অনেক প্রাচ্য জাতির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে—জাপানীরাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে অবশ্য একটি কথা বলবার আছে, সে তাদের সংগীত সম্বন্ধে। জাপানীরা যে তাদের নিজেদের সংগীত প্রায় ত্যাগ করেছে তার কারণ তাদের এই বিশেষ শিল্পটির কোনো মহত্ত্ব নেই। এই হচ্ছে একটা চরম পরীক্ষা। যদি কোনো জিনিস যথার্থ ভালো, যথার্থ মহৎ হয়, যদি তার মধ্যে বৃহতের প্রকাশ থাকে—তা শিল্প হোক, কোনো সংস্কার বা রীতিনীতি হোক, ধর্ম হোক বা শুধু কোনো ভাব মাত্র হোক, তাহলে তা কখনোই পরিত্যাজ্য হয়

না...তা প্রবাহিত হতে থাকে নিত্য ধারায় এবং পৃথিবীর দূরতম প্রান্তেও সে আপনার অস্তিত্ব অনুভব করায়...একথা জাপানী চিত্র, জাপানী চীনামাটির পাত্র ও কারিগরী শিল্পের কারুকার্যের দক্ষতায় প্রমাণ হয়েছে...তারা পৃথিবীর সর্বত্র আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। যে দেশেরই জাপানী শিল্পের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে সে দেশেরই শিল্পে তার প্রভাব পড়েছে।” (বর্তমানে আমেরিকার গৃহসজ্জায় জাপানী গৃহসজ্জা, পুষ্পসজ্জা ইত্যাদির প্রভাব লক্ষণীয়।)

জাপানী সংগীত সম্বন্ধে জাপান থেকে দিনেন্দ্রনাথকে লেখা আর-একটি চিঠিতে কবির এই মতামতের পুনঃসমর্থন রয়েছে: “আমরা যে-দেশে এসেছি (জাপানে) এ একেবারেই গানের দেশ নয়। এরা এদের সমস্ত সুখ দুঃখ বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ছবি দিয়েই ব্যক্ত করে। এদের গান শুনেছি কিন্তু তাকে গান বলা চলে না—সুরসহযোগে আওয়াজ করা মাত্র। এদের নাচ খুবই সুন্দর কিন্তু গান যতদূর কাঁচা হতে হয়। কাজেই আমারও গানের স্ফূর্তি একেবারেই নেই। গানের সমস্ত স্মৃতি পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে যেত যদি না প্রায় মুকুলটা চীৎকার শব্দে যখন তখন যেখানে সেখানে অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং নির্দয়ভাবে আমার গান আওড়াত। এমনি দুর্ভিক্ষের দেশ যে মুকুলকেও থামিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না।”

“আমাদের ভারতীয় সংগীতের যথেষ্ট প্রচার হয়নি তার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশবাসী বিদেশীরা ঐ সংগীত বোঝবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও উৎসাহ দেখাননি। যাই হোক, ঐ সংগীত মহৎ...যখন লোকে জানবে বুঝবে তখন দিকে দিকে তার সমাদর হবে। তাই আমি চাই যে ইয়োরোপীয় সংগীতজ্ঞরা ভারতবর্ষে আসুন, এসে ভারতীয় সংগীত শিক্ষা করুন—জানি যাঁর মন রাষ্ট্রনৈতিক বা ব্যবসায়ী বৃত্তির দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট নয় এমন ঠিক উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।...তাঁকে প্রথমেই আমাদের দেশকে, দেশের মানুষকে চিনতে হবে—ভাষা শিখতে হবে—কারণ আমাদের সংগীত এত পুরাতন এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে এমনি টানাপোড়েনে বোনা যে সংগীত ও জীবন অচ্ছেদ্য। আমাদের গান আমাদের জীবনের এমনি অঙ্গ বলেই আমরা সরল স্বাভাবিক বিষয়ে গান গাই। বর্ষার গান গাই, গ্রীষ্মের গান গাই, বীজবপনের গান, শস্যকর্তনের গান—এইসব জীবনের নানা কাজের নানা ভাবের গান গাই। তাই গানের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে যে অর্থ আছে এবং যে ভাবটি সুরে প্রকাশ পাচ্ছে সংগীতের অর্থ বুঝতে হলে তা জানা চাই—শব্দার্থ ছাড়াও মর্মার্থ জানা দরকার। তোমাদের ইয়োরোপীয় গান সম্বন্ধেও একথা সত্য, আমি তোমাদের সংগীতের ব্যাকরণ জানি না তবে

তোমাদেরও কোনো কোনো কর্ড ও টোনের মিলনে যে সুর উৎপন্ন হয় তা বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগ প্রকাশ করতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে—সর্বত্রই তাই হয়; ফলে যে লোকেরা সুরের মিশ্রণরীতি বা কিভাবে সেই বিশেষ গীত-ধ্বনি উৎপন্ন ও সৃষ্ট হল তা নাও জানে তারাও তার অর্থ অনুভব করতে পারে। সমস্ত শিল্পেরই সেই চরম পরীক্ষা—শিল্পী যে ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা প্রকাশ পেয়েছে কিনা। যদি না পেয়ে থাকে তবে সে শিল্প সার্থক নয়। অবশ্য সংগীত বা যে-কোনো শিল্পই বুঝতে হলে সেই দেশের বিশেষ idiom জানা চাই...তোমাদের গান আমাদের কানে প্রথমে দুর্বোধ্য ঠেকে শুধু তার বাহ্যিক গঠনের পার্থক্যের জন্য নয়—সমগ্র সৃষ্ট-রূপটিই আমাদের থেকে পৃথক। আমাদের সুর-শিক্ষায় কণ্ঠস্বরের তালিমের পদ্ধতি তোমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—তোমাদের ও আমাদের সুর রচনায় স্বর কণ্ঠের পৃথক স্থান থেকে ওঠানো হয়। তাই প্রথমে উভয়ের কাছে উভয়ের সুরধ্বনি একেবারে অশিক্ষিত কণ্ঠের বলে মনে হয়।

"...আমি প্রায় আমার পাঁচশত গানে সুর দিয়েছি এবং তার অনেকগুলির অনুবাদে তোমাদের সুরজ্ঞরা সুর দিয়েছেন। তবে অনুবাদ তো অনুবাদই. তারা সত্যি তেমন ভালো নয়। অনুবাদে পুনর্জন্ম হতে পারে কিন্তু তা একেবারে এক হতে পারে না—কারণ শব্দের ধ্বনিরও একটি তাৎপর্য আছে, শব্দার্থের চেয়ে সে তাৎপর্য পৃথক—কবিতার মর্মকথাটি থাকে তারই মধ্যে নিহিত।...

"আবার গান সম্বন্ধেও একথা সত্য এক দেশের গানকে ঠিক অন্য দেশের গানে অনুবাদ করা যায় না—(সেই দেশের গানে পরিণত করতে হয়)... সেজন্য সেই সংগীতের idiom কিছুটা শিখতেই হবে, তাহলেই গানের সম্পূর্ণ অর্থ মর্মে প্রবেশ করবে, তাকে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে বুঝতে হবে না। পরস্পরের বিষয়ে জ্ঞান হচ্ছে শিক্ষাসম্পদের সিন্দুকের তালা খোলবার চাবি। বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে সেখানে সবকিছুই নিজের বাড়ির মত হোক এরকম আব্দার করা ভুল—যে দেশে গিয়েছ সে দেশের সব কিছুকে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা দরকার... এইভাবেই বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়—ভ্রমণ করতে হয় বিদেশী শিল্পে, বিদেশী ভাবের রাজ্যে। তখন গৃহগতপ্রাণ (homesickness) হয়ে থাকলে চলবে না, মনে মনে খালি তুলনা আর অনুবাদ চলবে না, কারণ বহির্জগতের বাসিন্দাদের মতই শিল্পজগৎবাসীদেরও প্রত্যেক মানুষকে ও তার শিল্পকে তার বিশেষ দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে।"

কবির এই আলোচনার সঙ্গে প্রসিদ্ধ গায়িকা Dame Clara Butt-এর একটি মন্তব্য তুলনীয়। এই গায়িকা একদিন ভারতবর্ষে বাসকালে রবীন্দ্র-

নাথের গান শুনেছিলেন। কবির স্বর তাঁর কাছে 'untrained' বলে বোধ হয়েছিল—তিনি গায়িকা কিন্তু সংগীত-তত্ত্বদর্শী নন—কী কারণে তাঁর কানে একজন প্রসিদ্ধ সুরকারের কণ্ঠস্বর ঐরকম মনে হতে পারে তা ভালো করে ধারণা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বহু বৎসর পূর্বেই ইয়োরোপে তার বিশদ আলোচনা করে বুঝিয়ে বলেছেন। আমাদেরও অনভ্যস্ত কানে ইয়োবোপীয় সুর-স্বর ঐরকমই লাগে।

ডেম ক্লোরা বাট তাঁর বই *From My Life of Song*-এ লিখছেন :

“আমি ভারতবর্ষে তিনজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখেছিলাম—গান্ধি, অ্যানি বেসান্ত ও ঠাকুর—শেষোক্ত ব্যক্তি আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন—আমি শুনেছিলাম যে তিনি এক সময়ে গান করতেন (!)। একদিন যখন আমার গান শুনে তিনি প্রশংসা করছিলেন তখন আমি বললাম, ‘কিন্তু আপনিও তো গায়ক, আমার আপনার গান শুনতে বড় ইচ্ছা হয়।’ তিনি সে কথা এড়িয়ে গেলেন; বললেন, তাঁর গান এমন কিছু নয়। অবশেষে আমার অনুরোধে পড়ে বললেন, ‘তোমার অপূর্ব গান শুনে আমার এত আনন্দ হয়েছে যে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব—তোমায় গান শোনাব।’ তারপর কেবল এই একটিমাত্র শ্রোতার সম্মুখে এবং কোনোরকম বাজনার সাহায্য ছাড়াই তাঁর স্বরচিত দুটি তিনটি গান তিনি গাইলেন। সেই উন্নতদেহ রাজকীয়-আকৃতি মহামান্য কবির গান শুনে আমার মন যেমন বিচলিত হয়েছিল অন্য কারো গানে তেমন আর কখনোই হয়নি। অতি অপূর্ব দরদ দিয়ে তিনি গাইলেন এবং যদিও তাঁর কণ্ঠস্বর একেবারেই ‘তালিম’-দেওয়া নয় (!) তবু তার একটি স্বাভাবিক শুভ্র মাধুর্য ছিল।” (১৯২৮)

শ্রীমতী ক্লারা বাটের রবীন্দ্রকাব্যপ্রীতি সম্বন্ধে আর একটি সংবাদ ৬ই আগস্ট ১৯২৬ সালের ‘ডেইলি ক্রনিক্যালে’ পাওয়া যায়। Dame Clara Butt in Quest of a Song—একটি সংগীতের সন্ধানে ডেম ক্লারা বাট। “কাল ক্লারা বাট লন্ডন শহরে হোর্বন রেস্তোরাঁতে ‘অবকাশকালীন’ শিক্ষা প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে দিতে বলেছিলেন, ‘তেরো বছর পূর্বে আমি ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব কবিতা পড়েছিলাম—পড়ে আমি ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলাম যেন এমন কাউকে পাই যে এই অপূর্ব বাণীকে সুরে বসিয়ে দিতে পারে। বহুদিন অপেক্ষার পর গত বছর আমি এমন একজন লোকেব সন্ধান পেয়েছি যে একাজের যোগ্য।”

যে কবিতাটির কথা ক্লারা বাট বলছিলেন সেটি হচ্ছে, ‘Where the mind is without fear’ এবং সুব-রচয়িতা, যে একমাত্র ব্যক্তিকে ক্লারা বাট-এর একাজের যোগ্য মনে হয়েছিল তিনি সেই Falix Harold—গত দশ বছরের মধ্যে ইংরেজ সুর-সাধকদের ভিতরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি

স্বশিক্ষিত ও ১৯২২ সালে কার্নেগি পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন। এই ফ্যালিক্‌স হ্যারল্ড প্রদত্ত সুরে—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' কবিতাটি গীত হয়েছিল কিনা এবং সে সুর স্বরলিপিতে বিধৃত আছে কিনা তা অনুসন্ধানযোগ্য।

ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় সংগীতের তুলনা ও সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু মননা উল্লেখ করছি। ১৯২০ সালের ২৩শে আগস্ট 'নিউইয়র্ক' কাগজের থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করব, এখানেও কবি কণ্ঠসাধনাতে দুই দেশের কি পার্থক্য তাই আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির শিরোনামা—'ইয়োরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

“আমাদের দেশে গায়কের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরের নিখুঁত নির্ভুল শিল্পবিকাশ ঘটিয়ে তোলায়, তার চরম সৌন্দর্য প্রকাশ করায়—ইয়োরোপে কণ্ঠস্বরকে বিশেষ শিক্ষায় তালিম দিয়ে তারই মারফত অসম্ভব সব কাণ্ড করতে হয়। ভারতবর্ষে সংগীতপ্রিয় শুধু গান শুনেই সন্তুষ্ট হয়, ইয়োরোপে গায়ককে শুনতে চায়—এই কথাই আমি ব্রাইটনে বলেছিলাম।... সেখানে গলার খেলা আমার মনে হচ্ছিল ঠিক যেন সার্কাসের খেলা। আমার তো প্রায় হাসিই পাচ্ছিল যখন স্বরের উত্থানপতনে গায়ক পাখির স্বরের অনুকরণ করছিলেন। পরে যখন ক্রমেই ইয়োরোপীয়ান সংগীত শুনতে লাগলাম তখন শুনতে শুনতে এর অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম, কিন্তু তবু এখনো আমার বিশ্বাস যে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় সংগীত একেবারে দুই কোঠায় থাকবেই—এবং তারা উভয়ে একই দরজা দিয়ে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। (ব্রাইটনের এই বক্তৃতা আমি খুঁজে পাইনি।—লেখক।)

“আমাদের সুর প্রাত্যহিক জীবনের সকল সীমায় ব্যাপ্ত—শুধু সেইজন্যই তারা আমাদের গভীরতম দুঃখে ও চরমতম আনন্দে পৌঁছে দিতে পারে। তাদের শ্রেষ্ঠ দান এই যে তারা মনের প্রকৃতির গভীরতম গহন রহস্যের দরজা খুলে দেয় যেখানে সাধু তার আশ্রয় পায় আর সুখ-রসিক (epicurean) পায় তার প্রমোদকুঞ্জ...কিন্তু সাংসারিক বৈষয়িকতার সেখানে কোনো স্থান নেই।...যেটুকু সামান্য আমি পাশ্চাত্ত্য সংগীত সম্বন্ধে শিখেছি তাতে আমি এর মধ্যে একটি অভাবনীয় নূতন ভাবে আকৃষ্ট হয়েছি—এই সংগীত আমার কাছে ভারি 'রোমান্টিক' বোধ হয়। (ঐ রোমান্টিক সুরে) আমার ঠিক কীরকম মনের ভাব হয় তা সহজে বোঝাতে পারছি না, আমি বলতে চাই যে এর মধ্যে এত বৈচিত্র্য এত প্রাচুর্য—এ যেন জীবনসমুদ্রের উপর অবিশ্রাম ঊর্মিমালার আলোছায়ার অনন্ত দোলা।

“...যখনই ইয়োরোপীয় সংগীত শুনে আমার মন অভিভূত হয়েছে আমার

মনে হয়েছে এ সংগীত 'রোমান্টিক', এ জীবনের অস্থৈর্যকে (instability) সংগীতে রূপ দিচ্ছে। আমাদের ভারতীয় সংগীতও যে ঐরূপ ভাব কখনো প্রকাশ করতে পারে না তা নয়, তবে তা কদাচিৎ ঘটে—আমাদের সুর মনকে উধাও করে তারাখচিত রাত্রির দিকে, প্রথম ঊষার বাণীর অভিমুখে—সে সংগীতে সকল বেদনা ভাষা পায়—ঘন মেঘের অন্ধকারে যে বেদনা আকাশ আঁধার করে ছড়িয়ে আছে সেই বাণী তারা বলে—তারা বলে বসন্ত-চঞ্চল বনানীর অপূর্ব নীরব আনন্দের বাণী।”

শুধু তত্ত্বের দিক থেকে নয়, অনুভবের দিক থেকেও ইয়োরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের এমন অপূর্ব তুলনা-বিচার ইয়োরোপীয় জনসমাজের কাছে অতি বিস্ময়কর ঠেকেছিল। বহু পত্রপত্রিকাতে নানা লোকের সঙ্গে ইয়োরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯২৪ সালের ২৪শে ডিসেম্বর 'গ্রাফিক মেলবোর্ন' নামে কাগজে আর-একটি বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে : “কবির সঙ্গে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভেই তাঁর প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক Fritz Kreislar-এর কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, 'ফ্রিট্‌স ক্রাইসলারের সংগীতের সুর? সে আমি কখনো ভুলব না। আমাকে কী গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, কী বিপুল অনুভবে চঞ্চল হয়েছিল আমার সমস্ত সত্তা ক্রাইসলারের বেহালা বাজনায়—এমনভাবে আমাকে কোনো সুর স্পর্শ করতে পারেনি।

'সত্য বলতে কি, আমার মনে হয়েছিল যেন সে সুর বস্তুজগতের সীমা থেকে উত্থিত আত্মার মহাজাগতিক ক্রন্দন। আমি জানি না প্রাত্যহিক ব্যবহারের আটপৌরে ভাষা দিয়ে কী করে আমার সেই অনুভবের সত্যকে বোঝাব, এরকম অনুভবকে ভাষা দেবার জন্য অতীন্দ্রিয় কোনো মনোলোকের ভাষা দরকার।...ক্রাইসলার ব্রহ্মাণ্ডের সংগীত বাজান...তাঁর সুরে একটি অসংশয় আত্মিক স্বীকৃতি আছে। তাঁর ভাবনা অনন্তের সুরে বাঁধা—সুরে রঙে প্রকাশিত অসীমের বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় তাঁর ধ্যানে প্রবেশ করে—জানো কি জলের মধ্যে মাছের কী শক্তি আছে? তখন সে নিজের বলে বলীয়ান। এমনকি মানুষকে তার সমস্ত বুদ্ধি, কৌশলী প্রতিভা দিয়ে যুদ্ধ করতে হয় একটা সামান্য মাছকে ধরতে—ধরলেও তাকে জল থেকে টেনে তোলাতে কম চেষ্টা লাগে না—কিন্তু একবার জলের বাইরে এলে মৎস্য সম্পূর্ণ শক্তিহীন, ক্রাইসলার তেমনি সংগীত-সমুদ্রে ডুবে আছেন—সংগীত তাঁকে অমরত্বের মধ্যে ধারণ করে আছে এবং তাঁর শিল্পের জ্যোতির্ময় সত্য তাঁকে তুচ্ছতাময় মিথ্যার জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে। সে সত্য থেকে চ্যুত হলেই মানুষের ধ্বংস—ক্রাইসলার অনন্তের মধ্যে বাস করছেন, সেইজন্যই তিনি অজেয়।”

প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক ক্রাইসলারের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল —রবীন্দ্রজীবনীতে আছে তাঁরা ১৯৩০ সালে এক জাহাজে আমেরিকা থেকে ইয়োরোপে এসেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের পরস্পরের কোনো আলোচনার খবর বা বৃত্তান্ত কোথাও সংরক্ষিত নেই। এই সময়ে আমেরিকান পণ্ডিত উইল ডুরান্টের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘ আলোচনার উল্লেখ আছে। খবরের কাগজে বিধৃত অল্পস্বল্প উদ্ধৃতি ছাড়া সযত্নে রক্ষণীয় এ সমস্ত আলোচনার কোনো বিবরণই নেই। খবরের কাগজ ছাঁট-কাট করে বৃত্তান্তকে সারমর্মে পরিণত করে, ফলে তার সারই নষ্ট হয়ে যায়। কবির রসোদ্বেল উত্তর-প্রত্যুত্তর কৌতুকরঙীন ভাবচ্ছটার সংক্ষিপ্ত made easy সংস্করণে যা পাওয়া যায় তা সরস্বতীকে 'বব' করাবার মতই। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে শিক্ষিত সেক্রেটারি ও সঙ্গী দুচারজন থাকতেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভ্রমণের সুখ-সৌভাগ্য কেবলমাত্র দিনগত ভোগের আনন্দেই খরচ করে ফেলেছেন—ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেননি। দুঃখের বিষয় এই যে এ কার্য পরে করণীয় নয়—তাঁদের মধ্যে এখন যাঁরা জীবিতও আছেন তাঁরা ভেবে ভেবে এ কাজ করতে গেলে এখন আর পারবেন না। অনেকের মধ্যে বর্তমানে সে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে এবং বিশ-ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বের তাঁর মুখের কথাকে কোটেশন মার্কে উদ্ধৃত করে লেখবার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এতে সত্য-মিথ্যা একাকার হয়ে সত্যসন্ধানী জীবনীকারের দৃষ্টি আবিল করে দেবে। দু-একটা তথ্য যদি পাওয়াও যায় তবু তা সত্য হবে না। সেই স্বর্ণঝংকৃত বাণীর বিকৃত রূপ কোটেশনে ধরবার আজ আর কারু অধিকার নেই—যা তখন রাখলে সম্পদ হতে পারত এখন তা হবে বিপদ—তাই কবির ঘনিষ্ঠ পরিচিত শত্রুমিত্র সকলকেই বলি—'একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত, সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত'।

সংগীত সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে, বলা বাহুল্য তা সকল শিল্প সম্বন্ধেই সত্য। আগ্রহী ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে অপরিচিত সুরের রাজ্যে শিল্পের রাজ্যে প্রবেশ করা চাই। এবং অজানাকে জানবার এই উন্মুখতাতেই দূর নিকট বন্ধু হয়েছে তাঁর জীবনে।

সুরধ্বনিকে সংগীত-অনুভবে গ্রহণ করবার জন্য যেমন কানকে তৈরি করা প্রয়োজন তেমনি বিশেষ টেক্‌নিকের ছবি দেখবার জন্য চোখেব শিক্ষা চাই —অপরিচয়ের বাধা আমাদের নয়নমন ও শ্রবণের উপব আবরণ সৃষ্টি করে। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরাগের সঙ্গে অপবিচিত দেশের অজ্ঞাত শিল্পের দিকে মনোনিবেশ—সে সময়ে কদাচিৎ ঘটত। বিশেষ যদি রাষ্ট্রীয় বা বর্ণ-বৈষম্য হেতু কোনো জাতির প্রতি অবজ্ঞা থাকে তবে তার শিল্পকারুও অনাদৃত হয়। অহংকারের প্রাচীর মনের যে কারাগার তৈরি করে বন্দী

তাতে বাস করে খুশী মনে। সংগীত প্রসঙ্গে তাই কবির এনড্রুজ সাহেবকে লেখা একখানি চিঠি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। ১৯২১ সালে আমেরিকা থেকে কবি চিঠিখানি লিখছেন :

"সেদিন আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ শিল্পজ্ঞের বাড়ি গিয়েছিলাম। তিনি ইটালীয় চিত্রকলার অনুরাগী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা, তিনি তৎক্ষণাৎ রূঢ়ভাবে বললেন যে সম্ভবত যদি তিনি সেসব ছবি দেখেনও তবে তাঁর ঘৃণা হবে। আমার সন্দেহ হয় তিনি হয়ত ভারতীয় ছবির কিছু কিছু দেখেছেন এবং ঘৃণাও করেছেন—এর প্রতিশোধ নিতে হলে হয়ত পাশ্চাত্ত্য শিল্প সম্বন্ধে ঐ ভাষাতেই আমিও কিছু মন্তব্য করতে পারতাম। কিন্তু বলতে আমার গর্ব হয় যে আমাব পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কারণ আমি সর্বদাই পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলা বুঝতেই চাই, ঘৃণা করতে কখনোই চাই না। মানুষের যে কোনো সৃষ্টিতে আমরা আনন্দের সন্ধান পাই, তা তখনই আমাদের আপন হয়ে যায়। অবিমিশ্র আনন্দে বলতে পারি যেখানেই মানুষের গৌরব সেই তো আমার গৌরব (যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞ যাগ আমি তার লভিয়াছি ভাগ।...যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে, স্থান মোর সেই ইতিহাসে). তাই তো আমার মনে গভীর আঘাত লাগে যখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে প্রত্যাহার করবার জন্য উচ্চরব শুনি. শুনি যে তা শুধু আমাদের ক্ষতিই করছে। একথা সত্য হতে পারে না...পশ্চিম প্রাচ্যকে ভুল জেনেছে—কিন্তু প্রাচ্য যদি সেই কারণেই পাশ্চাত্ত্যকে ভুল জানে তাহলেই কি সেটা সংশোধন হবে? বর্তমান যুগ পশ্চিমের শক্তিতে অভিভূত—এটা সম্ভব হয়েছে কারণ মানবমনের মহৎ কোনো উদ্দেশ্য সে সাধন করছে। আমাদের তার কাছে যা কিছু শিক্ষণীয় তা শিখতে আসতেই হবে—তাতেই এ যুগের পূর্ণতা লাভ ঘটবে। আমরা জানি প্রাচ্যেরও কিছু দেয় আছে—তার আপন দায়িত্ব আছে আপন দীপটি জ্বালিয়ে রাখবাব। এমন দিন আসবে যখন পাশ্চাত্ত্য জগতের অবকাশ হবে স্মরণ করবার যে এই প্রাচ্য তারও দেশ যেখানে পথ্য আছে—নীড় আছে।"

রোমাঁ রোলাঁর ডায়রিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংগীত সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন-বৃত্তান্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন 'বাক' তাঁর বেশী প্রিয় ও তার গতি অন্তর্মুখী মনে হয়। রোমাঁ রোলাঁ এতে বিস্মিত হন। তাঁর মনে হয় 'বাক' ভালোলাগা অতি কঠিন।

যাহোক, পাশ্চাত্ত্য সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ও রোমাঁ রোলাঁর মতের অনৈক্য আছে। এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা ঐ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন।

বিশ্বভারতীর মূল উদ্দেশ্য সংস্কৃতির আদানপ্রদান, তারই সূত্র ধরে বহু জ্ঞানী গুণী শিল্পী ভারতবর্ষে আসতে লাগলেন। পরাধীন দেশের একজন কবির পক্ষে এ যে কত বড় কীর্তি তা দেশের সেই অবস্থার কথা না জানলে আমরা ঠিকমত বুঝতে পারব না। এখনকার যুগের অবিরত কালচারাল ডেলিগেশনের যে হিড়িক চলেছে তার সঙ্গে এর তুলনা চলবে না।

ভারতীয় সংগীতে যে কয়েকজন ইয়োরোপীয় পারদর্শী হয়েছিলেন তার মধ্যে ডাক্তার আর্নল্ড বাকে অন্যতম। বিশ্বভারতীর নিমন্ত্রণে কয়েক বৎসর শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিলেন। ইন্ডিয়া সোসাইটিতে তিনি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে যে সুন্দর বক্তৃতাটি দেন স্থানাভাবে এখানে সেটির অনুবাদ দেওয়া হল না, কিন্তু সেটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের একটি ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, অন্তত একজন ইয়োরোপীয় সংগীতজ্ঞ ভারতীয় সংগীতেও পারদর্শী হয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত বাকে এক জায়গায় বলছেন: "ভারতীয় সংগীতের মুক্তি আছে লোকসংগীতের প্রাচুর্যে।...এবং রবীন্দ্র-গীতি-কলায়ও তার প্রভাব গভীর।...ভারতীয় সংগীতে বহুমিল (harmony) নাই, এ শুধুই সুরপ্রধান। পশ্চিমেও সেই একই ভিত্তি থেকে শুরু করে বহুমিলের বিরাট রীতিপদ্ধতি গড়ে উঠেছে—ভারতবর্ষ সেই পুরানো সূত্র থেকেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে সংগীতকে নিপুণ ও পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে—ভারতীয় সংগীত ইয়োরোপীয় কানে রোমান ক্যাথলিক স্তবপাঠের ধ্বনির মত শোনায়—একদিন সকালে আমি আপন মনে বাউল সুরের একটি গান ভাঁজছিলাম এমন সময় আমার সঙ্গী বন্ধু বলে উঠলেন—এ কি, তুমি কি রোমান ক্যাথলিক হয়েছ?...ভারতীয়দের রীতি-পদ্ধতি বা কঠিন নিয়মবন্ধন সৃষ্টি করার দিকে ঝোঁক আছে (সামাজিক আচারপরায়ণতায় তার চরম নিদর্শন—(লেখক); সেইজন্য সংগীতেরও কঠিন নিয়মাবদ্ধ রীতি হয়েছে। রাগরাগিণীকে বলা হয় কালওয়াতী গান (কলাবন্ত থেকে উদ্ভূত শব্দ, ইংরেজিতে শ্রীযুক্ত বাকে বলেছেন 'Art Music')। ঐ সংগীত রাজসভায় সযত্নে বর্ধিত হয়ে এর চরম গৌরবের দিনে অপূর্ব সৌকর্য নিশ্চয় প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আজ তাদের সুদিন গেছে।... রবীন্দ্রনাথ সুর-রচয়িতা হিসাবে বাঙালী জীবনের চূড়ান্ত পরিণতির প্রকাশ। বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগে তাঁর মধ্যে বাঙালী হিসাবে দেশ-সীমায় যা সুপ্ত ছিল তা পূর্ণ প্রকাশিত জাগ্রত হয়েছে। একথা লক্ষণীয় যে তাঁর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সংগীত, কালওয়াতী সংগীত ও লোকসংগীত এই তিন ধারাই প্রবেশ করেছে। লোকসংগীতের মধ্যে অন্য দুটি ধারা ধীরে ধীরে বিস্রুত, দ্রব ও জীর্ণ হয়ে এক হয়ে গিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের জন্ম হয়েছে।"

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় কবি তাঁর অনূদিত গানে বিলাতী সুর সংযোগের কথা উল্লেখ করেছেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকে ঐসব ইংরেজিতে অনূদিত কবিতা বিলাতী সুরে নানা স্থানে গীত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করেছি—এখানে কয়েকটি উল্লেখ করলাম। Marguerite Espir নামে কোন ব্যক্তি গার্ডনারের অনেকগুলি গানে সুর সংযোগ করেছিলেন, ১৯২৬ সালের ৪ঠা মে তার কিছু কিছু লন্ডনে বাজানো হয়েছিল। Jessie M. M. Lennan ও প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী Dorothy Doria Grey 'Fruit Gathering'-এর কয়েকটি কবিতা গান করেছিলেন। Lord Leverhalm-এর বাগানে খোলা মঞ্চে The Farewell Curse (কচ ও দেবযানী) ২০।১০।২১ তারিখে অভিনীত হয়। ঐ অনুবাদটি তখনও প্রকাশিত হয়নি। Trial by Luck বা লক্ষ্মীর পরীক্ষাও এখানেই অভিনীত হয়। চিত্রা নাটক ১৯১৬ থেকে বহুবার অভিনীত হয়েছে। ৩০শে জুলাই ১৯২৪ সালে কচ ও দেবযানী, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, সতী, গান্ধারীর আবেদন এই চারটি নাটিকার ইংরেজি অনুবাদের অভিনয় হয়। ১৫ই জানুয়ারি ১৯১৫ সালে 'নিউইয়র্ক কুরিয়ারে' রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতায় সুর দিয়ে অরকেস্ট্রায় বাজাবার খবর আছে। ১৯১৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর *Daily News*-এ একটি সংবাদ আছে—"রবীন্দ্রনাথের সুন্দর ভাষায় Eric Fogg সুর দিয়েছেন।" ১৯২৯ সালের *Sunday Times, London*-এর B. B. C. Concert সম্বন্ধে একটি খবরে বলছে—"শ্রীযুক্ত এরিক ফগ্ এর—পার্বত্য সানু (hill side)—এই ম্যানচেস্টারবাসী ২৬ বৎসর বয়স্ক সুর-রচয়িতা যুবক কবি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় সুর বসিয়েছেন, সেইটি তিনি ঐ নামে সেদিন বাজিয়েছিলেন।" ১৯১৭ সালে জাপান ও আমেরিকাতে Miss du Pont নামে কোনো মহিলা রবীন্দ্রকবিতার নাচে ব্যাখ্যা করেছিলেন—সে নৃত্যের সঙ্গে কোনো বাজনার সংযোগ ছিল না। জাপানী Noh রীতি অনুসারে ঐ বেলজিয়ান নারী চিত্রা নাটক ও অন্যান্য অনেক কবিতার নৃত্যরূপ দিয়েছিলেন। একটি জাপানী কাগজে এই শিল্পে তাঁর নিপুণতা এবং এই শিল্প শিক্ষার জন্য ধৈর্য ও চেষ্টার প্রশংসা করে লিখেছিল। Noh পুরাকালীন জাপানী নাচ, বিশেষ করে রাজসভার জন্যই নির্দিষ্ট এই 'Imperial dance' পৌরাণিক কাহিনী নৃত্য স্তবপাঠ ও অভিনয় সংযোগে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হত।

পুরানো খবরের কাগজে রবীন্দ্রকাব্যে বিলাতী সুর সংযোগের বহুল সংবাদ পাওয়া যায়, এ ছাড়াও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খবর এখানে রবীন্দ্রজীবনে আগ্রহীদের জন্য উল্লেখ করছি—১৯৩০ সালে Potsdam-এর কাছে

একটি স্থানে হিমাংশু রায়-এর সঙ্গে কবি সিনেমা ছবি তোলার কৌশল দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর সিনেমা ছবি তোলা হয়। ঐ ছবি কোথায় আছে এবং ঠিকভাবে রক্ষিত কি না এবং ভারতবর্ষে কখনো দেখানো হয়েছিল কি না তা কেউই জানে না।

Ruth St. Denis নামে প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীও আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য করে বহুজনকে চমৎকৃত করেছিলেন। বাংলায় কবিতা আবৃত্তিও কয়েকটি ইয়োরোপীয় মহিলা শিখেছিলেন। বহুকাল পরে ১৯৫৩ সালে লন্ডনে লিলি ফ্রয়েড নামে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। ১৯২১ সালে কবির ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় তিনি তাঁর কাছে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে শিখেছিলেন এবং কোথাও কোথাও তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে কোথাও বা যন্ত্রসংগীতের সহযোগে আবৃত্তি করতেন। তিনি যে বাংলায় কবিতা আবৃত্তি করতেন এ সংবাদটি বিশ্বাস করব কিনা ভাবছি—এমন সময় সেই শুভ্রকেশা স্মিতমুখী নারী সভায় দাঁড়িয়ে ত্রিশ বৎসর পরে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' আগাগোড়া প্রায় নির্ভুল উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘ দ্রুতবিলম্বিত স্বরযোগে আবৃত্তি করে আমাদের চমৎকৃত করে দিলেন।

সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে নানা কথা এসে পড়ল। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে ইয়োরোপীয় সংগীতের পার্থক্য সত্ত্বেও ক্রাইসলারের বেহালা বাজনা কবির মনে যে গভীর আবেগ উদ্বেলিত করেছিল তেমনি হয়েছিল তার বহু বর্ষ পূর্বে জার্মান দার্শনিক কাউন্ট কাইসারলিং-এর। কাউন্ট কাইসারলিং ১৯১১ সালে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ভারতীয় সংগীত শুনেছিলেন, তাঁর *Travel Diary of a Philosopher* গ্রন্থে তিনি সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের উল্লেখ করে রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখছেন যে এঁর পূর্বে কোনো ইয়োরোপীয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখেননি। সে সময়ে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের যশ খ্যাতি প্রকাশিত হয়নি, রবীন্দ্রকাব্যের কতটুকু অনুবাদ হয়েছিল জানি না, কিন্তু ঐ ডায়েরিতে ঠাকুরদের সম্বন্ধে শেষ মন্তব্যের লাইনটিতে মনে হয় কাইসারলিং তাঁর কিছু কবিতার অনুবাদ শুনে থাকবেন, কিন্তু অত অল্প শুনেই এমন গভীর বোধনা বিস্ময়কর। এর দশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জার্মানিতে তাঁর গভীর সখ্য হয়।

"ঠাকুরদের প্রাচীন প্রাসাদে রোমের কার্পেটের উপব সুরসাধকেরা বসে অদৃষ্টপূর্ব বাদ্যযন্ত্রে তাঁদের পৌরাণিক জগতের সংগীত বাজাচ্ছিলেন, যে সংগীতকে শুধু তানের সীমার মধ্যে ধরা যায় না। কোনো বিশেষ বহুমিলেরও (harmony) তাতে সংযোগ নেই—এমনকি পৃথক টোনগুলিও

পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট নয়, তবুও প্রত্যেক অংশের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে একটি ঐক্য—যেমন ঐক্য থাকে আত্মিক অবস্থায়, যে ঐক্য অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না আত্মা অবস্থান্তরে প্রবেশ করে।”

এরপর কাইসারলিং রাগ-রাগিণীর দৃশ্যরূপ, সময়-নিরূপণ ও সুর-বিন্যাসের রীতিতে অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার বোধ ইত্যাদির সঙ্গে ইয়োরোপীয় সংগীতের কলা-কৌশলের সুদীর্ঘ তুলনামূলক সমালোচনা করে শেষাংশে বলছেন :

“সে এক স্মরণীয় রাত্রি। ঠাকুরদের দীর্ঘ বিলম্বিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত দেহ. সুকুমার ভাবময় মুখচ্ছবি, নানা-চিত্র-শোভিত সেই সুউচ্চ সভাগৃহে অতি শোভন মনে হয়েছিল। সেই পরিবারের চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে দেখে আমার মনে হল, পুরাকালে আলেকজেন্দ্রিয়ার যাঁরা সম্পদ ছিলেন তিনি যেন তাঁদেরই একজন। কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখে মনে হল তিনি যেন আধ্যাত্মিক জগতের এক উচ্চতর লোক থেকে আগত অতিথি। ইতিপূর্বে একজন মানুষের মধ্যে এতখানি আত্মিক ভাবের একত্র ঘনীভূত রূপ দেখিনি..এখন একসঙ্গে এক দৃষ্টিতে আমি ভারতীয় সংগীত, ভারতীয় প্রজ্ঞা ও ভারতীয় জীবন দেখতে পেলাম। এই সংগীত আমাদের সঙ্গে তুলনায় একঘেয়ে, অনেক সময় সুদীর্ঘ গীতলহরী ছোট সুরসীমানায় আবদ্ধ (embrace a small range of tone), কখনো বা একটিমাত্র সুরের (single note) মাধ্যমে সমগ্র ভাবকে প্রকাশ করছে। এই সংগীতের বিশেষত্ব আছে অন্যত্র, সে শুদ্ধ গভীরত্বের অভিমুখে সংপ্রবিষ্ট। যেমন ভারতীয় দর্শনও একঘেয়ে. তারা কেবলি ‘এক’-এর কথা বলে, যে একের দ্বিতীয় নেই—একমেবাদ্বিতীয়ম্—যার মধ্যে পরমাত্মা, জীবাত্মা ও বিশ্বপ্রকৃতি এক সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট। সেই এক সর্বব্যাপী, সকল বৈচিত্র্যের যা মর্মগত সার। ভারতীয় দর্শনও শুদ্ধ গভীরত্বের নির্দেশ করে—নির্দেশ করে বাহ্যজীবনের অন্তর্নিহিত পরম সত্যের প্রতি—যার থেকে আপাতদৃশ্য বস্তুরূপ উৎসারিত।...অন্য কোনো দেশের দর্শনশাস্ত্র একের মহিমা এমন পরিষ্কারভাবে অনুভব করেনি—ভারতীয়রা এইভাবে সার ও সত্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি বলেই বহিঃপ্রকাশকে মায়া বলে অগ্রাহ্য করেছে...এই কারণে ভারতীয় ব্যক্তিত্বেও বিস্তৃতি কম, প্রসারতা কম, গভীরতা বেশী, বিশেষত পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায়। ক্ষতিপূরণ স্বরূপে গভীরতার তরঙ্গে, গূঢ়তার অভিমুখে এ এমনি বিচিত্র যে অন্য কোথাও তার তুল্য নেই।

“এ যুগে যত গীতিকবিতা যত দেশে লেখা হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য গভীর নিগূঢ় ভাবের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় যেমন ঐশ্বর্যময় এমন আর কোথাও নেই।”

"একটা জিনিস চীনা ও জাপানী আর্টিস্টদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি যে তারা ফাঁক রাখতে ভয় পায় না। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে তাদের ছবিতে আমাদের মনে অনন্ত বিস্তৃতির বোধ জাগাতে চায়—একটুখানি পাহাড়ের আভাস দিয়ে কিংবা পাইনগাছের চূড়ার একটি রেখায় এরা যেন তর্জনী নির্দেশ করে সেই দিকে যা দৃষ্টিগোচর নয় অথচ অনুভবযোগ্য। তাদের ছবিতে বাঁকা ডালের একটা আঁচড় কিংবা উড়ন্ত পাখির ডানার দুটো রেখা সেই বিরাটের সঙ্গে সংঘর্ষ তোলে—তারই প্রত্যুত্তরে বিপুল নিঃশব্দ ক্রন্দনে জাগে বিস্তৃতির অনুভব।...

"গতবার যখন জাপানে ছিলাম আমি একটা অভিনয় দেখেছিলাম এবং সেখানে আমি দেখেছিলাম এই একই ভাব কাজ করছে—যখন প্রধান নায়ক তার অভিনয় করছে অন্যরা একেবারে স্থির নিশ্চুপ, যেন তারা চিত্রিত, নির্বাক, অচল. অভিনেতা তাই তখন তার চারিদিকে নিঃশব্দ ও নীরবতার বিস্তৃত পরিধি পেয়েছে। ইয়োরোপীয় স্টেজে প্রত্যেক অভিনেতাই কিছু না কিছু করছে। তারা চঞ্চল। কিন্তু প্রাচীন মতের জাপানী রঙ্গমঞ্চে জীবনকে দেখা যায়, দেখা যায় তার প্রকাশের তীব্রতা, কিন্তু সেটি ফুটে ওঠে অসীম নৈঃশব্দ্যের পটভূমিতে। পাশ্চাত্ত্য দেশ তার সমস্ত খোলা জায়গায় শহরের ভিড় করেছে। তার ফ্যাক্টরি, হোটেল, চিমনি আর গগনস্পর্শী অট্টালিকার মধ্যে একটু ফাঁক কোথাও রাখেনি..তারা অনন্ত বিস্তারের ভাষাকে চুন বালি ইট আর বিজ্ঞাপনের উচ্চরবে বস্তুবাহুল্যে রুদ্ধ করে দিচ্ছে।"[১]

বাংলা চিত্রাঙ্গদা ১৮৯৩ সালে কবির ৩০ বছর বয়সে রচিত, তার দীর্ঘদিন পর ১৯১০ সালে ঐ কাব্যনাটিকা চিত্রা নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। 'চিত্রা' নাট্যের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের নাটকীয়তা নেই। নাটকের উপযুক্ত বিচিত্র ঘটনাসংঘাতবর্জিত এই কাব্য নিরলংকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। সেই প্রসঙ্গে জাপানী কৌলিক রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কবির অভিমতের উল্লেখ করা গেল। সে সময়ে সব দেশেই রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র-দৃশ্য-আঁকা পট ঝুলিয়ে নাটকের স্থান-কালকে বাস্তব করে তোলবার চেষ্টা হত। কবি নিজেও নানা স্থানে জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে স্টেজ সাজাবার বর্ণনা করেছেন—রঙ্গমঞ্চের উপর ডালপালা এবং গোটা গাছ এনে শেওলা লাগিয়ে

---

[১] Spoken at Kyoto Girls College, *M R.*, May 1925.

অরণ্য করে ফেলা হত। খুব স্পষ্ট করে স্থানমাহাত্ম্যটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই।

রঙ্গমঞ্চের এই সজ্জাবাহুল্য কবি ক্রমেই বর্জন করেছিলেন—জানি না কোথায় কেমনভাবে তার শুরু হয়েছিল। আমরা শুনেছিলাম 'যাত্রার' আবেষ্টন তাঁর ভালো লাগত। একেবারে দর্শকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে অভিনয়। পাহাড় জঙ্গল নদ নদী সমস্তই স্টেজে উপস্থিত করার চেয়ে, দর্শকের অনুভবে ইঙ্গিতে সেই ভাব মিশ্রিত করা ভালো। এ সম্বন্ধে জাপানে তিনি একটি অভিনয় দেখেছিলেন, সে কথা প্রায়ই বলতেন—"নাটকের পাত্রপাত্রী দর্শকদের মধ্য দিয়েই হেঁটে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভিনয় শুরু করলে অনেকটা আমাদের যাত্রার মত।" সাজসজ্জা ও ভঙ্গীতে সে অভিনয়ের নিপুণ কলা তিনি ভুলতে পারেননি। অনেকবার গান্ধারীর আবেদন ঐভাবে অভিনয় করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ইয়োরোপেও আজকাল অনেক স্থলেই রঙ্গমঞ্চে পটসজ্জার বাহুল্য নেই। 'স্ট্রাট্‌ফোর্ড আপঅন অ্যাভনে' শেকস্‌পীয়রের নাটকে নায়িকাকে একই পোশাকে একই দৃশ্যপটের সামনে সবগুলি দৃশ্যে অভিনয় করতে দেখেছি। স্টেজের মাঝখানে আছে গাছের গুঁড়ির আকৃতির একটা পদার্থ—সেটা কখনো রাজসিংহাসনের কখনো অরণ্যের বনস্পতির আভাস দিচ্ছে। রঙ্গসজ্জা ওদেশে কবে থেকে এমন বাহুল্যবর্জিত হয়েছে তা জানি না। কিন্তু চিত্রা নাটক যখন অভিনীত হল তখন পাশ্চাত্ত্য জগৎ বিস্মিত হয়েছিল। একে তো নাটকে নাটকীয়তা সামান্যই, তারপর রূপসজ্জাও নিরলংকার। চিত্রা নাটকের অনেক সুন্দর সমালোচনা ইংল্যন্ডের নানা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।

"কবি চিত্রাকে বলেছেন 'নাট্যকাব্য' কিন্তু যারা বিশ্বাস করে যে অনুভবের তীব্রতাই নাটকীয় তারা জানে যে এ রচনায় নাটকের রস আছে। অবশ্য আমাদের আধুনিক রঙ্গমঞ্চে এ বই একেবারে অচল হয়ে যাবে—আলাপ-আলোচনার কথোপকথনের ঠোকাঠুকি নেই—কেউ অভিনয়ই করছে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো কলকাতার সিনেমার নাটকীয় জাঁকজমকের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য এ বই লেখেননি!...আমরা শুনেছি চিত্রা নাট্যকাব্য ভারতবর্ষে কোনো মঞ্চসজ্জা ছাড়াই অভিনীত হয়েছে, চারিদিকে ঘিরে বসে আছে দর্শকেরা।"[১]

ইংল্যন্ডেও সেন্ট জেমস থিয়েটারে ইউনিয়ন অফ দি ঈস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট পরিষদের উদ্যোগে ঐরকম নিরাভরণভাবেই এই বইয়ের অভিনয় হয়।—

---

[১] *The Daily News*, 3. 3. 1914.

"হিন্দু প্রোডাকশন যেভাবে হয়েছে যতদূর সম্ভব সেইভাবেই এই নাটক অভিনয় করে একবার দেখলে ভালো হয়।"...

জানি না চিত্রার এই নিরলংকার রঙ্গমঞ্চ ইয়োরোপে কোনো প্রভাব ফেলেছিল কিনা, অবশ্য বোঝা যাচ্ছে যে তখন এটি ছিল অদৃষ্টপূর্ব।

শুধু চিত্রার অভিনয় নয়, চিত্রার বক্তব্যও তৎকালীন ইয়োরোপকে চমৎকৃত করেছিল। একজন লিখছেন—"চিত্রা ও রাজার মধ্যে অনেক গভীর চিন্তার বীজ মুক্তার মালার মত গ্রথিত হয়ে আছে।" কেউবা বললে—"এই গল্পের তত্ত্ববাণী আশ্চর্য শক্তির সঙ্গে প্রকাশিত—আর এ বাণী সম্পূর্ণ আধুনিক. অত্যন্ত আধুনিক। স্ত্রী-পুরুষের বাসনা-কামনাকে সখ্যে সাম্যে পবিত্র করতে চাওয়া—এ বই যে প্রায় পঁচিশ বছর আগে বাংলায় লেখা হয়েছে একথা আশ্চর্য বইকি!"[১]

নাটকীয় ভঙ্গী ও বাহুল্য-বর্জিত অতি সরল ভাষায় লেখা এই কাব্যের বাণীতে যে যুগবাণী উচ্চারিত তা সেই দেশের থেকে এসেছে যে দেশে নারী শিক্ষাবর্জিতা অবগুণ্ঠনাবৃতা. শিশুবিবাহে লাঞ্ছিতা। এ ঘটনা অবশ্য বিস্ময়কর বোধ হয়েছিল।

"যদি ভারতবর্ষে তাঁকে (কবিকে) জয়মাল্য নাও দিত তবু তিন মহাদেশের নারীরা নিশ্চয় দেবে। তিনি পণ্ডিত জ্ঞানী, যাঁর কথা পুরুষ বুঝতে পারে কিন্তু তিনি দ্রষ্টা যাঁকে সব নারীই কৃতজ্ঞতা জানাবে।"[২]

আমেরিকাতেও চিত্রা কাব্য বিস্ময় জাগিয়েছিল. সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহও। অনেকের মনে হয়েছিল হয়ত নারী আন্দোলন-এর প্রপাগ্যান্ডা করে টাকা রোজগারই এর উদ্দেশ্য। ডলার-পূজারীদের একথা লক্ষ্য হয়নি যে এ বই যেদেশে যখন রচিত হয়েছিল সেখানে সাফ্রেজেট্‌স্‌ আন্দোলনের কোনো কথাই ছিল না। তাই যখন আমেরিকান সাংবাদিকরা তাঁকে কোণঠাসা করে প্রশ্ন করতে শুরু করে তখন বাধ্য হয়ে বলেছিলেন :

"তোমাদের স্ত্রী-পুরুষের লড়াই, নারীবিদ্রোহ. কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে মেয়েদের অসন্তোষের ফলে হচ্ছে না। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যেই রয়েছে গলদ। তোমাদের এই Organization mania এর মূলে—তারই জন্য পুরুষ ঘরছাড়া হচ্ছে, আর ঘোর বস্তুতান্ত্রিকতার জন্য পরিবারবন্ধন শিথিল হচ্ছে। তোমাদের মেয়েদের সুখ নেই!"

কোনো কাগজে লিখল—যে সব সাফ্রেজেট্‌স্‌ কবিকে তাঁর প্রসিদ্ধ চিত্রা

---

[১] *Yorkshire Observer*, May 29, 1914.

[২] *The Pall Mall Gazette*, May 14, 1912.

নাটকের জন্য তাঁকে নিজেদের দলে পেয়েছে ভেবে বসেছিল তাদের এ ধাক্কাটা বেশ লাগবে। তিনি বলেছেন, "না, আমি এই নারী আন্দোলনের কথা রাষ্ট্র হবার বহু বছর পূর্বে চিত্রা লিখেছি। আমি এ বই প্রপাগ্যান্ডার জন্য লিখিনি—এ শুধুই একটা নাটক মাত্র।"

প্রশ্নকর্তাদের প্রশ্ন তবু থামে না—

"প্রপাগ্যান্ডা নাটক কি আপনি পছন্দ করেন না?"

"তোমাদের আমেরিকানদের ঐ তো দোষ—ঐ জন্যই তো তোমরা যথার্থ আর্ট-এর অর্থ বুঝতে পার না। তোমরা প্রত্যেক ব্যাপারে, শিল্পে, সাহিত্যে খুঁজে বেড়াও তোমাদের সামাজিক পরিণতির কী উদ্দেশ্য সাধন হবার কথা তাদের মধ্যে আছে। তার কারণ তোমাদের পরিণতির এখনো অপরিণত অবস্থা!...(বলা বাহুল্য আজ অনেক দেশেই, এমনকি আমেরিকার উলটো পিঠেও ঐ দশা!) চিত্রাতে নারী আন্দোলনের সমর্থন আছে কিনা তাতে কী এসে যায়? সাহিত্য বলে কবিতা বলেই একে গ্রহণ কর না কেন? নাই বা হল প্রপাগ্যান্ডা!"

কিন্তু যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ম্যাডাম আল্লা নাজিমোভা (Alla Nazimova) নামে এক মহিলা চিত্রার নাট্যাভিনয়ের উদ্‌যোগ করলে একটি কাগজ ক্রুদ্ধ হয়ে লিখল :

"ইনি (কবি) আমাদের আর্থিক বিষয় ছেড়ে পারমার্থিকে মন দিতে বলছেন! কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে এ পর্যন্ত যত ব্যবসায়ী এদেশে এসেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে চতুর ব্যবসায়ী ব্যক্তি হচ্ছেন চিত্রা নাটকের লেখক।" কারণ ঐ কাগজের বিশ্বাস চিত্রা বা চিত্রাঙ্গদা সাফ্রেজেট্‌স্‌ প্রপাগ্যান্ডা। ১৯২১ সালে আমেরিকা-প্রবাসী সুরেন্দ্র নারায়ণ একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকান অভিনেত্রীকে চিত্রা সাজিয়ে Gamut Club Theatre-এ অভিনয় করেছিলেন। সেখানে অবশ্য অরণ্য দৃশ্যের বর্ণনা আছে—"অরণ্য দৃশ্যে যবনিকা উঠল। প্রাচ্য প্রভাতের ঐশ্বর্য প্রতি পাতায় ফুলে ঝলমল করছে। হার্প, ভাওলিন ও বাঁশির সংগীত বনমর্মরের মত দূর থেকে ভেসে এল। বাদকেরা স্টেজের আড়ালে ছিল, তাই সেই অদৃশ্য সংগীতে প্রতীক-নাট্যের মায়া সৃষ্টি করেছিল।" ঐ অভিনয় সম্বন্ধে Los Angeles-এর *Evening Express* লিখছে : "নাটক মন্থরগতিতে (slow tempo) চলেছে, এর আকর্ষণ নির্ভর করছে কাব্যময় বাক্যে, ঘটনার প্রাবল্যে নয়—"

বোঝা যাচ্ছে এই অভিনয়ে স্টেজের উপর গোটা অরণ্য নিশ্চয় উপস্থিত ছিল।

১৯১৬ সালে *Drama* কাগজে কবি ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের আধিক্য

না থাকায় তা ইয়োরোপীয় রঙ্গমঞ্চের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে কল্পনার অবকাশ আছে, ইয়োরোপীয় রঙ্গমঞ্চ অতিমাত্রায় বাস্তব।...

"ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চের বর্ণনা আছে কিন্তু সেখানে দৃশ্যপটের বর্ণনা নেই।...দৃশ্যপটের অভাবে কোনো ক্ষতি হয় না। যদিও Wagner শিল্পের মিলনের কথা বলেছেন তবু তর্ক তোলা যায় যে, যে কোনো একটি শিল্পের মহিমা তখনই প্রকাশ পায় যখন সে থাকে একেশ্বরী। তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় যদি সতীনের সঙ্গে সংসার ভাগ করে নিতে হয়, বিশেষ সতীন যদি সেই সময়ে সুয়োরানীর পদ পেয়ে থাকে। যদি আমরা কোনো একটি মহাকাব্য গান গেয়ে শোনাতে চাই—তাহলে সে গানের সুরধ্বনি স্তবপাঠের মতই হবে, সংগীতের মত সুদূরব্যাপী অসীম বিস্তার তার হতে পারে না। সত্যকারের কবিতায় তার নিজের সুরটি নিজের ভিতর থেকেই উৎসারিত হয়, বাইরে থেকে সাহায্য সে প্রত্যাখ্যান করে। একথা বলা যেতে পারে যে নাট্যশিল্প অন্যান্য শিল্পের মত স্বাধীন হতে পারে না। কারণ নাটকের উদ্দেশ্যই বাহিরের সাহায্যে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা—তাই অভিনয়, দৃশ্য, সংগীত ও মঞ্চের ও আরো অনেক আনুষঙ্গিক প্রয়োজন থাকে। আমার এ মত নয়। সতী স্ত্রী যেমন স্বামী ভিন্ন আর কাউকে চায় না, সত্য কবিতা—তা সে নাটকই হোক বা অন্য কিছুই হোক—শুধু মনের গোচর হতে চায়, আর কিছু নয়। আমরা যখন একটা নাটক পড়ি তখন মনে মনে আমরা তার অভিনয় করে চলি—এবং যে নাটক এ রকম অদৃশ্য অভিনয়ে মনের মধ্যে রূপ নিয়ে উঠতে পারে না সেরকম নাটক তার লেখকের জন্য বিজয়মাল্য আনতে পারবে না।

"অভিনয়ের প্রসঙ্গে বলা যায় যে যতক্ষণ না তার সৌন্দর্যবিকাশ পূর্ণ হয় অভিনেতাকে একাকীই চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যে নাটক অভিনেতার দক্ষতা ও ক্ষমতার মাপে নিজেকে খাটো করে ছেঁটেকেটে তৈরি করতে চায় সে স্ত্রৈণ স্বামীর মত বিদ্রূপের পাত্র হয়ে পড়ে। নাটকের ভাবটি এই হওয়া উচিত যে 'যদি ভাল করে আমার অভিনয় হয় তো ভালই নইলে অভিনয়টাই গেল!'

"একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে অভিনেতা নাটকের ভাষার উপর নির্ভর করে—লেখক তার মুখে যে ভাষা জুগিয়েছে তাই দিয়েই তাকে কাঁদতে হয় হাসতে হয় ও তার দর্শকদেরও সেই সঙ্গে হাসতে কাঁদতে হয়। কিন্তু পট কেন? যে ছবিগুলি অভিনেতার চারপাশে ঝুলতে থাকে সেগুলির সামান্য অংশও তার নিজের সৃষ্টি নয়। আমার মনে হয় অভিনেতার পক্ষে ঐসবের সাহায্য খোঁজা শুধু দুর্বলতারই লক্ষণ। ছবির মোহ দিয়ে দায়িত্ব কমিয়ে যেটুকু আরাম পাওয়া যায় সে তো চিত্রকরের কাছ থেকে ভিক্ষা করে

নেওয়া। তাছাড়া এতে দর্শকদেরও ভারি ছোট করা হয়, তাদের প্রতি কল্পনাশক্তির দৈন্য আরোপ করা হয়। ভারতবর্ষে আমরা আজকাল যেসব রঙ্গমঞ্চ পশ্চিমের অনুকরণে ভারাক্রান্ত করে তুলেছি তা থাকবে জনসাধারণের অনধিগম্য। সেই সব রঙ্গমঞ্চে কবি ও অভিনেতার সৃষ্টির ঐশ্বর্য ধনিকের অর্থসম্পদের দ্বারা পরাভূত। যদি ভারতীয় দর্শক অতিরিক্ত বাস্তবতার লোভে আক্রান্ত না হয়, যদি ভারতীয় শিল্পীর নিজের শিল্পকৌশলের উপর আস্থা থাকে, তাহলে তাদের সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ নিজেদের মুক্তি পুনরর্জন করা। যেসব দামী অথচ জড় আবর্জনা বর্তমানের রঙ্গমঞ্চকে ঠেসে ফেলেছে সেসব ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা।"

১৯১৫ সালে ইংল্যান্ডের একটি কাগজে কবির একটি বক্তৃতা থেকে থিয়েটার সম্বন্ধে মত উদ্ধৃত করেছে :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪ঠা জানুআরি Lincoln-এ বক্তৃতা করবেন। তাঁর মতে আধুনিক থিয়েটারে সাহিত্যেরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত, দৃশ্যের নয়। তিনি বলছিলেন ভারতবর্ষে তাঁর নিজের রচিত নাটক অভিনয়ের সময় দৃশ্যপটের বদলে পিছনে একটি নীল কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়। এবং তার ফলে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঠিকমত মনোভাব প্রকাশ পায়, বাজে জিনিসের চাপে পড়ে সৌন্দর্য নষ্ট হয় না।

বিদেশে অভিনয়ের প্রসঙ্গে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কবির মতামত কিছু আলোচনা করা গেল—কারণ বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশে নিরলংকার রঙ্গমঞ্চ বহুল প্রচলিত হয়েছে. জানি না এর মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন প্রভাব কতটা আছে। শুধু এইটুকু জানা যাচ্ছে যে যখন চিত্রা অভিনীত হয় তখন এবং ১৯১৬ সালে কবি যখন এ প্রবন্ধ লেখেন তখন ওদেশে রঙ্গমঞ্চে রূপসজ্জা প্রবল ছিল।

উপাধি-প্রসঙ্গ

কবির মন চিরদিনই ব্যুপাধিক! ডিগ্রী-পদবী-উপাধি-লাঞ্ছিত হতে কোনো দিনই তাঁর উৎসাহ নেই। কিন্তু ভাগ্যক্রমে উপাধিকে কেন্দ্র করেই একটা মস্ত বড় ঘটনা ঘটে গেল তাঁর জীবনে। সার উপাধি ত্যাগ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিশেষত শ্রীযুক্ত অমল হোমের 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সবিশেষ ও সঠিক আলোচনা আছে, তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখানে সে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের বিবরণ দেব না, শুধু তার ফলে দেশে বিদেশে তাঁর প্রতি যে নানা বিচিত্র মনোভাব দেখা দিয়েছে তাই আমাদের আলোচ্য। 'সার' উপাধি ত্যাগ করায় যে দেশব্যাপী আলোড়ন হয়েছিল তা শুধু উপাধি ত্যাগের জন্যই নয়। সেই সঙ্গে যে অপূর্ব চিঠিখানি তিনি বড়লাটকে লিখেছিলেন, গাম্ভীর্যে সৌন্দর্যে গভীর ন্যায়নিষ্ঠায় কবিচিত্তের অনুভব সে রচনায় অপূর্ব সাহিত্যের রূপ নিয়েছিল। সে সময়ে ঐ চিঠি লেখার দায় অনেক ছিল, কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড যা কিছু হতে পারত! যা হোক, ক্রোধে দণ্ডপাণির হাত থেকে দণ্ড স্খলিত হয়ে গেল। তারা স্থির করলে অবজ্ঞা দেখানোই শ্রেয়। ইংরেজি কাগজে মন্তব্য করে বুঝিয়ে দিল যে একজন বাবু নাইট হল কি বাবুই রইল, তাতে তাদের সিকি পয়সা এসে যায় না। আর দেশীয় কাগজে কেউ কেউ মন্তব্য করলেন যে উপাধি ত্যাগ ভালো হয়েছে বটে কিন্তু উপাধি না নিলেই হত। নাইট হবার প্রয়োজন কী ছিল, 'আমরা তখনই বলিয়াছিলাম' ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সময়ে তদানীন্তন বিদেশী সরকারের বিচারে অবিচারে, ন্যায়ে অন্যায়ে, সদাজাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে কবির উদ্যত সত্তা উন্নত মস্তকে দেশের মাঝখানে রয়েছে স্থির—'রাজাপ্রজা' লেখা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হয়ে গেছে, কবিকণ্ঠ থেকে তেজোদৃপ্ত নানা বাণী হয়েছে সুরে ছন্দে উত্তাল—'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে; মোদের বাঁধন টুটবে। ওদের আঁখি যত রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে।' কিংবা যখন গাইছেন পথে পথে, রাখী হস্তে, 'শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরো, আমাদের সহায় ভগবান,' তখন সেই পরজাতিপীড়নরত সরকারের হাত থেকে তিনি কেন নিলেন এ রাজসম্মান এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আমরা রবীন্দ্রজীবনীগ্রন্থে বা কবির কোনো চিঠিপত্রে বা তাঁর জীবিতকালে মৌখিক আলোচনায় জানতে পারিনি। কোথাও উল্লেখ থাকলেও লক্ষ্য হয়নি। তবে এটুকু অনুমান করা যায় যে কোনো বিষয়েই লোকদেখানো বা নাটকীয় কোনো কাজ করায় তাঁর রুচি ছিল না। এই খেতাব প্রদানের

মধ্যে যেটুকু স্বীকৃতি ছিল সেটুকু সহৃদয়ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন, ঘটা করে প্রত্যাখ্যান করবার প্রয়োজনই হয়নি। কারণ সে বিষয়ে তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। তখন নাইটহুডের চেয়ে অনেক বড় পুরস্কার নোবেল প্রাইজ তিনি পেয়েছেন। কাজেই সার উপাধি তখন তাঁকে অলংকৃত করার চেয়ে উপাধি-প্রদানকারীদেরই সম্মানিত করেছিল। যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েও লোকখ্যাতির ভয় পেয়েছিলেন যে, এবার গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হল আর এতটুকু গোপনে থাকবার উপায় থাকবে না। ...এবং লোকের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, They honour the honour in me...তাঁর পক্ষে এই নূতন সরকারী খেতাব-চিহ্ন কতটা আরামপ্রদ হয়েছিল তা সন্দেহ। এবং সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও বিশ্বস্বীকৃতি পূর্বাহ্ণেই পেয়ে গেছেন বলে রাজদত্ত এই পুরস্কারের কোনো সার্থকতা তাঁর বন্ধু-বান্ধব এমনকি জনতার কাছেও ছিল না—যেখানে "পরিচয় লাগি নাম মাগে উপাধির সীমা, যেথা মহিমার চেয়ে মানে লোকে চিহ্নের গরিমা"—

১৯১৬ সালে কালিফোর্নিয়ার একটি কাগজ লিখছে—"ছয় ফুট দীর্ঘ বাহুল্য-বর্জিতদেহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধিভূষিত কিন্তু তিনি সোজাসুজি মিস্টার সম্বোধনই পছন্দ করেন। তাঁর দেহসৌন্দর্যের কী বিপুল মহিমা কিন্তু প্রধানত তাঁর আচরণের অসাধারণত্বই তাঁর আকৃতিকে বিশেষত্ব দিয়েছে...যেন তিনি সাধারণ সব কিছু থেকেই পৃথক, তবুও বলি এ জীবনকে তিনি কোনো উচ্চ মঞ্চ থেকে দেখছেন না, দেখছেন দূর থেকে।

"লোকে বিস্মিত মনে ভাবে 'সার' উপাধি পেয়ে সরকারের অনুগ্রহ পেয়েও সে অনুগ্রহ তো তিনি গ্রাহ্য করেন না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সমালোচনা ও বৃটিশ সরকারের সমালোচনা কিছুই তাঁর আটকায় না।

"ঠাকুর সুবিধার জন্য কিছুই করেন না। রাজা জর্জ তাঁকে নাইট খেতাব দিয়েছেন তাই তিনি সার রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সেজন্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করতে তাঁর কোনোই বাধা হয় না। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির কাছ থেকে প্রশংসা পাবার লোভে এ সভ্যতার দোষত্রুটি সম্বন্ধেও নীরব থাকেন না।" আর একটি কাগজ লিখছে—"তিনি এতই অসাধারণ যে তাঁর একটি বিশদ বর্ণনা দিচ্ছি। প্রথমেই বলছি রাজা জর্জ তাঁকে নাইট করেছেন কিন্তু তবু তিনি চান তাঁকে যেন সোজাসুজি মিস্টার বলেই সম্বোধন করা হয় .."[১]

---

[১] *Boston Mass Post,* Dec., 1916.

এর থেকে বোঝা যায় যে ঐ উপাধি-লাঞ্ছনা কোনো দিনই তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করেনি। বস্তুত কোনো সম্মানই তাঁকে এমনভাবে আক্রমণ করতে পারেনি যাতে তাঁর মনকে করতে পারে ভারাক্রান্ত : “যশের বোঝা তুলিয়া লয়ে কাঁধে নামটা মোর মরে মরুক ঘুরে। মনটা মোর যেন অপ্রমাদে শান্ত হয়ে রহে অনেক দূরে।” এই তাঁর চিরদিনের ইচ্ছা। মাঝে মাঝে ঐ কাঁধের বোঝাটা যখন অতিশয় দুর্বহ ঠেকেছে তখন কাতরে বলেছেন : এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও। বিদেশে সকলেই অবশ্য লাভালাভে উদাসীন যোগযুক্ত চিত্তের মুক্ত ভাব বুঝতে পারেনি এবং সরকারী অনুগ্রহ লাভ করেও ভারতীয়দের এই ঔদ্ধত্য ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেনি। একটি কাগজ লিখছে :

“ভারতীয়দের শিক্ষা তাদের নিজস্বভাবে হতে দেওয়া উচিত, ইত্যাদি নানা যুক্তির ছদ্ম আবরণে রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেই মনকে নিয়ে যাচ্ছেন। ধিক্ ধিক্ রবীন্দ্রনাথ! তুমি আমাদের কাছে কবিতা পড় কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে কিছু বোলো না, তাহলে সাধু নোবেল তার কবরে নড়ে উঠবে।”[১]

বিদেশে শিক্ষাসভ্যতার নিম্নস্তরের লোকদের কাছে থেকে এরকম নিন্দাবাদ অসহনীয় নয়। বস্তুত এই লেখা পড়লেই বোঝা যায় যে লেখকের ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান পরিমিত। কিন্তু এই উপাধি প্রসঙ্গে স্বদেশে কবিকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তা যেমনি অহেতুক তেমনি তা আজও আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ও বেদনাদায়ক। এ দেশের সমাজে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে যাঁরা ছিলেন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মনিষ্ঠায় যাঁরা আমাদের বরেণ্য তাঁদের কাছ থেকেও রবীন্দ্রনাথকে কেন অদ্ভুত কঠিন আঘাত নিতান্ত অকারণে পেতে হয়েছিল তা আজও বুঝতে পারি না। অজ্ঞ বলে তাঁদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন কথা অনেক শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন তাঁর সময়ের পূর্বে, এদেশ তাঁর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাঁর কথা বোঝবার মত তখন দেশের অবস্থা নয়। কিন্তু এ কথা কত দূর সত্য তা জানি না। যুগ তৈরি হয়নি বললে যুগের সেই অগণ্য মানবকেই বোঝায় যারা জনসাধারণ,—সেইখানেই ব্যাপক অশিক্ষায়, মূঢ়তায়, আচ্ছন্ন-চেতনা মানবসম্প্রদায় এক-এক দেশে এক-এক রকম অবস্থার স্তর সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু যাঁরা বিশেষ মানুষ, জ্ঞানী মনীষী, শিক্ষায় মর্যাদায় বুদ্ধিতে দীপ্ত তাঁদের জন্য তো যুগের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই রবীন্দ্রনাথের ভাবনা

---

[১] *Town & Country*, Dec., 1916.

যতই সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় হোক না কেন সেই অযোগ্য জনসাধারণের কাছ থেকেই তিনি পেয়েছেন ভক্তি-ভালোবাসার অর্ঘ, গ্রামের প্রান্তে দূরতম কুটীরে ভ্রমাত্মক বানানে বালিকা তাঁর উদ্দেশ্যে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছে কবিতা রচনা। সামান্য কেরানী মাখন সরকার বৈষ্ণব-জনোচিত নম্রতায় করেছেন তাঁর হৃদয়মথিত অপূর্ব ভক্তি নিবেদন। দেশে বিদেশে অসংখ্য সাধারণ লোকে পরম আনন্দে তাঁর জয়যাত্রায় দিয়েছে যোগ—ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছে তাঁহার পথের ধূলার 'পরে—। কিন্তু এদেশে যাঁরা জ্ঞানীগুণী, যুগের অগ্রগণ্য তাঁদের কাছ থেকে বারে বারে এসেছে কী অপ্রত্যাশিত আঘাত!

১৯১৭ সালের মে মাসের 'মডার্ন রিভিউ'তে সম্পাদক লিখছেন: "শ্রীযুক্ত সি আর দাশ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স-এর সভাপতির অভিভাষণে সার রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে বহু বক্রোক্তি করেছেন।...তার সবগুলিরই উত্তর দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এমনকি তার কোনো একটিও আমাদের কাছে লক্ষ্যযোগ্য হত না যদি না শ্রীযুক্ত দাশ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্স-এর সভাপতির পদ থেকে এগুলি উচ্চারণ করতেন।...তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা তিনি সম্পূর্ণ পড়েননি, তার আংশিক উদ্ধৃতি কাগজে পড়েছেন, জানি না আমেরিকায় প্রদত্ত কোন্ বক্তৃতাটি তাঁর লক্ষ্য? সম্ভবত তিনি "Cult of Nationalism" নিবন্ধটির কথাই বলে থাকবেন। তিনি আরো স্বীকার করেছেন য়ে সম্পূর্ণ ভাষণটি পড়েননি বলেই হয়ত তাঁর ভুল ধারণা হয়ে থাকতেও পারে কিন্তু তথাপি তিনি কবির প্রতি হীন কটাক্ষ, বক্রোক্তি করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি।...শ্রীযুক্ত দাশ বলতে চান যে নাইট উপাধি রবীন্দ্রনাথকে এত নীচ করে ফেলেছে যে সার রবীন্দ্রনাথ আর তেমন দেশপ্রেমিক নন, নিরুপাধিক রবীন্দ্রনাথ যেমনটি ছিলেন। যাঁরা কবিকে জানেন, এবং তাঁর অতীতের ও বর্তমানের রচনা পড়েছেন, বক্তৃতা শুনেছেন তাঁদের কাছে এই উদ্ভট বক্রোক্তি অতি অদ্ভুত বলেই বোধ হবে।"...

আজ বেয়াল্লিশ বছর পরে এ ইতিহাস পড়তে গেলে ঐ বক্রোক্তি শুধু যে অদ্ভুত ঠেকে তা নয়, মনস্তত্ত্বের যে ক্রূরতম অধ্যায়কে খুলে দেয় তা অপ্রত্যাশিত। ন্যাশনালিজম গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পশ্চিমে ন্যাশনালিজম-এর যে কোনো দু ছত্র পড়লেই জানা যায় ঐ লেখায় ইংরেজের সাধুবাদ আছে কিনা। সম্পূর্ণ বিপরীত হীন অভিযোগ একবার মাত্র বইয়ের পাতাটি না উলটিয়ে মান্যগণ্য লোকেরা করে বসছেন। শুধু গণ্যমান্য নয়, যাঁরা কবির নিতান্ত প্রিয়। এইসব কত অগণ্য আঘাতে রক্তাক্ত করেছে সেই

সুকুমার সূক্ষ্ম মনের ভাবনার স্বর্ণজাল। সরকারের দেওয়া দণ্ডের চেয়েও প্রিয়জনের মুখে উচ্চারিত এমন নৃশংস শেল প্রাণদণ্ডের মত পড়েছে সেই স্নেহকোমল মনে। কিন্তু কী অসাধারণ শক্তিই ছিল তাঁর পেলব দেহকান্তির মধ্যে। যার জন্য দুঃখ পেতেন কিন্তু দুঃখবাদী হতেন না, যতই কণ্টকাকীর্ণ হোক পথ, 'রক্তমাখা হোক চরণতল' তবু নিশ্চয় জানতেন—
"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।"

শ্রীযুক্ত দাশের বক্রোক্তির উত্তরে প্রবাসী-সম্পাদক ১৯১৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে প্রকাশিত সুধীন্দ্র বসুর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। সুধীন্দ্র বসু লিখছেন : "বেশ বোঝা যায় তিনি নাইট বা ডাক্তার উপাধি ইত্যাদি সামান্যই গ্রাহ্য করেন। সত্যি বলতে কি, এগুলি তাঁর কাছে কৌতুকাবহ! তিনি বেশী গোলমাল পছন্দ করেন না বলে আমি তাঁর নিজের ঘরেই খাবার দিয়ে যেতে বলেছিলাম। যাতে তাঁকে সাধারণের ভোজগৃহে না যেতে হয়। হোটেলের কর্তৃপক্ষ তিনি অসুস্থ হয়েছেন মনে করে খবর নিতে পাঠাল। ডাঃ ঠাকুর তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বললেন, "ওদের বলে দাও সেজন্য যেন চিন্তা না করে।" তারপর আমার দিকে কটাক্ষে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা তো দুজন ডাক্তার এখানে আছি। আমরা তাহলে কোন্ কাজে লাগব, ডাক্তার বোস, যদি রুগীর সেবাই না করতে পারি!"

বিস্ময়ের কথা এই যে ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাবার অব্যবহিত পরে স্কট্ল্যান্ডের একটি কাগজ তাঁর কবিতার নোবেল প্রাইজ লাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে "মিস্টার ঠাকুর" বলে উল্লেখ করে চলেছে, কিন্তু কিছু পরে নিজেরাই লিখছে : "প্রাচ্য সাহিত্যের ছাত্ররা হয়ত "মিস্টার ঠাকুরের" রচনা পড়ে তেমন কিছু বিস্মিত হবেন না...আমরা মিস্টার উপাধি ছেড়েই দিচ্ছি কারণ এটা ভারি অসমঞ্জস শোনাচ্ছে।" ..তারপর থেকে শুধু 'টেগোর' বলেই উল্লেখ করে চলেছে কিন্তু কবি ইয়েট্স-এর প্রসঙ্গে মিস্টার বলতে কোনো অসামঞ্জস্য বোধ করেনি। "মিস্টার ইয়েটসের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কথার উদ্ধৃতি আছে, তিনি তাঁর কাব্যকে সুরে বেঁধেছেন এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে দিয়েছেন—যাতে তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে 'পথিক পথে গাইতে গাইতে যায়, মাঝি গুন-গুন করে নৌকা বাইতে পারে।' এই কথাটির মধ্যে কী মাধুর্য আছে, মনের উপর কী যথার্থ কবিত্বময় প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে একটি ছবি ভেসে ওঠে—সেই দেশের যেখানে বংশপরম্পরাক্রমে মানুষের প্রবাহ ঘটনা-প্রাবল্যহীন সহজ শান্ত জীবনে আপন আপন কাজে নিযুক্ত আছে।"[১]

---

[১] *Aberden Free Press*, 17 Nov. 1913.

১৯২৫ সালে 'চরকা' বা 'Cult of Charka' নামে কবির যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে চরকাকে ধর্মের অঙ্গ বা হিন্দুর সহস্র সংস্কারের মত আর একটি করে তোলার প্রতিবাদ ছিল। মহাত্মাজী তার উত্তরে ইয়ং ইন্ডিয়া (৫ই নভেম্বর ১৯২৪) কাগজে "কবি ও চরকা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'সার' বলে উল্লেখ করেন। 'মডার্ন রিভিউ' লিখছে,—"মহাত্মাজি কবির নামের পূর্বে 'সার' উপাধি যোগ করেছেন। তিনি অনেকবার বলেছেন ও লিখেছেন যে তিনি কাগজ পড়েন না, তাই হয়ত তাঁর জানা নেই যে কবি ঐ উপাধি অনেকদিন ত্যাগ করেছেন...ইত্যাদি... (Dec., 1925)

জানি না এই কারণে পুনরায় উপাধি প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো তর্ক উঠেছিল কিনা। ১৯২৬ সালের ফেব্রুআরি মাসে কবি কাগজে তাঁর একটি অভিমত পাঠিয়েছেন :

"আমার নাইটহুড পরিত্যাগ প্রসঙ্গে আবার আলোচনা হচ্ছে জেনে আমি মনে করছি জনসাধারণের কাছে আমার মত খুলে বলা উচিত। এ তো বোঝাই যায় যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা ও অত্যাচারের প্রতি যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধিক্কার দেবার জন্যই আমি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে চিঠি লিখে ঐ খেতাব ফিরিয়ে নিতে বলেছিলাম। আমি যদি ঐ উপাধির যথার্থ মূল্য না জানতাম তবে আমার কণ্ঠস্বরে শক্তি জোগাবার জন্যই যখন তা প্রত্যাখ্যান করার দরকার হল, তখন ত্যাগ হিসাবে এ কাজ করা আমার শুধু ঔদ্ধত্য প্রকাশ হত, সত্য হত না। আমার এত অহংকার নেই যে সাহিত্যিক কাজের জন্য আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল, অভদ্রতা করে তার প্রতি কপট ঘৃণার ভাব দেখাব। আমি জনসমক্ষে এমন কোনো কাজই করতে চাই না যাতে এতটুকু নাটকীয়তা ঘটে কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে আমাকে দায়ে পড়েই তা করতে হয়েছে যখন কিছুতেই কোনো রাষ্ট্রনেতাকে দিয়ে পাঞ্জাবে যে ঘটনা ঘটছিল তার উপযুক্ত প্রতিবাদ করাতে পারলাম না।...এই প্রসঙ্গে আমি স্বীকার করি আমার একটি নিজস্ব বিশেষ খেয়াল (idiosyncrasy) আছে যে আমি আমার নামের সঙ্গে কিছুই যোগ করতে ভালোবাসি না—বাবু, শ্রীযুক্ত, সার, ডাক্তার, মিস্টার যাই হোক না কেন—আর এস্কোয়ার তো নয়ই! সাইকোঅ্যানালিস্ট হয়ত সন্ধান করলে এ স্বভাবের গভীরে নিহিত কোনো অহংকারের ভাব খুঁজে পাবেন—আর হয়ত তা নেহাত মিথ্যাও হবে না।"

এই প্রসঙ্গে বলা যায় আরো কয়েক বছর পরে তিনি যথার্থই নামের পূর্বে শ্রী যোগ করা ছাড়লেন। আমরা তখন ভেবেছিলাম সে হয়ত বিনয়বশত, কিন্তু এই লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে তার বিপরীত!

আরো অনেক বছর পরে ১৯৩০ সালে যখন তিনি মংপুতে সুরেল ভবনে অতিথি, গৃহকর্তা ডাক্তার সেন একদিন ডাকের চিঠিপত্র এনে কবির হাতে দিলেন। কবি খামগুলির উপর চোখ বুলিয়ে কয়েকটি ফেরত দিয়ে বললেন—"এগুলো আমার নয়, Mr. R. N. Tagore-এর—আমি হচ্ছি শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর রথী—Mr. R. N. Tagore.

জার্মানি

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ইয়োরোপ ভ্রমণে অন্তরের তাগিদে বেরিয়েছিলেন, তখন ভারতের স্বাধীনতাকামী বলে মিত্রশক্তির কাছে বিরোধিতা পাওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কবির স্বাদেশিকতা যদিও কোনো উগ্র জাতীয়তা নয়, শুধু সত্য ন্যায় ও ধর্মের সমর্থন তবুও ইংল্যান্ডের সুধীসমাজেও অনেকেই তাঁর উপাধিত্যাগের কথা ভুলতে পারেনি। রবীন্দ্রজীবনীতে আমরা জানতে পারি এই বিমুখতা কবির মনকেও করেছিল বিমুখ, কিন্তু তা স্থায়ী নয়। বন্ধুত্বের, সখ্যের, আনন্দের সত্য সর্বদাই তাঁর কাছে বিরোধের চেয়ে বড় হয়ে উঠত। যখন যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় দেশে ঘৃণা ও বিদ্বেষের দক্ষযজ্ঞ চলেছে তার মধ্যে কবির নির্ভয়ে ঘোষিত সত্যবাণী যেসব চিত্তকে স্পর্শ করেছে—যে যে উর্বরা ভূমিতে তাঁর "জীবনের মাল্য হতে খসা" বীজ উড়ে পড়ে উদ্গত অঙ্কুরে নব প্রাণের নব ভাবের সূচনা করেছে, সংখ্যা দিয়ে তার মূল্য নির্ধারণ হবে না। এরই কিছুকাল পর থেকে ইয়েট্স প্রভৃতি বিরূপ হয়েছিলেন; সেই বিরূপতার কথা পরে 'সংযোজন' অংশে আলোচনা করা যাবে।

১৯২০ থেকে ১৯২১ সাল। দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলেছে উত্তেজনায় উদ্দাম হয়ে। কবি কিন্তু বিদেশে গেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের সহযোগিতার কথাই বলতে। এই সময় তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"আমি বারবার বলছি আমি কবি, যোদ্ধৃস্বভাব নয়। আমি মানুষকে ভালোবাসি, মানুষের ভালোবাসা আমাব কাছে পরম মূল্যবান। তবুও আমি বিরুদ্ধ স্রোতেই আমার খেয়া বাইতে নেমেছি। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস যে সমুদ্রের এপারে বসে আমি পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতি-সহযোগের কথা প্রচার করব যে-মুহূর্তে সমুদ্রের ওপারে অসহযোগ নীতির প্রচার চলেছে...তুমি জানো আমি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় আস্থা রাখি না, যেমন আমি মনে করি না যে দেহই মানুষের চরম সত্য। কিন্তু দেহের ধ্বংসেও আমার বিশ্বাস নেই এবং জীবনে পার্থিব পদার্থের যে প্রয়োজন আছে তাকে অবজ্ঞা করাও চলে না—তাও আমি জানি। মানুষের দৈহিক ও আত্মিক প্রকৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে, ভিত্তি ও সৌধের ঐক্য বিধান করা প্রয়োজন। আমি পূর্ব ও পশ্চিমের যথার্থ মিলনে বিশ্বাস করি। প্রেমই আত্মার শাশ্বত সত্য, এবং আমাদের যতদূর সাধ্য চেষ্টা করা দরকার যাতে সে সত্যের সঙ্গে বিরোধিতা না ঘটে। দুর্গম পথের সমস্ত বাধার বিপক্ষে

আমাদের সেই প্রেমের নিশান ওড়াতে হবে, অসহযোগের আদর্শ সেই সত্যকে ব্যাহত করে—এ আমাদের গৃহদীপ নয়, এ সেই আগুন যা গৃহ দগ্ধ করে।”

বলাবাহুল্য সে সময়ে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটি কথাও লোকের ভালো লাগতে পারে না। সমস্ত দেশ যখন প্রবল বিরোধের উত্তেজনায় পূর্ণ তখন প্রেমের কথা উপহাস্য। এদিকে ভারত সরকারের বিরোধিতা করে সম্রাটকে অবহেলা করে উপাধিত্যাগে ইংল্যান্ডের সুধীসমাজও কবির প্রতি সদয় নয়। রবার্ট ব্রিজেসের মত কবির মনেও এই ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হবার জোর নেই। ক্ষুরধার দুর্গম পথে রবীন্দ্রনাথ চলেছেন আপন বিশ্বাসের আলোকবর্তিকা নিয়ে। সুবিধা সুযোগ নিন্দা প্রশংসা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এই যে প্রেমপূর্ণ সত্যবাণী সর্বদেশের সর্বকালের মানবের অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল, বহু মানুষ নিজের জীবনে ও মননে তা নিশ্চয় গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এইরকম একজন শান্তধী ব্যক্তি লিখেছেন :

“যখন জগৎব্যাপী যুদ্ধ চলেছে তখন যত শান্ত ও মৃদুই হোক, এই একটিমাত্র স্বর অশ্রান্তভাবে শান্তির বাণী গুঞ্জন করে চলেছে। চীৎকার ও কোলাহলের মধ্যেও শোনা যাচ্ছে একজন ভারতীয় ধীর সমবোধে সখ্য ও ধৈর্যের বাণী বলে চলেছেন—যেন সেইটাই এ বিশ্বের স্বাভাবিক ঘটনা, এই সর্বধ্বংসী দ্বন্দ্বটি নয়। এইবকম মনোভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নীরবে দেশে দেশে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যাত্রা করে চলেছেন, তাঁর বিশ্বজনের বিদ্যালয়ের কল্পনা ব্যক্ত করে। যেখানেই তিনি গিয়েছেন মানুষ মানুষকে যে নরকে নামিয়ে এনেছে সেই নরকের মধ্যে হঠাৎ দেবদূত এসে পড়লে যেমন হয় তিনি তেমনি অভ্যর্থনা পেয়েছেন। রাজদ্রোহের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বলে সন্দেহকারী সরকারী চরের দ্বারা পশ্চাৎ-অনুসৃত হয়ে, সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হয়ে, কখনো বা অসম্ভব কল্পনাবিলাসী বলে অবজ্ঞাত হয়েও তিনি সেই বহুমর্দিত দুঃখময় আত্মিক পথে চলেছেন। কিন্তু তিনি যাই হোন, ইয়োরোপ-আমেরিকায় সেই একটিমাত্র স্বর শান্তির বাণী অশ্রান্তভাবে গুঞ্জন করে চলেছে এবং বিশ্বজনের বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সেই শান্তির অভিমুখে একটি ছোট পথ পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে।”[১]

এই উক্তির মধ্যে তাঁর অভ্যর্থনার যে বর্ণনা রয়েছে সত্যই দেবদূতের আবির্ভাবের মতই তা বিস্ময়কর। তাঁর জ্যোতির্ময় স্বরূপ কী গভীর ভক্তি

---

[১] *Modern Review.*

ইয়োরোপের চিত্তে মথিত করে তুলেছে সে সময়কার দু-একটি রচনা পড়লেই তা কতকটা অনুমান করা যায়। যদিও রাজকীয় সংবর্ধনার কথা আভাসে অনেকেই শুনেছেন কিন্তু মানুষের মনোজগতে যে আনন্দের সমারোহ অভ্যর্থনায় অভিনন্দনে সহস্র সহস্র লোকের সমবেত উল্লাসে, কখনো নীরব নত শ্রদ্ধায় পরাধীন জাতির কবির প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নেই। এতাবৎ কিছুই ছিল না, সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'স্মৃতিচিত্রে' কিছু উল্লেখ আছে। এ ছাড়া কয়েকটি বুলেটিন আছে বটে—কিন্তু পূর্বে যা বলেছি, তালিকাতে তথ্য থাকে, সত্য সেখানে পাওয়া যায় না। বিস্মিত ইয়োরোপের অন্তরমথিত আনন্দধ্বনি সেখানে কোথায়? কবি তাঁর শেষ রোগশয্যা থেকে একটি পত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন :

"...অতএব একদিন কোনো মহালগ্নে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই যে মিলন ঘটেছিল তার ইতিহাস বা বিবরণ অকথিত থেকে গেল।"[১]

আজ সেই অকথিত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার একরকম অসম্ভব। সন-তারিখ মিলিয়ে কবে কোথায় গিয়েছিলেন ও কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তা হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু সেই অভাবনীয় উদ্বেলিত আনন্দকে আজকের মানুষের কাছে, ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ করে তুলবার উপকরণ কোথায়? আমার অনুসন্ধানীবৃত্তি ইয়োরোপের পর্যায়ে এসে ভাষার বাধায় পর্বতে প্রতিহত-গতি নদীর মত থমকে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত কয়েকটি কাগজের কর্তিতাংশে উদ্‌গ্রীব জনতার উৎসুক ও আনন্দিত মুখচ্ছবির ভাষা ছাড়া আর সব আমার কাছে অবোধ্য। ফরাসীও জানিনে, জার্মানও তাই, রুমানিয়ান হাঙ্গেরিয়ান বুলগেরিয়ানও তথৈবচ। কাজেই আমার হাতে পড়ে বিশ্বের দৃষ্টি কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার ছিদ্রপথে যতটুকু আত্মপ্রকাশ করছে ততটুকুই প্রকাশ পেল।

১৯২১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপ রবীন্দ্রনাথের বাণীতে পেয়েছিল জীবনের এক নূতন মূল্যবোধ। বাইরের দিকে যা পরাজয়রূপে গণ্য অন্তরের দিকে তাতেই সর্বশূন্যতা নয়। অন্তরের সেই মুক্তি যাতে জীবনের বিপর্যয়ের ঊর্ধ্বে উঠবার শক্তি জোগায় সেইটি লাভ করাতেই যথার্থ জয়। পার্থিব জড়শক্তিকেই প্রাধান্য দিলে মনুষ্যত্বের ক্ষয় হয়, কবির বাণীতে এই নূতন জীবনমূল্য তাদের মনে অল্পক্ষণের জন্য হলেও নিশ্চয় আশ্বাস এনেছিল। সে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী বিজয়ী দেশগুলি ভেবেছিল—'ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।'—তখন তাদেরই অধীন জাতির এক কবির

[১] প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮

বিদ্রোহী কণ্ঠে সারা ইয়োরোপের এই ভক্তির মাল্য যখন পড়তে লাগল, পথে পথে হতে লাগল জয়যাত্রার পুষ্পবৃষ্টি, তখন বিজয়দৃপ্ত সাম্রাজ্যবাদীরা শঙ্কিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। কেউ কেউ বা মনে করেছিল জার্মানি প্রভৃতি দেশগুলিকে শান্তির বাণী শুনিয়ে আর তত্ত্বকথার মন্ত্রজল পড়িয়ে ঠাণ্ডা করে রাখতে পারলে মন্দ হয় না।

কবি জার্মানি থেকে একটি চিঠিতে লিখেছেন :

"সেদিন বার্লিনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা হল। জামানিতে আমার রচনার যে প্রভূত সমাদর হয়েছে তাতে তাঁর আনন্দ জানিয়ে তিনি বলছিলেন —এই জার্মানদের সান্ত্বনা দেবার জন্য উপযুক্ত কোনো দর্শনতত্ত্ব আমি জোগাতে পারি কিনা। আমি নিশ্চিত জানি এতে ব্রিটিশদের উপকারের কথা ভেবেই তাঁর আনন্দ হয়েছে। আমার মনে হল তাঁর ধারণা হয়েছে যে দর্শনতত্ত্ব হচ্ছে কোনো ঘুমপাড়ানী ওষুধ যাতে জার্মান জাতির চঞ্চল কর্মশক্তিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেবে, যার ফলে বিজয়ীরা নিরাপদে তাদের অর্থসম্পদ ভোগ করতে পারবে। কাজেই আনন্দের সঙ্গেই আত্মিক সম্পদ ও পরমার্থ প্রভৃতি এসব লোককে দান করে দিয়ে নিজের জাতের জন্য পার্থিব অর্থসম্পদটুকু রেখেই সুখী থাকবেন। মনে হল তিনি মনে মনে হাসছেন আর ভাবছেন যে এই দরাদরিতে তাঁর জাতই জিতে গেল!"...

রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপ ভ্রমণের কথা আলোচনা করতে গেলে জার্মানির কথাই প্রথমে মনে হয়। কেউ কেউ মনে করেন পরাজিত জাতি আধ্যাত্মিকতার আস্বাদে দুঃখের মুক্তি খুঁজেছিল। কিন্তু কথাটি ঠিক তা নয়। দার্শনিকতত্ত্ব সত্যিই কোনো ঘুমের ওষুধ নয় উপরন্তু তা জাগাবারই ওষুধ। রণবিধ্বস্ত জার্মানি দেখল অপরাজেয় জাগ্রত আত্মার শক্তি একটি পরাধীন জাতির প্রতিনিধির মধ্যে। আমরা জানি জার্মানি দার্শনিকের দেশ। পাশ্চাত্ত্য জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরা ঐ দেশেই জন্মেছেন। কবি গায়ক বিজ্ঞানী ও মনীষী যুগে যুগে নূতন সৃষ্টিতে ঐ দেশকে করেছেন প্রাণোচ্ছল। তবু সেই দেশ বাহুবলকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছিল, যুদ্ধান্তে দুঃখের দাহে দগ্ধ তাদের মন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে কি ক্ষণকালেব জন্যও বুঝেছিল যে বাহুবল নয়, তপস্যাই শ্রেষ্ঠ বল? জার্মানিতে প্রসিদ্ধ দার্শনিক কাউন্ট কাইসারলিং কবির পূর্ব পরিচিত, তিনি পরম বন্ধুর মত এগিয়ে এলেন জার্মানির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করাতে।

কাউন্ট কাইসারলিং-এর কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর দুটি লেখার মধ্যে বোঝা যাবে। একটি ১৯১১ সালে লেখা আর একটি ১৯৩২ সালে—সময়ের এই সুদীর্ঘ ব্যবধানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়নি। বরং পরিচয়ের গভীরতার সঙ্গে অনুরাগও গভীর হয়েছে। ১৯১১ সালে তিনি

লিখেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথকে দেখে মনে হল তিনি যেন কোনো উচ্চলোকের অতিথি—বোধহয় আত্মিকভাবের এমন ঘনীভূত রূপ আমি মনুষ্যদেহে ইতিপূর্বে দেখিনি।" আর ১৯৩২ সালে আবার লিখেছেন—"আমার যত মানুষকে এ পৃথিবীতে জানবার সৌভাগ্য হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ। তাঁব যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এবং স্বদেশে তাঁর যে সম্মানের আসন এসবের চেয়ে তিনি অনেক বড়।...আমাদের পৃথিবীতে তাঁর মত মানুষ বহু বহু শতাব্দীর মধ্যে জন্মাননি।

"আমি আমাব পরমবন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যেমন ভালোবাসাপূর্ণ শ্রদ্ধা করি এমন আর কোনো জীবিত মানুষকে করি না—কারণ তাঁর মত বিশ্বমানবতা, সার্বভৌম সত্তা ও সম্পূর্ণ মানুষ আর নেই। কিছুদিন আগে Graphology বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা একজন বৃদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী আমার কাছে সংরক্ষিত মহাত্মাদের হস্তাক্ষর দেখতে এসেছিলেন। সন্তুষ্ট হবার মত আমার সংগ্রহে তিনি সামান্যই পেলেন কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষব তাঁকে দেখালাম ঐ বৃদ্ধের চোখে জল এসে গেল—'কী সুন্দর! কী মহৎ! ইয়োরোপীয় রেনাসাঁসেব পর থেকে এই পর্যায়ের হাতের লেখা আর দেখিনি।' "১

হাতের লেখা সম্বন্ধে কাইসারলিং-এর এই মন্তব্য প্রসঙ্গে কণ্ঠস্বর বিষয়ে একটি খবর উল্লেখযোগ্য। *Christian Science Monitor* নামে একটি কাগজে লিখেছে—'কণ্ঠস্বরের মিউজিয়ম'—বার্লিনের নূতন আবিষ্কার। 'শব্দের বিভাগ' এই নামে সর্ব ভাষার কথ্য লাইব্রেবি গঠিত হয়ে বার্লিনস্থ প্রাশিয়ার স্টেট লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফোনেটিক্স বিদ্যার অনুশীলনের জন্য বহু ভাষার স্বর বিধৃত হয়েছে। যেখানে জীবিত মহাপুরুষদের Voice-portrait বা স্বরচিত্র রাখছে তার মধ্যে রবীন্দ্র ঠাকুরের কণ্ঠস্বর রক্ষিত হল।'

ডার্মস্টাটে ঠাকুর সপ্তাহের কথা বিস্তারিতভাবে রবীন্দ্রজীবনীতে আছে। এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। কাইসারলিং-এর উদ্যোগে হেসের প্রাক্তন গ্রান্ড ডিউকের রাজকীয় উদ্যানে বসত তাঁর জ্ঞানরাজ্যের উৎসবসভা। প্রতিদিন বহু নরনারী তাঁদের জিজ্ঞাসু উন্মুখ হৃদয়ের নানা প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হতেন কবির কাছে। সাতদিন ধরে এই যজ্ঞের যে অনুষ্ঠান চলেছিল তার যদি কোনো পূর্ণ ছবি আমার মনের সামনে থাকত তবেই আমি তা আমার পাঠকদের কাছে আঁকতে পারতাম। হয়ত বা জার্মান ভাষার কিছু কিছু সংগৃহীত কাগজের মধ্যে তার একটা ইতিহাস পাওয়া

Golden Book of Tagore.

যেতে পারে, এইরকম একটি আশা নিয়ে চিন্তিত মনে হলদে-হয়ে-যাওয়া কয়েকটি কাগজের টুকরো নিয়ে বসে আছি এমন সময় কাউন্ট কাইসারলিং-এর পুত্র পুত্রবধূর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। এই অভূতপূর্ব যোগাযোগে বেশ বিস্মিত হয়ে আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যে ঐ কাগজের খবরগুলি তিনি কিছু অনুবাদ করে দিতে পারেন কিনা। একদিন জার্মানির সেই সর্বজনমান্য কাউন্টের পুত্র আজ গৃহহীন অজ্ঞাতপরিচয়। পুরানো কাগজের পাতায় পুরানো দিনের ইতিহাস, দেবতুল্য পিতার নানা উল্লেখ তাঁকে কীভাবে স্পর্শ করেছিল জানি না, তিনি পাতার পর পাতা পড়ে যেতে লাগলেন, আমি পেনসিল হাতে করে অনুবাদ করে নেবার অপেক্ষা করে রইলাম—সময় অল্পই ছিল, কিছুক্ষণ পড়বার পর তিনি আমাকে বললেন, এত অল্প সময়ে শুধু এই কাগজগুলি পড়ে আমার ধারণা হল যে, রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে জার্মানিতে এমন উন্মাদনা এসেছিল যে তাঁর হাতে যদি টাকা থাকত, তিনি যদি একটু ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে অর্ধেক জার্মানি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে চলে আসত।

তখন সাধারণত ৩-৪ হাজারের বেশী কোনো কবিতার বই জার্মানিতে বিক্রি হত না, কিন্তু গীতাঞ্জলি এক লক্ষের উপর বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন, বিরুদ্ধতা কিছু কি হয়নি? হয়েছিল বৈ কি, এইসব কাগজেই তারও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। না হবেই বা কেন, জার্মানিতে প্রায় অর্ধেক লোকই হয় কবি নয় দার্শনিক। আর তাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব কবিতা সম্বন্ধে, দার্শনিক মতামতের নূতনত্ব সম্বন্ধে ধারণা খুবই উচ্চ, অতএব এই বিদেশী কবির এমন অভূতপূর্ব সংবর্ধনায় তাদের অনেকেই বেশ মনোকষ্ট পাচ্ছিল। সেইরকম কোনো কোনো কবি বা দার্শনিকরা লিখেছে—এ কী? এর কথা শুনে গোটা দেশ এমন পাগল হয়ে গেল কেন? আমার নিজের কথা বলছি না, কিন্তু আমাদের অমুক তার কবিতা তো মন্দ নয়, কিন্তু তাকে তো কোনো সম্মান দেখানো হচ্ছে না! আরনল্ড কাইসারলিং বললেন, Will Vesper নামে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর জার্মান কবি ভারি দুঃখিত মনে লিখছে—"এ কথা ভাবতে বেশ একটু কষ্ট হয় যে কোনো জার্মান কবি- এমনকি গেটেও- তাঁর জীবদ্দশায় এতখানি সম্মান সমাদর শ্রদ্ধা ও পূজা তাঁর নিজের দেশেও পাননি- কিন্তু কী হবে! তাঁরা তো ভারতবর্ষ থেকে আসেননি আর তাঁদের নাম উচ্চারণ করতেও তো এমন দাঁত ভেঙে যায় না।"

জুনিয়র কাইসারলিং আরও বললেন, এইসব ঈর্ষা-প্রসূত কথা শুনে আমার বাবা (Count Herman Keyserling) এদের উপর ভারি চটে গিয়েছিলেন—কবির কাছে সহজে কাউকে ঘেঁষতে দিতেন না। কেউ বাজে

প্রশ্ন করে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে না পারে সে দিকে কড়া নজর রাখতেন—সেজন্য তাঁর উপর অনেকেই চটে গিয়েছিল। ঠাকুরের ডার্মস্টাটে আসবার পূর্বে এজন্য তিনি কাগজে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে ছিল—

"ঠাকুর ডার্মস্টাটে এক সপ্তাহের জন্য আসবেন, 'উইসডম স্কুলে'র শান্তিপূর্ণ সভাগৃহে থাকবেন, যাঁরা কেবলমাত্র কৌতূহল মেটাবার জন্য আসতে চান না—এই ঋষির সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে, গভীরভাবে, সত্য সত্যই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান, তাঁরা আসুন, অন্যরা বিরত হন। মনে প্রাণে ভারতীয় বলে তিনি ঘনিষ্ঠ আবেষ্টন পছন্দ করেন—ঘরোয়া পরিবেশে আত্মীয়ভাবে, উপদ্রুত না হয়ে থাকতে চান। আমি যত কবি দেখেছি বা জানি তাঁদের সকলের চেয়েই তিনি কোমল-স্পর্শ (sensitive); তা ছাড়া ঠেলাঠেলি ভিড় ও অবিবেচনার উৎপাত না হলে তবেই তাঁর মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেতে পারে। আমি এ জগতে মনুষ্যদেহে এমন কাউকেই জানি না যাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একটুমাত্র তুলনা করা যায়। অতএব যাঁরা সত্যই চিন্তার আদান-প্রদানে আগ্রহান্বিত তাঁরাই এ সপ্তাহে ডার্মস্টাটে আসবেন।"[১]

এখানে যে "উইসডম স্কুলের" উল্লেখ আছে সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ আছে। কাউন্ট হারমান কাইসারলিং-এর স্থাপিত ঐ স্কুলে তিনি যে বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা যথার্থ জ্ঞান ও শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন কবির মতের তা সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। জুনিয়র কাইসারলিং আমাকে বললেন যে তাঁরা উভয়ে স্থির করেছিলেন যে এইরকম তিনটি বিদ্যালয় থাকবে, একটি জার্মানির ডার্মস্টাটে, একটি শান্তিনিকেতনে ও একটি চীনে—এই তিনটি তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু জাতির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের আন্তরিক মিলনে পূর্ব ও পশ্চিমের যথার্থ মিলন হবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা একটি নির্দিষ্ট সময় তিনটি দেশের তিনটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করবেন। বলা বাহুল্য এই ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা কাজে ঘটানো যায়নি। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় পরিবর্তিত রূপে টিকে আছে। শুনছি কাইসারলিং প্রতিষ্ঠিত 'স্কুল অব্ উইসডম' কোনোমতে এখনো জীবিত তবে এই দুইয়ের মধ্যে ছাত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়নি। আর চীন দেশে বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা যে কার্যকরী হয়নি তা তো বলাই বাহুল্য। দার্শনিক ও কবির এই শিক্ষা-পরিকল্পনা যদি সফল হত তাহলে পৃথিবীতে যথার্থ গুণীর সংখ্যা কিছু বাড়ত সন্দেহ নেই! ঐ বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের আগমন উল্লেখ করে কাইসারলিং যে বন্দনা লিখেছিলেন তার

---

[১] *Der. Teg.*, 22. 11. 21.

কিয়দংশ ইংরেজি অনুবাদ থেকে পুনর্বার বাংলায় অনুবাদ করলাম—

“ওঁ প্রজ্ঞার দেবতা পবিত্র গণেশকে নমস্কার। অস্তাচলের দেশে ধর্মনগর[1] নামে একটি নগর আছে—সেখানে রবীন্দ্রের বন্ধু এক ক্ষত্রিয় বাস করে। সে একটি বিদ্যালয় করেছে এবং তার কাছে তিনি এসেছেন। তাঁর এই ক্ষত্রিয় বন্ধু এতদিন অস্তাচলের দেশের রীতিতে যা শিখিয়ে এসেছে—যে রাজকীয় জীবনের কথা, জ্যোতির্ময়সত্তার কথা বলে এসেছে, আজ পাশ্চাত্ত্য জগতের মানুষের কাছে মূর্তি ধরে সেই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। সেই অনন্ত একের জীবন্ত বিগ্রহমূর্তি আজ পূর্বদেশ থেকে এসেছেন।”

(রবীন্দ্রজীবনী)

২রা জুন দুপুর ১২টার সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা—বিষয় পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন। ঐ দিন এক বিপুল জনতা আগ্রহে উন্মাদনায় কবির দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভেঙে পড়েছিল—ভিড়েব চাপে দু-একটি বালিকা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল—সমস্ত পৃথিবীর কাগজে সে দিনের বর্ণনা নানাভাবে প্রচারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন—সেদিনের ব্যাপার ‘একটি ইতিহাস’ হয়ে আছে। সেই ইতিহাসের যেটুকু উদ্ধার করেছি তা এখানে অনুবাদ করে দিলাম।

“বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর কবিকে নিমন্ত্রণ করেছেন—২রা জুন বেলা ১২টা বক্তৃতার নির্ধারিত সময়। ঈস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ টিকিট করেই ব্যবস্থা করেছেন যাতে লোকসংখ্যা নির্ধারিত থাকে। কিন্তু ভিড় প্রচণ্ড হয়ে গেল। বক্তৃতা শুরু হবার দু ঘণ্টা আগেই দেখা গেল হল করিডর সিঁড়ি সমস্তই জনাকীর্ণ। তা ছাড়া হাজার হাজার লোক রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। বেকটর কবিকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছেন—জনতা পথ করে দিচ্ছে, কিন্তু সিঁড়িতে ভিড় এত প্রচণ্ড যে আধ ঘণ্টাতেও দোতলায় পৌঁছতে পারছেন না। রেকটর জনতাকে ক্রমাগত অনুরোধ জানাচ্ছেন, কিন্তু ফল কিছুই হচ্ছে না, কাবণ পিছনে ভিড়ের চাপে লোক পথ করতেও পারছে না। অবশেষে রেকটর বললেন, তাহলে পুলিশ ডাকতে হয়। তাতে জনতা ক্ষুব্ধ হল। এমন সময় Dr. Hernack এসে জনতাকে শান্ত করতে লাগলেন। তখন একজন প্রসিদ্ধ ‘প্রফেসর অব মেডিসিন’ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অনুনয় করতে লাগলেন, ‘কবি যদি সভাগৃহে ঢুকতেই না পারেন তাহলে সেটা কি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লজ্জার কথা হবে না?’ তিনি আরো বললেন যে জনসাধারণকে আমরা

---

[1] Darmstat অর্থ ধর্মনগর

সরে যেতে বলতে পারি না—কারণ তাঁরা আমন্ত্রিত অতিথি—অধ্যাপক ও ছাত্ররাই নিমন্ত্রণকর্তা। অতএব আমি চলে যাচ্ছি, আমাদের ছাত্ররা যে যে আমার সঙ্গে যাবে চলো—এই বলে দুই হাত তুলে ভিড়ের ভিতর নেমে পড়ে তিনি অগ্রসর হয়ে যেতে লাগলেন আর তাঁর পিছন পিছন পাঁচ ছয় শত ছাত্র চলে গেল। কবি ছাত্রদের সঙ্গে পৃথক সাক্ষাৎ করবেন এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যখন বক্তৃতা শেষ হল, রাস্তায় ১৪-১৫ হাজার লোক দাঁড়িয়ে ছিল—কবি বাইরে এলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেই জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা করল। লোকে তাঁর কথা শোনবার জন্য বা অন্ততপক্ষে একবার তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। তাঁর জনপ্রিয়তার কথা কিছু বোঝা যায় যখন শুনি এক লাখ পঞ্চাশ হাজার কপি 'ঘরে বাইরে' ছয় মাসে বিক্রি হয়েছে। ৫০ হাজার কপি 'সাধনা' ফুরিয়ে গেছে, এ বই ধর্ম সংক্রান্ত—পলিটিক্স্ নয়।"[১]

এখানে এও মনে রাখতে হয়, এ কিন্তু ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন বা আইসেনহাওয়ারের ভারত সফর নয়- কোনো পলিটিক্যাল নেতার আজকের দিনের বিশ্বভ্রমণ নয়—এর মধ্যে দলগত কোনো প্রভাব কাজ করেনি। যিনি সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত পরাধীন 'কালার্ড পিপল'দের দেশের একজন কবি মাত্র—তাঁর প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আকর্ষণ, তাঁর ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার প্রত্যক্ষবৎ প্রভাবই প্রমাণ করে।

এই কথাই ভিয়েনা থেকে ২৬শে জুন ১৯২১ তারিখে *London Observer*-এর ভিয়েনার প্রতিনিধি লিখছেন—"আমার তো মনে পড়ে না যে কোনো জীবিত কবি এমন সর্বজনসম্মত অভ্যর্থনা, এমন গভীর ভক্তি ও প্রশংসা ভিয়েনাবাসীর কাছে বা ভিয়েনার সংবাদপত্রে কখনো পেয়েছে। ব্যক্তিগত দেহসৌন্দর্যেরও এমন গভীর প্রভাব এই বাঙালী লেখক ও মনীষীর মত আর কেউ ফেলতে পারেনি।"[২]

এই সময় কবির দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনতার মধ্য থেকে একজন জার্মান তাঁর মনের কথা লিখছেন। এর থেকে মানবহৃদয়ের যে বিপুল আবেগ তাঁর প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তার ভিতরের কথাটি কতকটা বোঝা যাবে :

"আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে এই মহান ভারতীয়কে মুখোমুখি দেখবার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিলাম, আমাদের মনের মধ্যে কি খানিকটা কৌতূহলের ছোঁয়া ছিল না? হয়ত ছিল, সে আমাদের ইয়োরোপীয় স্বভাব, তা তো আটকাতে পারি না। কিন্তু যে মুহূর্তে কবি ঘরে

---

[১] *M. R.*, August 1921.
[২] *M. R.*, August 1921.

ঢুকলেন সেই মুহূর্তে আমাদের সে স্বভাব দূর হয়ে গেল। যেন কোনো এক অদৃশ্য অনির্বচনীয় শক্তি এই মানুষটিকে নিঃশব্দে অভ্যর্থনা জানাতে আমাদের আসন থেকে টেনে তুলল। আত্মার মিলনরহস্য এমন স্পষ্ট করে বোঝা খুব কমই যায়। আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় এমন একটা জিনিস আমরা অনুভব করতে পারলাম—আমরা বুঝতে পারলাম এই মানুষটির জীবনে এমন একটি মুহূর্তও নেই যখন না তিনি অনন্তের সঙ্গে যোগ অনুভব করছেন।

"তিনি ঐখানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং সরলভাবে তাঁর অন্তরের কথা আমাদের বললেন। তাঁর প্রথম কথা তাঁরই বিশেষ বাণী—"এ শতাব্দীর বৃহত্তম ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন" (ঐ বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্তসার) সেদিন বলেন।

"এই এক পুরাতন উচ্চবংশের প্রতিনিধি আধ্যাত্মিক [illegible]-এর অবতাররূপে আত্মজয় ও আত্মত্যাগের দ্বারা মুক্তির চিহ্ন ধারণ করেছেন—এঁর দ্বারা ঐ দূর পুরাকালের জগৎ থেকে এক নূতন ধারা আমাদের জীবনে বাঁধ ভেঙে প্রবেশ করে খৃষ্টধর্মের মধ্যে এক নূতন প্রাণপ্রবাহ নিয়ে এল, যে ধর্ম আমাদের হাতে ভ্রষ্ট ও নষ্ট হতে বসেছিল।

"আমরা ঐক্যচ্ছিন্ন এ শতাব্দীর দীন সন্তানরা ইতিপূর্বে কখনো জীবনে সামঞ্জস্যের জন্য এমন আকাঙ্ক্ষা বোধ করিনি। নরকের মধ্যে পড়ে আর্ত আমাদের স্বপ্নে কোন্ স্বর্গলাভের সম্ভাবনা হানা দিত। এমন সময় অন্য জগৎ থেকে একজন মানুষ এলেন। তাঁর আগমনের কাল পূর্ণ হয়েছিল, এর চেয়ে উপযুক্ত সুসময় আর হতে পারে না। কালকের বিদায়দৃশ্যে তা বোঝা গেল—শত শত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে দাঁড়িয়েছিল তাঁকে আর-একবার দেখবার জন্য, তিনি এলেন, নীরবে শত শত হাত তাঁর দিকে এগিয়ে গেল—কেন? আকাঙ্ক্ষায়? না। চরিতার্থতায় এক মুহূর্তের সার্থকতা। এইভাবে আজকের নূতন মানুষ জানাল যে তারা এক মানব-গোষ্ঠীর মানুষ। এই নীরব শ্রদ্ধা এক নূতন মানবের প্রকাশ, আমরা কখনো এই মহান প্রতীককে ভুলব না।"[১]

কবির ষষ্টিতম জন্মদিবস উপলক্ষে সমগ্র জার্মানির তরফ থেকে তাঁকে একটি বহুমূল্য গ্রন্থসংগ্রহ উপহার দেওয়া হয়। সেই জন্য জার্মানির বিভিন্ন শহরের বার জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মিলে একটি কমিটি করে লেখক ও প্রকাশকদের একত্র করে এই ব্যবস্থা করেন। সেই কমিটি এই উপহার দেন

---

[১] *Hamburges Zeitung*, Saturday Evening s Paper May 21st 1921 হইতে অনূদিত *M R.*, August 1921.

পূর্বে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেটি বার্লিন থেকে প্রফেসার মেঘনাদ সাহা ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

“রবীন্দ্রনাথের ৬০ বৎসর পূর্তির জন্মোৎসব স্বদেশ থেকে বহুদূরে, ইয়োরোপ প্রবাসে সম্পন্ন হবে। এই সুযোগে তাঁর জার্মান বন্ধু ও ভক্তরা মিলে জার্মানির তরফ থেকে তাঁর পূর্ব ও পশ্চিমের দুই প্রধান ভূভাগ এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে নূতন আত্মিক সৌহার্দ্যবন্ধন স্থাপনের প্রচেষ্টার জন্য সমর্থন ও ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ নেবে। মানুষের অন্তরাত্মার গভীরে নিহিত যে শক্তি বিভিন্ন মানুষকে একসূত্রে বাঁধে তার মূল্য, গভীরতা ও দৃঢ়তা সূর্যোদয়ের দেশে বা অস্তাচলের দেশের কোথাও আর কোনো মানুষই এমন করে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেননি। জগতে আর কোনো কবি বা মনীষীর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি যে গাঙ্গেয় উপকূল থেকে আরম্ভ করে ইয়োরোপের দক্ষিণ থেকে সুউচ্চ উত্তর পর্যন্ত সমস্ত দেশব্যাপী অগণ্য মানুষ একসঙ্গে যাঁর চিন্তার সামঞ্জস্য, কবিতার সুর-রণিত ধ্বনি শুনেছে, ভাবের শক্তি অনুভব করেছে। তিনি তাঁর রচনা Sunset of the Century ও Nationalism প্রবন্ধে দ্রষ্টার ন্যায় যে আবেগপূর্ণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন ক্রমেই তার প্রতি মানুষের মনে আগ্রহ বেড়ে উঠেছে। জার্মানিতে যখন অতি কঠিন দুঃখের সময়, যখন মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষার সময়, তখনো রবীন্দ্রনাথের বন্ধুর সংখ্যা এত বেশী যে তাঁদের নীরব কৃতজ্ঞতার কোনো বাইরের নিদর্শন দেখাবার জন্য তাঁরা অন্তরে প্রবল আগ্রহ অনুভব করছেন।”

সেই নিদর্শনস্বরূপ লেখক প্রকাশক প্রভৃতি সকলে একত্র হয়ে একটি কমিটি করে শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির জন্য বহুমূল্য গ্রন্থসংগ্রহ উপহার দেন। পরিশেষে তাঁরা লিখছেন, “গভীর প্রজ্ঞার জন্মভূমি ভারতবর্ষের যে কেউ জার্মানি সম্বন্ধে জানতে চায়, মানবসভ্যতায় জার্মানির দানের কথা জানতে চায় তার সঙ্গে এই বইগুলি কথা বলবে।”[১]

এ উপহারের সঙ্গে সমগ্র জার্মানির গভীর শ্রদ্ধা কবিকে কীভাবে স্পর্শ করেছিল তার সামান্য কিছু উল্লেখ আমরা তাঁর চিঠিপত্রে পাই।

“কাল আমার জুরিখে নিমন্ত্রণ আছে, তারপর এ মাসের দশই সুইজারল্যান্ড ছেড়ে জার্ম্মানিতে যাব। আমি তোমাকে পূর্বের কোনো চিঠিতে *বলিনি কি যে আমার গতি আমার আকাশের জ্যোতিষ্ক মিতারই অনুসরণ* করে এবং আমার জীবনের শেষ *দিনগুলিতে পশ্চিমেরই দাবি? এ দাবি*

---

[১] *M. R.*, August 1921.

কত সত্য তা ইয়োরোপ মহাদেশে ভ্রমণের পূর্বে জানতাম না। এই সৌভাগ্যে আমি অভিভূত। শুধু যে মানুষের কাছে প্রশংসা মধুর তা নয়, এতে করে বাইরের প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও অন্তরে মানুষের যে ঐক্য তা বুঝতে আমায় সাহায্য করেছে।[1] ১০ই মে ১৯২১

জার্মানির এই রবীন্দ্রানুরাগ কোনো হুজুগের উপর নির্ভরশীল ছিল না—তাঁর কাব্য পড়ে কাব্যের আনন্দই ছিল তার মূলে।

লন্ডনের একটি কাগজে 'জার্মানি কী পড়ছে' এই নামে একটি প্রবন্ধে লিখছে :

'ভারতবর্ষের কবির বইই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়। স্বদেশী দার্শনিকদের মধ্যে এখন হারমান কাইসারলিং সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর Daybook of a Philosopher বইখানি ইংল্যান্ডে Hall Caine-এর উপন্যাস যেমন চলে তেমনি প্রচলিত। এমন জনপ্রিয় কাইসারলিংও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পরাভূত! যুদ্ধের পূর্বে নিটশের যে জ্বলন্ত চিন্তা জার্মানির যুবমনকে লালন করেছিল সেই তেজঃপূর্ণ তত্ত্বও আজ রবীন্দ্রনাথের কোমল দর্শনতত্ত্বের কাছে পরাস্ত। ঠাকুরের কৃতকার্যতা একেবারে স্তম্ভিত করে দেয়। এ বছরে তাঁর বই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে। কোনো জার্মান ঔপন্যাসিক, নাট্যকার বা কবি এই শান্ত কল্পনাময় ভারতীয় কবির সঙ্গে এ বিষয়ে জিততে পারে না। বহু বইয়ের দোকানে নানা দামের নানা সজ্জার রবীন্দ্রনাথের বই সাজানো আছে। সবচেয়ে সস্তা সংস্করণের দাম দেখলাম একখণ্ড ১৫ মার্ক। আর সম্পূর্ণ রচনাবলীর নানারকম দাম দেখলাম—২৫০ থেকে ৩০৯ মার্ক পর্যন্ত। সর্বশুদ্ধ House of Wolff (প্রকাশক) ৮ লক্ষ কপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই বিক্রি করেছে।'[2]

'আলপাইন দেশে ঠাকুর' এই নামে অস্ট্রিয়ার একটি ছোট শহর ইন্‌সব্রুক থেকে একজন একটি প্রবন্ধে 'কবিকথা' লিখছেন :

"ভিয়েনা একদা আধুনিক যুগের মহা শক্তিশালী লেখক রূপে হাউটম্যানকে প্রথম চিনেছিল। আর বার্লিন সর্বদাই সাহিত্য ও শিল্পজগতের নূতন নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধানে আছে, কিন্তু তবু পর্বতের অভ্যন্তরে অস্ট্রিয়ার টাইরোল প্রদেশে ছোট ইনস্‌ব্রুক শহরে কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি সেই ভিয়েনা বা বার্লিনের চেয়ে কম নয়। ছোট ছোট হোটেল-রেস্তোরাঁতে সান্ধ্য আসরে বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে প্রথম প্রশ্ন করে, ভারতীয় কবির শেষ লেখাটি পড়েছ? জার্মানভাষী দেশে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি-সম্ভাবনা

---

[1] M. R., August 1922

[2] *John O' London's Weekly*, 30th Sept 1922.

তিনি নিশ্চয়ই পূর্বেই জানতেন, কারণ গেটে যখন কালিদাসের শকুন্তলাকে অমর করেছেন তখন থেকেই ভারতীয় চারুকলা ও রম্যরচনার দিকে জার্মানদের উৎসাহ। কাজেই আজ যে আমাদের নিজেদের গল্প-লেখক Adalbert Stifter-এর জঙ্গলের গল্প আর প্রকৃতির কবি Adolf Piohler-এর কবিতার মতই ঠাকুরের ক্রেসেন্ট মুন, গার্ডনার, হোম অ্যান্ড দি ওআলর্ড আমাদের প্রত্যেক পর্বতে প্রান্তরে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই এমন প্রিয় হয়েছে তা বিস্ময়কর নয়। ইন্সব্রুকের কাগজে ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়টি খুব ভাল ছিল না। আমরা শুনেছিলাম যে ভারতবর্ষের স্বাদেশিকতা আন্দোলনে, যে আন্দোলন নন্-কোঅপারেশনের দিকে অনেকটা আইরিশ Sinnfeiners আন্দোলনের মত, তিনি ইংরেজের পক্ষ নিয়েছেন (!)। কিন্তু আবার অনেকেই তাঁকে মুক্তিসংগীতের গায়করূপে প্রশংসা করেছিল। বোধহয় বিরাট স্রষ্টাদের এই ভাগ্যলিপি যে লোকে তাঁদের ভুল বুঝবে এবং তাঁদের সম্বন্ধে বিপরীত মতামত বিভিন্ন লোকের দ্বারা প্রচারিত হবে। এদিকে যুদ্ধপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদীরা কবিকে পছন্দ করে না। তারা মনে করে আশাবাদী কর্মোদ্যমের পক্ষে তাঁর মতামত বিষতুল্য। এরকম লোকের কাছে ঠাকুর শুধু কথা কথা, কথা! নর্থ জার্মানিতে এইভাবে ভাবিত একজন লিখেছে—"আমি 'The Fugitive'-এর একটি সুন্দর গদ্য-কবিতা একজনকে পড়ে শুনিয়েছিলাম—আমার তরুণী শ্রোতা বলতে লাগল, কী সুন্দর, কী অপূর্ব, কী মধুর! তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু এই মনোরম কবিতার মানে কী বুঝেছ?' তরুণী একটুক্ষণের জন্য দিশাহারা হয়ে গেল। অবশেষে বললে—'মানে যাই হোক কিছু এসে যায় না—তবু এ অপূর্ব।'..

"যখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা পড়েন শ্রোতার মনে কী দুঃখই হয় যে সে বাংলা বোঝে না, সভায় উপস্থিত কেউই বাংলা জানে না। কিন্তু প্রত্যেকে অনুভব করে কবিতার ভিতরের সুর। রঙ্গমঞ্চের উপর মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন Lion-ballad (কবিসিংহ) আর বাতাসে শব্দের ছোট ছোট রুপোর ঘুঙুর বাজছে—এই হচ্ছে বাংলা-ভাষা—যাতে রচিত মধুর সুরেলা গীতাঞ্জলির কবিতা বা গানের অর্ঘ্য, আর যার থেকে কয়েকটি ফুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সোনার বীণায় (golden organ) করে গত গ্রীষ্মে ভিয়েনার জনসাধারণের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।...এই বাঙালী মহাকবিকে যখন বাংলায় কবিতা পড়তে শুনি তখন মনে হয় এ কি এক অপূর্ব নভোচারী, কখনো বা হরিণ-ক্ষিপ্রগতি ভাষা!"

...তারপর 'দুই পাখি', 'এ কি সত্য' ও 'শিশু'র কবিতার কাব্য সমালোচনা করে, লেখিকা পরিশেষে বলছেন: "বিরাট কনসার্ট হলের সভামণ্ডপটিকে

মন্দিরবেদীর মতন মনে করে এক হাজার দর্শক নীরবে প্রশংসাপূর্ণ মনে কবিকে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়েছিল। উচ্চ করতালির ধ্বনি ছিল না, অধৈর্য ছিল না, (বাংলাতে পড়া বলে) উৎসাহ এতটুকু কমেনি। কবি যতক্ষণ বাংলা কবিতা পড়ছিলেন মনে হল ভিয়েনার জনসাধারণ যেন প্রাচ্যের মহাজ্ঞানীর সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যটুকু বুঝে তার সম্মানে যথাবিহিত দূরত্ব রক্ষা করে নীরবে দাঁড়িয়েছিল।"১

যখন রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের এক মহান পরিচয় ঘোষণা করছেন—যখন দেশে বিদেশে তাঁকে দেখে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে স্তম্ভিত বিস্ময়বিমূঢ় ইয়োরোপ ভাবছে—এই কি ভারতীয়—এই কি বাংলা ভাষা!—তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গর্বিত ইয়োরোপ নতমস্তকে ভারতবর্ষকে জানাচ্ছে প্রণাম; তখন এই হতভাগ্য দেশে কবির নিন্দায় তৎপর ঈর্ষাপরায়ণ এবং মূঢ় লোকের অভাব ছিল না। ঐ সময়ের নানা দেশীয় কাগজে দেখা যায় কবি কেন স্বাধীনতা-যুদ্ধে নামছেন না তার জন্য আক্ষেপ ও নিন্দা। তাদের উত্তরে 'মডার্ন' রিভিউতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন :

"আমাদের মতে কবি তাঁর নিজের জন্য এবং স্বদেশীয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় মুক্তির চেয়েও গভীরতর ও সত্যতর মুক্তির জন্য নিয়ত সাধনা করছেন। তাই বলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নন। এবং কোনো ভারতীয়ের চেয়েই এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ কম নয়, শুধু তাঁর পথ পৃথক।" তা বললে কী হবে, ক্ষুদ্রদর্শীরা মনে করত দেশবিদেশের এই পরম জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের চেয়ে কবির প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পিকেটিং-এ যোগ দেওয়াই শ্রেয়! এবং এ ধরনের নিন্দাবাদের ঢেউ বিদেশেও পৌঁছেছিল। নিন্দাবাদ নানাপ্রকারে হচ্ছিল। জার্মানিতে কবির এই অভূতপূর্ব সমাদরে ইংরেজও কম অস্বস্তি বোধ করেনি।"

Schefaur নামে একজন আমেরিকান লেখক লিখলেন—"জার্মানদের মত বুদ্ধিপ্রজ্ঞ মানুষেরা এত সামান্যতে কী করে আশ্চর্য হল?" তাঁর মতে যুদ্ধের আঘাতে বিক্ষত জার্মানি কবিকে 'মেশায়া'রূপে বরণ করেছে। মেশায়া অর্থ পরিত্রাতা। কবি নিজেও জানেন, আহত জার্মানি যেন আহত শিশুর মত মাকে খুঁজছে। কিন্তু তাই বলে সে খোঁজা কি মিথ্যা? প্রেমের মধ্যে যে দুঃখের ত্রাণ, মানবজীবনের সেই তো চিরসত্য।

কবি ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৯২১ সালে এন্ড্রুজ সাহেবকে লিখলেন "প্রথমেই ভেবেছিলাম তোমাকে সমস্ত বর্ণনা করে লিখব, কারণ জানি

---

১ Mrs. Maria Groener, ইংরেজি অনুবাদ Ida Stieler—*M. R.*, March 1922.

তোমার ভারি আনন্দ হবে—কিন্তু এখন পিছিয়ে গেলাম—কারণ আমার কেমন যেন তেমন আনন্দ হচ্ছে না—একটা বেদনা বোধ হচ্ছে—আমাকে যে অর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে এ আমি আমার প্রাপ্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। পশ্চিমের হৃদয় থেকে এক প্রবল বন্যা উত্তাল হয়ে পূর্বতীরাভিমুখে চলেছে—ইয়োরোপীয় জাতির দুর্দম অহংকার সহসা স্তম্ভিত হয়েছে।... আজকের ইয়োরোপ যেন আহত শিশুর মত মাকে খুঁজছে। আত্মিক চিন্তার জননী প্রাচ্যদেশ কি তার প্রাণ থেকে প্রাণ দিতে পারে না?...এসব দেশে যে আশ্চর্য সম্মান পেয়েছি তাতে বিস্ময়বিমূঢ় মনে আমি তার কারণ অনুসন্ধান করছি—লোকে বলে আমি মানুষকে ভালবাসি তাই এর কারণ, একথা যেন সত্য হয়...আমার সমস্ত রচনায় মানবপ্রেমের যে বাণী নানা প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হয়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে তা যদি সত্য হয় তবে আমার রচনার সেই সর্বোত্তম সত্য এখন থেকে আমার জীবনকেও চালিত করুক।.. সেদিন যখন আমার হোটেলের ঘরে হামবুর্গে একলা বসে আছি দুটি সলজ্জ মিষ্টি দেখতে জার্মান বালিকা একগোছা গোলাপ নিয়ে আমায় উপহার দিল। একজন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, "আমরা ভারতবর্ষকে ভালবাসি।" আমি বললুম, "কেন ভারতবর্ষকে ভালবাস?" সে বললে, "তুমি (you) যে ঈশ্বরকে ভালবাস।" এ কথা তো খুবই বেশী প্রশংসা—আমার পক্ষে এত প্রশংসা গ্রহণ করা শক্ত। কিন্তু হয়ত এ একটা আশা, তাই আমার পক্ষে আশীর্বাদ। আর হয়ত সে বলেছে যে আমাদের দেশ ঈশ্বরকে ভালবাসে তাও একটা আশা—তার মানেও আমাদের বুঝতে হবে—যেসব দেশ শুধু জাতিকেই ভালবাসে তাদের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ বেড়ে ওঠে। এ পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে সেই দেশের জন্য যে দেশ ঈশ্বরকেই ভালবাসবে—শুধু নিজেকে নয়। সেই দেশই সব মানুষের ভালবাসার দাবি করতে পারবে।"...

জার্মানিতে রবীন্দ্রসাহিত্যে গভীর অনুশীলনের প্রমাণ তৎকালীন পত্রিকায় তাঁর কাব্য-সমালোচনায় দেখা যায়। এইসব প্রবন্ধের সামান্যই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে, কিন্তু যে দু-একটি পেয়েছি তা অতুলনীয়। সমসাময়িক ইংরেজিভাষী জগতের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই আমার পড়বার সুযোগ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আচরণ, কথাবার্তা ও মতামত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকের বিশদ ও সুন্দর বিবরণ বহু পেয়েছি। কিন্তু জার্মানির দু-একটি কাব্য-সমালোচনার মধ্যে তত্ত্বদর্শী মনের যে গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্যত্র বিরল। বার্লিন থিয়েটারে ডাকঘর নাটকের অভিনয় কবি দেখতে গিয়েছিলেন—সে কথা তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। যে-মেয়েটি অমল সেজেছিল তার অভিনয় কবিকে মুগ্ধ করলেও তিনি

লিখেছেন যে ঐ নাটক লেখবার সময় তাঁর মনে যে ভাব ছিল জার্মানির অভিনয়ের ভাবটি ঠিক তাদৃশ নয়। এর ব্যাখ্যা পৃথক। Murburg University-র Dr. Otto তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁর মতেও জার্মান রূপায়ণে ঐ গল্পটি যেন রূপকথার আকার নিয়েছিল, অথচ এর মর্মকথাটি আধ্যাত্মিক। কবি বলছেন, তাঁর নিজের ভাবটি ছিল এই : যেন অমল একটি তেমনি মানুষ যার মনে মুক্ত পথের ডাক এসে পৌঁছেচে; প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব থেকে সাবধানীর বন্ধ দরজা খুলে ভব্যতার গণ্ডী ছেড়ে, নব নব আনন্দের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়তে চায়, মাধব সেই সাবধানী সংসারী যে এই সুদূরের জন্য ব্যাকুলতাকে ব্যারাম বলে মনে করে আর চিকিৎসক প্রথাগত নিয়মের সংরক্ষণী মনোভাব নিয়ে সায় দিয়ে বলে মুক্ত পথে বড় বিপদ। কিন্তু জানালার সামনেই ডাকঘর, সেখান থেকে রাজার চিঠি আসে মুক্তির বাণী নিয়ে...রাজার নিজের বৈদ্য এসে দরজা খুলে দেয়, তখন দেখা যায়, সনাতন মতের বন্ধন আর জমা-করা জঞ্জাল সরিয়ে দিলে যা আসে তা আনন্দময় মুক্তি। এ জগতে যাকে বলি মৃত্যু আত্মার জগতে সেই তো নবজন্ম।

বার্লিনের People's Theatre-এ এই অভিনয় হলে Preussiche Yahrbuch নামে প্রসিদ্ধ কাগজে তার একটি চিন্তালোকিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ সমালোচনায় কবির বক্তব্যের চেয়ে একটু পার্থক্য থাকলেও রবীন্দ্রকাব্যের একটি মূল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এবং কত অল্প পড়েই এই বিদেশীদের রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্তর্দৃষ্টি ঘটেছিল তা বোঝা যাচ্ছে।

"এই ভারতীয় নাটক একেবারে বাহুল্যবর্জিত, কাব্যালংকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—সরল। মুমূর্ষু একটি বালকের কাছে এ বিশ্ব ও মানবসংসার কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে সে কথাটি আমাদের চিত্ত অভিভূত করে। শ্রাবণ এ তো সত্য যে অনেক মানুষই মৃত্যুর সামনে এসে তবেই জীবনের তাৎপর্য বুঝতে পারে! আমাদের এ যুগে যুদ্ধ থেকে যাঁরা রক্ষা পেয়েছেন তাঁরাও জানেন একথা কত সত্য যে যখন তাঁদের জীবনের উপর মৃত্যুর স্পর্শ এসে পড়েছে তখনই জীবন এক নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। প্রাত্যহিক সামান্য কত ঘটনা মৃত্যুর ছোঁয়া লেগে পবিত্র হয়ে উঠেছে। পূর্বের কত জমা-করা অসন্তোষ দূর হয়ে গেছে—কত অর্ধ-বিস্মৃত ছোট জিনিস বড় হয়ে মনে জেগেছে।" তুলনীয় :

হেথা যারে মনে হয়, শুধু বিফলতাময় অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে, অপূর্ব নূতন রূপে হয় সে সফল?
চিরকাল এইসব রহস্য আছে নীরব, রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে, সে হয়ত আপনাতে পেয়েছে উত্তর।

সে হয়ত দেখিয়াছে, পড়ে যাহা ছিল পাছে আজি তাহা আগে,
ছোট যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন বড় হয়ে জাগে।

“জীবনের প্রারম্ভে যে স্বর্গের স্ফুলিঙ্গ এসে পড়েছিল তাকেই জ্বালিয়ে তুলতে আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। তখন প্রতিদিনের তুচ্ছ অস্তিত্ব যেন কোনো জাদু লেগে আলো হয়ে উঠেছে। মৃত্যুপথিকের জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে তাদের পূর্ণ করে তুলেছে, তখন দৈনন্দিন জীবনে যে কেউ নিকটে এসেছে সকলের জন্যই তাদের অঞ্জলি ভরে উঠেছে অর্ঘ্যে।

“মৃত্যুর দ্বারা পবিত্র মানুষের মত অমলেরও এই দ্রষ্টার মত অন্তর্দৃষ্টি জন্মেছে। তার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করে সেও যেন ভরা পাত্রের মত উপচে পড়ছে, তাই যে কেউ তার কাছে আসছে সকলেই তার জীবনের অর্ঘ্য নিবেদনে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।...নষ্ট হবার ভয়ে বিরক্ত যে দইওলা ব'লেছিল, ‘দই কিনবে না তবে ডাকাডাকি কেন,’ অমলের সঙ্গে কথা বলে অমলের আনন্দের স্পর্শে তার প্রাত্যহিক কর্মের বোঝা হয়ে ওঠে মধুর—তখন সে বিনামূল্যে দিয়ে যায় দই—অমলকে বলে—‘তুমি আমাকে শেখালে দই বেচাতেও কত আনন্দ।’ এইরকম সব দৃশ্যে ভারতীয় দর্শনতত্ত্বে কবির বিশেষ মতটি কী তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তাঁর কাছে এ জগৎ মায়া নয়—মিথ্যা নয়—জগতের প্রত্যেক ঘটনা ঈশ্বরের দ্বারা প্রাণায়িত।. এই দৃশ্যমান জগতের পুষ্পপল্লবে প্রাণে ও জড় পর্বতে কন্দরে তাঁকেই অনুভব করতে হয়। ভারতের এই নবীন দ্রষ্টা যিনি জগতের আনন্দরূপকে পূর্ণগ্রহণ করতে চান, তাঁর কাছে প্রাত্যহিক দুঃখকর তুচ্ছ ঘটনাও ঈশ্বরের আনন্দে পূর্ণ। তাঁর অমল মানুষকে শেখায় কী করে এই আনন্দময়কে জীবনের সাধারণ কর্মের মধ্যে দিয়েও লাভ করতে হয়।...

“ঠাকুরের এই নাটকটির সম্মুখে আমরা ভক্তিতে নির্বাক হয়ে আছি—এ আমাদের মর্মের গভীরে প্রবেশ করেছে। শুধু যে এই নাটকের চরিত্রগুলি রুগ্ন অমলের চতুর্দিকে অপূর্ব নাটকীয় ঐক্য রক্ষা করে চলেছে তা নয়, আমরা ঐ বালকের বিশ্বাসের শক্তির বেগ অন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করাবার আশ্চর্য শক্তি অনুভব করে সহসা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সেই পরমানন্দের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি।...গভীর ভাবের তরঙ্গ আমাদের অন্তরে বন্যার মত প্রবেশ করে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। এখানে আমরা এমন একটি নাটক দেখছি যার মধ্যে আন্তরশক্তির বেগই প্রবল। আমাদের পাশ্চাত্ত্য দেশে নাটকের এই অন্তর্মুখী বেগ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি শেকসপীয়রের চরিত্রচিত্রণের অপূর্ব শক্তিও নাটকের বহিরঙ্গ কার্যব্যাপারের মধ্যে হারিয়ে যায়। ধরা যাক রিচার্ড দি থার্ড।—রচনানৈপুণ্যের অপর্ব নিদর্শন এই নাটকের চরিত্রগুলিতে শক্তির বহিঃপ্রকাশই প্রবল।

বিচিত্র উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত আমাদের উত্তেজিত ধমনীকে পরিশ্রান্ত করে। বাহিরের নানা ঘটনা শেষ পর্যন্ত এক চরম অবস্থায় পৌঁছে বিপর্যয়কারী দুর্ঘটনাতে শেষ হয়।...আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বড় বেশী ব্যস্ত থাকে, কিন্তু একটুক্ষণের জন্যও অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে রণন তুলতে পারে এমন একটি কোমল মুহূর্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু যে নাটকে আন্তরশক্তির লীলা, সেখানে বাহ্যিক কর্মের প্রাবল্যকে যতদূর সম্ভব কম করতে হয়। এ ইন্দ্রিয়ানুগ নাটক নয়। এতে মানবাত্মার পরস্পরের সঙ্গে লীলার রহস্য দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।...এ নাটকের চরিত্রগুলি কোনো চেষ্টাকৃত কর্মে ব্যাপৃত নয়। তাদের অন্তরাত্মার আংশিক অনুভব আপন অজ্ঞাতসারেই চতুর্দিকে প্রভাব বিস্তার করছে। লাউৎসে হলে বলতেন—"অকর্মক প্রভাব বিস্তার করা—" এইরকম নাটকের রচনার মধ্যেই ঠাকুর দেখিয়েছেন পূর্ব দেশের মন জীবনকে কীভাবে দেখে। পাশ্চাত্ত্য দেশে যাঁরা মহামানব তাঁরা সর্বদাই বহির্জগৎকে জয় করেন, তাঁরা কর্মবীর, এবং তাই তাঁদের প্রকৃতিতে যোদ্ধৃভাব—অতএব পাশ্চাত্ত্য নাটকে বহির্মুখী কর্মশক্তির প্রকাশ হবেই। যেমন ইয়োরোপে যদি কেউ কোনো নূতন সত্য অনুভব করে তবে জগতে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে ও অন্যকে জোর করে তা গ্রহণ করাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে জগতে যোদ্ধৃবেশে বেরিয়ে পড়বে। এদিকে প্রাচ্যে যখন কোনো নূতন সত্যের আলো কারু জীবনকে স্পর্শ করে সে প্রথমেই নির্জনে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ধ্যানের দ্বারা সেই সত্যকে আপন অন্তরে গ্রহণ করবে। এই দুই পথের মধ্যে অসীম পার্থক্য। বাহ্যিক কর্মপ্রচার ও যুদ্ধ—এ সমস্ত যেমন প্রাচ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তেমনি পাশ্চাত্ত্য জগতে অন্তরের উপলব্ধি ও সাধনার পথ বিরুদ্ধ। মহামানবের কাছে প্রাচ্যের দাবি, তিনি যেন সত্যকে নিজের জীবনে অনুভব করে নিজের জীবনকে সেই অনুসারে চালিত করেন। যাঁরা নিজের মধ্যে সে সত্যকে পূর্ণভাবে লাভ করেছেন তাঁরাই শুধু তা অন্যের সামনে উপস্থিত করবার অধিকারী।১

১ এই সুন্দর বিশ্লেষণের সঙ্গে গুরুগোবিন্দ কবিতাটির তুলনা মনে আসে।

"চারিদিক হতে অমর জীবন বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে।
কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ—
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে, গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে
আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।"

(বর্তমানে যাঁরা নেতৃপদ লাভ করতে চান তাঁরা নিজেদের জীবনসাধনায় সে পথের জন্য যোগ্যতা লাভ করেন না বলেই আজকের ভারতে গুরুপদ শূন্য—মিথ্যাচারী নেতৃত্বে দেশ পথভ্রষ্ট।)

"জীবনের অশেষ পূর্ণতার সৌন্দর্য কবির সৃষ্টিতে এমন করে তখনই প্রকাশ পেতে পারে যখন কবি নিজের অনুভবে সে সত্যকে যথার্থরূপে লাভ করেন। নিজের উপলব্ধিসঞ্জাত হলে তবেই এ রকম আন্তরশক্তিপূর্ণ অঙ্গাঙ্গী-ঐক্য-সম্বন্ধ নাটক সৃষ্টি হতে পারে। আজ ঠাকুরের রচনা আমাদের এমন করে মনোহরণ করেছে, কারণ এখানে আমরা তাঁর জীবন-সাধনার ফল দেখতে পাচ্ছি। আমাদের পাশ্চাত্ত্য নাট্যকাররা যখন ধর্ম-সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে লেখেন তখন তা সুসম্পূর্ণ হয় না। তাঁরা কেমন যেন একটা হট্টগোল সৃষ্টি করেন। উদাহরণস্বরূপ Schmidtbon-এর passion play (খৃষ্ট জীবনী) বা Hofmaunsthal-এর Yedermann (এটি ইংরেজি নৈতিক নাট্য Everyman-এর অনুকরণে রচিত)—এগুলি মনে করতে পারা যায়। এইসব নাটকের রচয়িতা নাটকের আভ্যন্তরিক সত্যকে সেকেন্ডহ্যান্ডভাবে পেয়েছেন—শ্রোতাদের মনে যে বিশ্বাস তাঁরা জাগাতে চান সে তাঁদের আপন উপলব্ধিসঞ্জাত নয়। সত্যের সরল অব্যবহিতবোধ জাগাতে হলে সে রচনা যেমন কবির আপন হৃদয়রক্তে, আপন গভীর অনুভবে রঞ্জিত হওয়া দরকার, এগুলি সেরকম নয়।...কিন্তু ঠাকুরের কথা আমরা জানি, আমরা জানি তাঁর আপন সুরে বাঁধা কাব্য সমগ্র জাতির কণ্ঠে গীত হচ্ছে। তাঁর জীবনে ঈশ্বরের গভীর অনুভব ঘটেছে বলেই তাঁর রচনা এমন সরল, এমন সর্বজনগ্রাহ্য হতে পেরেছে। (সেদিন) পোস্ট অফিসের দর্শকদের মধ্যে তীব্র আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। আমি কোনো অভিনয়ে এমন যথার্থ সত্য অশ্রু ঝরতে দেখিনি। এর মধ্যে হিস্টিরিয়া-পাওয়া কান্না ছিল না—শুধু গভীর বিচলিত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হয়েছিল। বিদেশী ভাষার অসম্পূর্ণ প্রকাশের মধ্য দিয়েও নাটকের কবিত্বময় সত্য শ্রোতাদের বিচলিত করেছিল—লুসি ম্যানহাইম-এর মধ্যে অমল সার্থক হয়ে উঠেছিল। কোনো চেষ্টাকৃত অভিনয় নয়। কবির সরল নিরলংকার ভাব তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। একটি কোমল সুর প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রান্ত থেকে আমাদের মনে রেশ রেখে গেল। ভীতিবিহ্বলকারী বুদ্ধের বা লাউৎসের জগৎ থেকে নয়, তাঁদের চেয়ে অনেক সামান্য একটি বীণা থেকে এল সেই সুর যিনি এক অন্তর্জ্যোতি-রুদ্ভাসিত মুহূর্তে তাঁর ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করেন—'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।'"১

এই কাব্যসমালোচনাটিতে বিদেশী কাব্য ও দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করবার

---

১ *M.R.*, Feb., 1922.

সমালোচকের যে অন্তর্দৃষ্টি, যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাতে আমরা বুঝতে পারি যে জার্মানি ও সমগ্র ইয়োরোপের কাছে রবীন্দ্রকাব্য তার একটি বিশেষ বাণী উপস্থিত করতে পেরেছিল। কাব্যের বেদনা যখন পাঠকের মনে আপন অভিজ্ঞতার মত অব্যবহিত বোধ জাগাতে সমর্থ হয় তখনই তা সার্থক হয়। কবির ইংরেজি রচনার এই সার্থকতা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার হয়েছিল। এখানে আরো লক্ষ্য হয় যে রবীন্দ্রনাটকে নাটকীয়তার অভাব তাঁর স্বদেশে নিন্দিত হয়েছে কিন্তু সেই বিশেষ কারণেই তা কর্মক্ষুব্ধ পাশ্চাত্ত্য মনের উপর শান্তির প্রলেপ দিয়েছে।

১৯২১ সালে জার্মানিতে যে সমাদর শুরু হয় ১৯২৬ সালে ও ১৯৩০ সালে ইয়োরোপ ভ্রমণের সময়ও তার কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি। তাঁর মতবাদ পুরানো হয়ে যায়নি বা মানুষের হৃদয়ে তাঁর শ্রদ্ধার আসন বিচলিত হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কাব্য ও চিন্তা বহু মনের আনন্দ ও মননা স্পর্শ করেছে। তারপর এল বিপর্যয়। ১৯২৬ সালে যখন জার্মানিতে তিনি দেবতার মত পূজিত হচ্ছেন তখন যে ইংল্যান্ডে কিছু ঈর্ষা-বিদ্বেষের আন্দোলন হবে তা আশ্চর্য নয়। ১৯২৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের একটি বার্লিনের কাগজে ও ১৮ই সেপ্টেম্বরের *Madras Mail* কাগজে ব্রিটিশ কাগজের কতকগুলি মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছে। ব্রিটিশ কাগজগুলি আমি দেখিনি কিন্তু মন্তব্যগুলি থেকেই তার অর্থ সুস্পষ্ট।

বার্লিন থেকে লিখছে : রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়েছেন...বিশ্ববিখ্যাত কবির প্রতি এদেশের পাঠক ও ভক্তদের হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্যে লন্ডনের একটি কাগজ বহু কষ্ট করে মতলব খুঁজে বের করতে পেরেছে...সকলেই জানে যে ভারতবর্ষ বিষয়ে বিবিধ জ্ঞানার্জনে, সংস্কৃত অধ্যয়নে জার্মান পন্ডিতরা চিরদিনঃ সময় ও শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করে এসেছেন। *Madras Mail* লিখছে : 'জার্মানরা যে কবিকে এত আশ্চর্য চিত্ত-অভিভূতকারী সম্মান দেখাচ্ছে ব্রিটিশ কাগজের মতে তা হচ্ছে জার্মান ব্যবসায়ীদের ভারতবর্ষের বাজারে জিনিস বিক্রি করার চক্রান্তপ্রসূত...তবে আমরা বলি যে এর আর কোনো উত্তর দেবার দরকার নেই, শুধু একটিমাত্র উত্তর এই যে, আমাদের বাজারে এত প্রচুর জার্মান জিনিস এমনিতেই ঠাসা আছে যে তার জন্য এত কৌশল করবার কী দরকার।'

বার্লিনের ঐ সময়ের আর-একজন সংবাদদাতা লিখছেন : "কবির এখানকার প্রোগ্রাম নিশ্ছিদ্র। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বরকম শ্রেণীর দর্শনাকাঙ্ক্ষীর ভিড় চলে, সে ভিড়ে প্রসিদ্ধ পন্ডিত থেকে শুরু করে সেন্টিমেন্টাল বুড়ির দলও একসঙ্গে জোটেন। অতি প্রত্যূষ থেকে হোটেলের সামনে

স্রোতের মতন লোক আসতে থাকে, এই দার্শনিক কবিকে একটু দেখবার জন্য—ফোটোগ্রাফার আর সাংবাদিকরা তো চিলের মত ছোঁ মেরেই রয়েছে। ...আমরা বিস্মিত মনে ভাবি, পৃথিবীর আর কোনো দেশে কি বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা শুনতে এত প্রচণ্ড ভিড় হওয়া সম্ভব?" 'হিন্দু' কাগজের বার্লিনের সংবাদদাতা ১৯২৬ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে কবির জার্মানি বাসকালে সেখানকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য জার্মানিই সবচেয়ে উপযোগী—এই দেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপুল জ্ঞান এবং দক্ষতা লাভ করেছে সেই বিশেষ কারণ ছাড়াও ভারতবর্ষের সঙ্গে এদের আদর্শ ও জীবন-দর্শনের মিল আছে।' সংবাদদাতা লিখছেন যে, 'ঠিক এই মত আরো অনেক জার্মান সুধী পোষণ করেন।'...

"...কবি বললেন, জার্মানি সম্বন্ধে কোনো মতামত তিনি দিতে চান না, কারণ মতামত তৈরি হবার মত যথেষ্ট মানুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। কিন্তু যখনই তিনি কোথাও বক্তৃতা করতে গিয়েছেন সভাগৃহ জনাকীর্ণ হয়ে গেছে, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে জনতা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনেছে।...যে সমস্ত দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন, অন্তত কিছু মানুষকে তাঁর জীবনতত্ত্ব ও মতামত আনন্দ ও সুখ দিয়েছে।...ইয়োরোপের সমস্ত দেশগুলিতেই, তাঁর জীবনদর্শনের জন্য মানুষ তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছে। এর ফলে তিনি নিজেও এক নূতন আলো দেখতে পেয়েছেন। সবচেয়ে তাঁর আনন্দ হয় যে, "হৃদয়ের এই গভীর বাণী 'unsophisticated'[১] মানুষের কাছ থেকেই বেশী এসেছে।" পাকা সমালোচকদের মতামতের উপর তাঁর তত আস্থা নেই—তারা কবি ও দার্শনিকদের ফ্যাশন অনুযায়ী মূল্য দেয়। যেমন ধরা যাক টেনিসন—এক সময়ে যিনি এত প্রশংসিত হয়েছিলেন আজ তাঁর উল্লেখ করবার সময় অবজ্ঞাটুকুও কেউ গোপন করে না।...জার্মানির কথায় আবার ফিরে এসে তিনি বললেন, এই অল্প সময়ের মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করেছেন যে এখানে দুটি দল আছে—একদল বিশ্বমৈত্রীর ভাবে ভাবিত শান্তিকামী, আর একদল ঘোর জাতীয়তাবাদী। অনেক সময় একই বাড়িতে দুই মতের লোক দেখা যাচ্ছে। এ ভারী দুর্ভাগ্যের কথা।"

এ দুর্ভাগ্য যে কত প্রচণ্ড তা অল্প পরেই হিটলারের অভ্যুত্থানে প্রমাণিত হল।

এই বিশেষ মন্তব্যটির মধ্যে আমরা কবির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই—তুলনীয় 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', তৃতীয় পর্ব।

ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় রাজতুল্য সমাদর, গুরুতুল্য ভক্তি ও প্রিয়প্রতিম প্রেম পেয়ে বিস্ময়াভিভূত চিত্তে কবি বারেবারেই বলেছেন—“আমি এদের জন্য কী করেছি, কী পেয়েছে এরা আমার মধ্যে? এত অজস্র দান গ্রহণের আমার যোগ্যতা কোথায়? যদি প্রাপ্যের চেয়ে বেশী পাই তাহলে সুদসুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে হবে না তো?”

কবির মতামতের বিরুদ্ধ সুর কোথাও কোথাও ইতস্তত শোনা গেলেও, সর্বসমেত তাঁর যে প্রতিষ্ঠা ইয়োরোপে হয়েছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সে সম্বন্ধে লিখছেন: “কন্টিনেন্টাল প্রেসে যেসব খবরের বিবরণ আমরা দেখছি তাতে বুঝতে পারছি শুধু অস্ট্রিয়াতে নয়, সুইডেন হল্যান্ড জার্মানি ফ্রান্স প্রভৃতি সমস্ত দেশেই কবির যে রকম সংবর্ধনা হয়েছে তা একেবারেই অভূতপূর্ব। সমকালীন কোনো দেশের কোনো প্রতিভাশালী ব্যক্তি, কোনো রাষ্ট্রনেতা, কোনো রাজা বা সম্রাট, ইয়োরোপের সমস্ত দেশে এমন প্রভূত ও উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা পাননি।”১

৪ঠা আগস্ট ১৯২১ সালের ‘সার্ভেন্ট’ কাগজে ভিয়েনার একটি বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশিত হয়। লেখকের মনের আবেগ উপমা আশ্রয় করে সাহিত্যের রূপ নিয়েছে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিদেশের অনেক সংবাদই তাই কবির সম্পর্কে সংবাদমাত্র থাকেনি, কবির প্রত্যক্ষ সন্দর্শনের আনন্দে তা সাহিত্য হয়ে উঠেছে:

“ভিয়েনায় স্যার রবীন্দ্রনাথের আগমন প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যুদ্‌গমন করে তাঁকে আহারে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন, মন্ত্রীরা সেক্রেটারিরা সকলেই তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব--বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছে এবং তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসবগৃহে ও কনসার্ট হলে, অর্থাৎ শহরের দুটি বৃহত্তম সভাগৃহে বক্তৃতা করতে আসেন তখন সহস্র সহস্র লোক তাঁর জয়ধ্বনি করেছে। কিন্তু ঐ যে হাজার হাজার লোক তাঁর বক্তৃতা শুনল তারা কি সত্যই তার সবটুকু বুঝতে পেরেছে? বস্তুত প্রত্যেকটি কথা শোনা গেছে কিনা, এমনকি প্রত্যেকটি কথা ঠিকভাবে অনূদিত হয়েছে কিনা তাতেও সন্দেহ রয়েছে—কিন্তু শব্দার্থে কিছুই এসে যায় না—তার তাৎপর্যটুকু ধারণা করা চাই। তাঁর শ্রোতারা শব্দার্থের অন্তর্নিহিত ভাব নিশ্চয় বুঝেছিল, সেই মহতী সভার উপর তাঁর বাণী সূর্যালোকের মত এসে পড়েছিল, তখন সকলেই মানুষের প্রতি, বিশ্বচরাচরের প্রতি কবির অসীম দাক্ষিণ্য অনুভব করেছিল। খৃষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেল বলে যে যখন পেন্টিকোস্ট (penticost)

M.R., August, 1921.

উৎসবে সাধুসন্তরা (apostles) উপদেশ প্রচার করছিলেন তখন তাঁদের উপর ঐশী আত্মা (holy ghost) নেমে এসেছিল, তার ফলে তাঁদের শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে প্রত্যেকে তাঁদের কথাগুলি নিজের নিজের ভাষায় শুনতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশে ঠিক তারই উদাহরণ দেখিয়েছেন। তিনি ইয়োরোপীয়দের কাছে বাংলায় বললেন, জার্মানদের কাছে ইংরেজিতে বললেন, কিন্তু সকলেই তাঁর বাণীর গভীর অর্থ বুঝতে পারল। তাঁর আত্মার প্রভাব তাদের মনের উপর আলো ফেলল, তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেকটি ভঙ্গী আমাদের কাছে তাঁর রচনার সত্যতা প্রকাশ করছে...তিনি আমাদের তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আশার অতীত ভাবেই পূর্ণ করেছেন।"...

সেদিন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়োরোপ কবির সাহায্য চেয়েছিল। "ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আজ আমাদের কবিকে আহ্বান জানাচ্ছে। মহা মহা শক্তিশালী দেশনেতারা কী করে ইয়োরোপকে পুনর্গঠন করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁর উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করছে। অনেকেই বলছেন তোমায় গুরুরূপে বরণ করছি। প্রতিজ্ঞা করছেন তাঁর পদপ্রান্তে উপদেশ ও প্রেরণার জন্য একত্রিত হবেন। ইয়োরোপের এই নেতৃবৃন্দর ইচ্ছা যে কবি ইয়োরোপ মহাদেশের কোনো একটি কেন্দ্রে তাঁর বাসা বাঁধুন যেখান থেকে সকলে তাঁর উপদেশ নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ কবিকে টানছে। তাঁর গৃহমুখী মন এখন ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসবার জন্য ব্যস্ত।"[১]

নিউইয়র্কের একজন পাব্‌লিশার লিখছেন—আমেরিকায় সবচেয়ে রোমাঞ্চকর বই বিক্রি—যেমন 'Main Street' নামে বই দুলক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেল—এও জার্মানিতে ঠাকুরের বইয়ের চাহিদার কাছে তুচ্ছ।

ঐ পাব্‌লিশার আরো বলছেন, তিনি যখন বার্লিনে ছিলেন তখন ঠাকুরের পাব্‌লিশার এক মিলিয়ন কিলোগ্রাম অর্থাৎ দুই মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের কাগজের অর্ডার দিয়েছিল শুধু ঠাকুরের বইয়ের জন্য!

জার্মানিতে কবির জনপ্রিয়তা কোনো দিনই হ্রাস পায় নি। ১৯২৬ সালে ইয়োরোপ মহাদেশ ভ্রমণকালে ও ১৯৩০ সালে ছবির প্রদর্শনী উপলক্ষে যখন গিয়েছিলেন তখনও তিনি একই রকম সমাদর ও শ্রদ্ধায় মানুষের মন অধিকার করেছিলেন। ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত ইংরেজ সে প্রভূত সমাদরে অনেক সময় ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যখন ইয়োরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সে সময়ে তিনি যে প্রবন্ধ চিঠি ইত্যাদি লিখেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথের খবর থাকত।

---

[১] *Servant,* August 11, 1921.

১৯২৭ সালে ভিয়েনায় কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় রাশিয়া থেকে কবি ও তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য আটজন অনুচরবর্গের নিমন্ত্রণ এসেছিল। পাশপোর্ট পর্যন্ত তৈরি, এমন সময় ভিয়েনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক Dr. Wenkebech তাঁর সমস্ত ঘোরাঘুরি নিষেধ করলেন। রামানন্দবাবু লিখছেন :

"ডাক্তার ওয়েনকেবেক শুধু ডাক্তার ছিলেন না, তাঁর জ্ঞান ছিল বিচিত্র-বিষয়গামী। তাছাড়া তিনি ছিলেন সংলাপপটু। সত্যি বলতে গেলে তিনি কবির সঙ্গে বসে এত দীর্ঘ সময় ধরে গল্পই করতেন যে যদি না আমরা জানতাম যে তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এবং তাঁর প্র্যাকটিস্ জমাট তাহলে মনে করতাম তাঁর হয়ত কোনো কাজই নেই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে কবিদের যশ ও পুরস্কার লাভের কথা উঠলে কবি বলছিলেন, একই কৃতিত্বের জন্য দুবার পুরস্কার পাওয়া চলে না। কবি যে ঠিক কী ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা আমার মনে নেই—তবে তার ভাবার্থ বোধহয় এই ছিল যে অন্তর্দৃষ্টিতেই (সৃষ্টিকার্যেই ?) যে আশীর্বাদ ও পুরস্কার (আনন্দ রূপে) আছে তারপর তাঁর আর্থিক পুরস্কার বা খ্যাতির উপরি পাওনা না হলে দুঃখ করবার কিছু নেই।—এরকম অনেক কথাই কবি গল্পচ্ছলে বলতেন. তখন সাধারণ দৈনন্দিন হাসি-তামাশার মধ্যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথার চমক ডাক্তার ওয়েনকেবেককে মুগ্ধ করত।"

শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রবন্ধটির মধ্যে অনেক খবরা-খবর আছে কিন্তু সেগুলি কিছুই না থেকে যদি আমরা ওয়েনকেবেকের সঙ্গে কথোপকথনের কিছুটাও অনুলিপি পেতাম তাহলে সে পরিবেশের প্রত্যক্ষবোধ জন্মাত, কিন্তু তা হয়নি। এ ক্ষতির শেষ নেই।

ড্রেসডেনে কবি কবিতা পাঠ করবেন ও 'পোস্ট অফিস' অভিনয় হবে।...

"আমরা সভাগৃহে বক্তৃতা আরম্ভ হবার অল্প পূর্বে পৌঁছলাম—গৃহ জনপূর্ণ—বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে. বেশীর ভাগই বক্তৃতা বুঝবে না। তিনি ইংরেজিতে বললেন। কিন্তু প্রফেসর তারাচাঁদ রায় স্বচ্ছন্দ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন।...বক্তৃতার পর কবি অনেকগুলি কবিতা ইংরেজি ও বাংলায় আবৃত্তি করলেন। বক্তৃতার মধ্যে. কবিতাপাঠের সময় শ্রোতারা মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি করছিল—কবিতাগুলি. বিশেষত 'ক্রিশেন্ট মুনে'র কবিতাগুলি উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের এত ভাল লেগেছিল যে কবি পূর্বে যা স্থির করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী পড়তে বাধ্য হলেন। বক্তৃতা-পাঠের পর সেই প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আমরা বহু কষ্টে থিয়েটারের জায়গায় এলাম—সেখানেও তিলার্ধ স্থান ছিল না।...অভিনয় ভালই হয়েছিল। অমলের পার্ট একটি মেয়ে করেছিল, তার সঙ্গীরাও দেখলাম বেশীর ভাগ

মেয়ে, প্রাহাতে চেক ও জার্মান দুই ভাষাতেই 'পোস্ট অফিস' অভিনয় হয়। দু জায়গায় দেখলাম মেয়েরাই ঐ পার্ট করেছে।"

ভিয়েনাতে, কোলোনে, সর্বত্র হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়েছে বক্তৃতা শুনবার জন্য—বিনা মূল্যে কৌতূহল মেটাবার জন্য ভিড় করা নয়—দশ শিলিং করে টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য। তখনকার কালের দশ শিলিং কম নয়। "পাঁচ হাজার লোক আজ আধ ক্রাউন থেকে দশ শিলিং পর্যন্ত মাথা-পিছু খরচ করে এখানে কবির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে এসেছিল। ঐ বক্তৃতা ইংরেজিতে ভাষিত ও জার্মানে অনূদিত হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় কবি তাঁর কবিতা বাংলায় পড়েছিলেন—তা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে! কোলোন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, রয়টার।

এই সংবাদ অ্যাংলো-ইন্ডিয়াতে বেশ একটু অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিল—খুব ভালো লাগেনি। বাংলার কবি অজ্ঞাত অখ্যাত বাংলায় পড়ছেন, বহু-নিন্দিত ভারতবর্ষের বাণী সমস্ত ইয়োরোপ এমন আগ্রহে শুনছে—শাসক জাতির স্বার্থের তা পরিপন্থী।

স্টেট্‌স্‌ম্যান তাই লিখছে :

"যদিও ব্রিটিশ মনে জার্মানির শেক্সপীয়ারের প্রতি অনুরাগের প্রাবল্যে একটা দৈন্যবোধ জন্মায়, কারণ তারা নিজেরা অতটা অনুরাগ প্রকাশ করতে সমর্থ হয় না, কিন্তু তার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ হয় না—তবু (এ ক্ষেত্রে) বক্তার প্রভাবপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কথা মেনে নিলেও কোলোনের শ্রোতৃবর্গ রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতা যথার্থ আগ্রহের সঙ্গে শুনেছে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনো বিদেশী ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হলে তবেই সে ভাষার কাব্য বোঝা যায়। বিশেষত যখন শ্রোতা ও কবির শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তখন কবিতা বোঝবার উপযুক্ত সহানুভূতি থাকা অসম্ভব। এইসব কারণে অতিরিক্ত সন্দিগ্ধ-ভাব না দেখিয়েও আমরা বলতে পারি যে তাঁর কবিতা নয়—রবীন্দ্রনাথ নিজেই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। শিক্ষিত 'ইন্দো-ব্রিটেন'রাও বাঙালীদের মত গীতাঞ্জলির স্বাদ পায় না।"

ইংরেজদের অন্তর্দাহের কারণ অনেক ছিল, তা সত্ত্বেও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে আজ মনে হয় এ সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রানুরাগের তুলনা নেই। তিনি যেন সর্বদা দুই হাতে তাঁর সব মত, সব চিন্তা আগলে ধরে আছেন। কোথা থেকে এতটুকু আঘাত এসে লাগতে পারে না। পুরানো কাগজপত্র দেখতে দেখতে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে—এই পরিণত যুক্তিশাণিত বুদ্ধি, বিচক্ষণ পুরুষের রবীন্দ্রপ্রীতির মধ্যের ভাবটি মাতৃস্নেহের মত। পরিহাসচ্ছলেও কারু

এতটুকু খোঁচা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। অথচ তাঁর নিজের মন কত সময় স্নেহের অভিমানে পূর্ণ হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু কথা আজ মনে পড়ে—সেসব লেখবার স্থান এখানে নয়। শুধু কবির মৃত্যুর পর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির পূর্বে আমার মৃত্যু হবে...” এই অকৃতার্থ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার বক্তব্যের সমর্থন আছে। রামানন্দবাবু স্টেটস্‌ম্যানের এই মন্তব্যের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছিলেন :

“আমরা কোলোনে কবির শ্রোতাদের মধ্যে ছিলাম না, কিন্তু ড্রেসডেন ও প্রাগে জার্মান শ্রোতাদের মধ্যে ছিলাম। দু জায়গাতেই আমরা দেখেছি, তাঁর কবিতার আবৃত্তি যেন তাঁর বক্তৃতার চেয়েও বেশী সমাদৃত হয়েছে। দু জায়গাতেই শ্রোতাদের বেশ কিছু অংশ ইংরেজি বুঝত। প্রফেসার তারাচাঁদ বক্তৃতাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন...আর কবিতার কথা...আমরা দেখেছি ইংরেজি ও বাংলা দুই-ই সমান আদরে গৃহীত হয়েছে। নির্দিষ্ট কবিতাগুলি পড়া হয়ে গেলে লোকের উৎসাহে কবি আবার কবিতা পড়তে বাধ্য হয়েছেন। কিছু কিছু জার্মানে অনুবাদ করা হয়েছে কিন্তু সব কবিতা অনুবাদ হয়নি।...তবু তারা কী রকম আনন্দ দিয়েছে তা আমরা দেখেছি—। আমরা জানি কবি চমৎকার পড়তে পারেন। কবিতার অনুভব অর্থবোধ ছাড়া ছন্দানুভবেও হয়ে থাকে। কবির সুরেলা কণ্ঠস্বর—তিনি অভিনয়কলায় পারদর্শী। কোনো কোনো স্থানে অভিনয়ের উপযুক্ত ভাবে পড়া হয়েছে। কবিতার ভাব ভঙ্গীতে প্রকাশ হতে পারে।...তবু অনেকে বিশ্বাস করবেন না, বিশেষ যাঁরা বিশ্বাস করতে চান না যে বাংলা কবিতা ভালভাবে আবৃত্তি করলে অবাঙালীরও মনোরঞ্জন করতে পারে। হয়ত বা সাধারণ চেক ও জার্মানের শ্রবণশক্তি ও সংগীতবোধ স্টেটসম্যান কাগজের সম্পাদক যাঁদের প্রতিনিধি সেই সব ইন্দো-ব্রিটেনের চেয়ে সূক্ষ্মতর ও অধিক শিক্ষিত।...ইন্দো-ব্রিটেন অর্থাৎ যাঁদের আগে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলা হত তাঁরা হয়ত ইংরেজি গীতাঞ্জলির স্বাদ পান না কিন্তু ‘বিনা হাইফেন যুক্ত সত্য ব্রিটন’ অসংখ্য আছেন যাঁরা ঐ কাব্যের পূর্ণ স্বাদগ্রহণ করতে সক্ষম।”[১]

এসব তর্কাতর্কির প্রশ্ন বাদ দিয়েও বোঝা যায় কবির বাংলা কবিতা বিদেশীর কেন এত ভাল লেগেছিল। বহু বিদেশী তার ব্যাখ্যা করে গেছেন। তাঁর উপস্থিতিতে, তাঁর কণ্ঠস্বরে, মানুষের অন্তরে যে আনন্দ-বোধ জন্মাত, বাক্যের অতীত ভাবকে তা স্পর্শ করত। সীমাবদ্ধ অর্থের চেয়েও গভীরতর অর্থে মনপ্রাণ ভরে তুলত। প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভাষার

M.R., Jan., 1927.

মত, তাঁর আনন্দের ভাষা জীবনের মূলে প্রবেশ করে, বাংলা ইংরেজি জার্মান সব ভাষাই যে ভাবের উৎস থেকে উত্থিত অনুভবের সেই পূর্ণবোধে উত্তীর্ণ হত।

জার্মানির সঙ্গে সে সময়ে ফ্রান্সের জনসাধারণের হৃদ্যতা ছিল না, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাত, এমনকি দুজনে একত্র হয়ে কবির জন্মোৎসব করতেও রাজী নয়—কিন্তু জার্মানিতে যেমন, ততখানি না হলেও ফ্রান্সে তাঁর সংবর্ধনা কম হয়নি। অমৃতসরে ভারত সরকারের দুষ্কীর্তি, কবির উপাধি ত্যাগের খবরের সহযোগে সারা পৃথিবীতে রাষ্ট্র হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের সরকার যুদ্ধমিত্র ইংরেজের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হয়নি। আমরা শুনেছি ফ্রান্সের জ্ঞানী-গুণীরা মিলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার আয়োজন ও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই সংবর্ধনার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করেছিলেন। ভিতর থেকে সরকারী অর্থ ও সাহায্য না পেলে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজনের উৎসাহে সে রকম সমারোহ করা সম্ভব হত না।

ঐ সময়ে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইতিপূর্বে 'ন্যাশনালিজম্' গ্রন্থের চিন্তাধারা রোমাঁ রোলাঁকে প্রভাবিত করে। এই দুই মনীষীর পরিচয় দীর্ঘদিন ধরে চিঠিপত্রে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল সে সংবাদ সুপরিচিত।

ঐ বছরই অর্থাৎ ১৯২১ সালে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গস'র সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের সেই আলাপের অনুলিপি মহামতি এনড্রুজ অনুবাদ করেছেন। এই সময়ে রোমাঁ রোলাঁও তাঁদের পরিকল্পিত Brotherhood of Free Spirits সংঘে কবিকে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেছিলেন পরীর রামধনু পূর্ব থেকে পশ্চিমে সেতুবন্ধন করে আছে, এনড্রুজ লিখছেন, তিনি পাঠকদের জন্য সেই সেতুবন্ধনের কিছু চিহ্ন নানা চিঠিপত্র কাগজ পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সে সংগ্রহে ফ্রান্স ও ভারতের দুই মহা মনীষী বার্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথের আলাপের অনুলিপি রক্ষিত আছে। কিন্তু সেই অনুলিপি-লেখক নিজেই লিখছেন—"বার্গসঁ-র কথাগুলি লিখলাম কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি ভাল করে লিখতে পারি নি। তাঁর ভাষা ও ভাবের এমনি বিশেষত্ব যে তা রক্ষা করা কঠিন।"

বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা ঐ অনুলেখকের সত্যবাদিতার প্রশংসা করে—সে কাজ সহজ নয়। বার্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনার সারাংশ বিধৃত আছে কিন্তু তার মধ্যে উভয় মনীষীর চিন্তা ও বাক্যের বিশেষ রসাস্বাদটি পাওয়া যাচ্ছে না বলে এখানে তার অনুবাদ করলাম না। কবি নিজে বন্ধু এনড্রুজকে লিখেছেন—"মহাদার্শনিক বার্গসঁ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

এসেছিলেন, তিনি আমার বই ‘পার্সনালিটি’ পড়েছেন। এবং সে বই সম্বন্ধে তিনি যে রকম প্রশংসা করলেন তা আমার আশার অতীত।”[১]

বার্গস‍ঁ ও রবীন্দ্রনাথের মতবাদের চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত তত্ত্বে গভীর ঐক্য আছে। দার্শনিক চিন্তার প্রথম যুগ থেকেই সে রাজ্যের দুই দিক দুইমুখী। বিশ্বরহস্যের মূলে এক দল দেখেন স্থিতি, আর-একদল গতি। যুগ যুগ ধরে এই দুই মত বারে বারে নানা প্রমাণ ও যুক্তিতে ভর করে ফিরে ফিরে এসেছে। কোনো সময়ে একটি মত প্রবল ও উজ্জ্বল হয়ে অপর পক্ষকে ম্লান করে দিয়েছে। বর্তমান যুগের দর্শনশাস্ত্রে স্থিতিশীলতার চেয়ে গতিবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দার্শনিক বার্গস‍ঁ গতিবেগ ও পরিবর্তনের প্রবাহকে একটি মূল সূত্ররূপে ধরেছেন। তাঁর মতে দার্শনিকরা যে প্রকৃতির মূল শক্তিকে অচল, অব্যয় মনে করেন তা ভ্রমাত্মক। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নন, কবি—কিন্তু তাঁর সমস্ত কাব্যের ধ্বনিতে বিশ্বের গতিবেগ ‘বলাকার’ পক্ষবিস্তারে ভর কবে দিগন্তে উধাও হয়েছে। সমাজে, রীতিতে, প্রথায়, মানবজীবনেব সর্বাংশে এই চলনশীলতা তাঁর মনোহরণ করছে। তিনি চঞ্চল। তিনি সুদূরের পিয়াসী। তথাপি একমেবাদ্বিতীয়ম্—যিনি অজ নিত্য শাশ্বত—তাঁকেও তিনি জানেন। যা চঞ্চলরূপে প্রকাশিত তারই আর-একরূপ স্থৈর্য। আকাশে যে নক্ষত্র চিরস্থির দেখি তা তো নৃত্যশীল অনুপরমাণুর নিয়ত ঘূর্ণ্যমান রূপ। বিপরীতের এই সমন্বয়েই যে অনন্তের বোধ তারই কথা কবি সবিশেষ ‘পার্সনালিটি’ নিবন্ধে ও নানা স্থানে বলেছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে বার্গস‍ঁ’র চেয়েও হেগেলের মতের সঙ্গে তাঁর চিন্তার ঐক্য বেশী। যা হোক, দর্শনশাস্ত্র আলোচনার স্থান এ নয়।

বার্গস‍ঁ সেদিন কবিকে বলেছিলেন—ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার প্রধান পার্থক্য এই যে ইয়োরোপীয় মন ‘more precise’ এবং ভারতীয় মন ‘more intuitive’। প্রকৃতিকে জয় করবার উদ্দেশ্যে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কে নিয়ত কর্মনিরত থাকায় মনের এই যাথাযথ্য ঘটেছে, যার প্রয়োজন গভীর। কিন্তু এও সত্য যে এই খুঁটিয়ে দেখাই চরম দেখা নয়—আধ্যাত্মিক অনুভবে উৎক্রান্ত হওয়াতেই সকল বুদ্ধির শেষ পরিণতি। তিনি আরো বলেন যে, যদিও ভারতবর্ষের পক্ষে বাস্তবকে অবহেলা করা উচিত নয়, চিন্তার যাথাযথ্যও প্রয়োজন, তথাপি ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবোধ পাশ্চাত্ত্য জগতের কাছে নূতন সম্পদ উপস্থিত করতে পারে। নিজের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দার্শনিক

---

[১] *M.R.*, August, 1921.

মতবাদটি এখন আবার পরিবর্তিত করে নূতনভাবে লিখছেন—কিন্তু এই মতবাদে তিনি ঘোরা পথে এসে পৌঁছেছেন—অর্থাৎ যেমন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে তারই সাহায্যে গড়ে তুলেছেন তাঁর তত্ত্বচিন্তা। এই কথা বলে তিনি কবির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, "কিন্তু আমার মনে হয় তুমি তোমার 'সাধনা' ও 'পার্সনালিটি'তে যে মত প্রকাশ করেছ তা অমন ঘোরা পথে পাওনি, তোমার কাছে সে সত্য একেবারে ধ্যানলব্ধ প্রত্যক্ষবৎ এসেছে। ভারতবর্ষীয় চিত্তের এই দিকের শক্তি আমার কাছে বিশেষ প্রবল মনে হয়।"[১]

কবির কাব্য ও বাণী বার বার পশ্চিমের মনকে নানাভাবে অভিভূত করেছিল। উপমাসংযুক্ত সুকুমারী ভাষা ও ভাব জাগিয়েছিল অনাস্বাদিত আনন্দরস। কবির বাক্য ও কাব্য সাহিত্যসম্পদে মনোহারী, কিন্তু তাই বলে মন জুগিয়ে কথা বলবার ইচ্ছা তাঁর নেই। যুদ্ধমিত্র জাতিগুলির মধ্যে ফ্রান্স বড় রকম সাম্রাজ্যবাদী। ফ্রান্সে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিতে কবি সে সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব পরিষ্কার করেই বলেছেন। এখানে তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতিতে সে কথা বোঝা যাবে। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে *Political Views* নামে ইংরেজি পত্রিকায় কয়েকদিন ধরে এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

"আমার কাছে আজ একথা বেশ পরিষ্কার হয়েছে যে পাশ্চাত্ত্য জগতে স্বাধীনতার ভাব বেশ লঘু হয়ে আসছে—তারই ফলে এসব দেশে দাস-ব্যবসায়ীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে—যারা অগণ্য পঙ্গু লোককে ব্যবসায়ের ও রাষ্ট্রীয় ঘানিতে বেঁধে চালাচ্ছে।. যেসব লোক তাদের আত্মাকে মুনাফা অর্জনের লোভের কাছে বলি দিয়েছে এবং শক্তিমদে মত্ত হয়েছে তারা একটু বিপদ অনুমান করলেই সন্দেহ ও ভয়ের ছায়ামূর্তির তাড়া খেয়ে ভয়ংকর নির্মম হয়ে উঠতে পারে...লব্ধ সম্পত্তিকে যে কোনো উপায়ে রক্ষা করার জন্য নিরন্তর দুশ্চিন্তা তাদের মনের ন্যায় ও স্বাধীনতাবোধের এমনভাবে মূলোচ্ছেদ করে দিচ্ছে যে তারা ক্রমাগত নিজের ও পরের জন্য শিকল তৈরি করে চলেছে।.."

বলাবাহুল্য কবির মনে ভারতবর্ষের পরাধীনতা, দাসত্বের কাহিনীই ভাষা নিচ্ছে। বিভিন্ন নির্দিষ্ট কাহিনীর ও প্রসঙ্গের অবতারণা না করেও শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধের বিকৃতি বুঝিয়ে চলেছেন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে।

"বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন—মনুষ্যত্বের এই মহামিলনকে সার্থক করতে হলে উদার দৃষ্টি, সৃষ্টিশক্তি ও কল্পনার

---

[১] *M.R.*, 1921. The Arch from East & West.

আবেগ চাই...আজ এ বিশ্ব পশ্চিমের কাছে নিবেদিত, সে যদি তাকে মানুষ তৈরি করবার কাজে না লাগায় তবে তাকে ধ্বংস করবে।...কিন্তু তবু এও সত্য যে পূর্ব ও পশ্চিমের এত দীর্ঘদিনের সংযোগেও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে কোনো উদারতা প্রকাশ পায়নি যাতে এ যুগের বিশেষ সার্থকতা ঘটে। যে একত্রিত শক্তি আজ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চূড়ায় বসে তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, আমি বলতে বেদনা বোধ করি সে একটি উত্তেজনা মাত্র, আদর্শ নয়।”

তাঁর বক্তব্যের উদাহরণস্বরূপ কবি আফ্রিকার কথা তোলেন। ফ্রান্সের অধিকারে আফ্রিকার কতক অংশ আছে। আফ্রিকান জাতির উপর সাম্রাজ্যবাদের মার কেমন করে পড়েছে সে কথার উল্লেখ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। ইংরেজের বিরুদ্ধে নালিশ করে বেড়ানো নয়, সভ্য জগতের দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি দেখানো। নালিশ করতে কবি সর্বদা অপারগ; অন্যত্র তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি কেবলমাত্র দুটি দেশে আলোচনা করেন, এক ভারতবর্ষে, আর ইংল্যান্ডে—যারা ভারতভাগ্যের বিপর্যয়ের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

কবি তাঁর বক্তব্যের উদাহরণস্বরূপ Gorgan & Sharp নামে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রকাশিত *Cape to Cairo* নামে একটি বই থেকে উল্লেখ করেছেন, “এঁরা প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, কাজেই এঁরা যে নীতি প্রচার করতে চান তাকে মতবাদরূপে দাঁড় করিয়ে উদাহরণ দ্বারা সম্পূর্ণ করে তোলবার শক্তি রাখেন।...আফ্রিকানদের বিষয়ে বলতে এই শক্তিশালী ব্যবসায়ীরা কিছু রেখে-ঢেকে বলেন না। তাঁরা পরিষ্কারই বলছেন, আমরা আফ্রিকানদের দেশ চুরি করেছি, এখন তাদের দেহও চুরি করব (We have stolen his land and now we must steal his limbs)। এই কথাটি পরবর্তী বক্তব্যে একেবারে পরিষ্কার বোঝা যায়—সামান্য একটু চক্ষুলজ্জা—যা হচ্ছে সমাহিত বিবেকের সূক্ষ্মীকৃত প্রেতমূর্তি, তারই খাতিরে লেখক সোজা কথায় যাকে দাসত্ব বলা যায় তাকে বাধ্যতামূলক কাজ (compulsory labour) বলছেন। যেমন আধুনিক রাষ্ট্রনেতারা ভদ্রতা করে possession-এর বদলে mandate কথাটি ব্যবহার করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক বললেন, compulsory labour আমাদের ঐ দেশের অধিকারের একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ (corollary)। তারপর আরো লিখছেন—‘এটা করুণ কিন্তু এই ইতিহাস’। একথার নিহিতার্থ শুধু এই হতে পারে যে নৈতিক বোধের মানব ইতিহাসে কোনো সত্য মূল্য নেই। আবার অন্যত্র তারা লিখছে, “হয় আমাদের এজন্যে ব্যবসায়ী বৃত্তি ছেড়ে দিতে হয়, নয় আফ্রিকানদের খাটিয়ে নিতে হয়। যাঁরা এই অচল অবস্থার নিন্দা করেন তাঁরা সত্যকে বদলে দিতে পারেন না—‘আমাদের’

শীঘ্রই স্থির করে ফেলতে হবে, 'আমাদের' অর্থাৎ আফ্রিকার শ্বেত মানুষদের স্থির করতে হবে আমরা কোন্‌টা করব।' এ বক্তব্যের যুক্তি সহজ, আত্মম্ভরিতার যুক্তি...এইসব লেখকরা ধরেই নিয়েছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতকায়দের একমাত্র ভাবনার কথা হচ্ছে কী করে নির্দিষ্ট কাল ধরে অস্ট্রিচ পালক ও হীরার খনির ব্যবসায়ে তারা মোটা হয়ে উঠবে এবং একই মানবসমাজভুক্ত একটা সমগ্র জাতির শুধু গায়ের রং পৃথক বলেই দুর্দশা ও অধঃপতনের উপর তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকবে। হয়ত তারা বিশ্বাস করে যে নৈতিক নিয়মের কোনো বিশেষ আরামপ্রদ সুবিধাজনক রীতি শাসকশক্তির সেবায় নিযুক্ত আছে।...

"মানুষের তো আত্মা আছে, মানুষ তো কেবল একটা টাকার বস্তা নয়, যে মুনাফা থেকে মুনাফান্তরে লম্ফ দিয়ে দিয়ে অন্য মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে চলাতেই সার্থকতা হবে।...তোমরা তো জান লাল ফিতে কখনো মানুষের মধ্যে সত্য বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে না। এবং যে ছাপানো নির্দেশ নোটিশ দেয়, কথা বলে না, তার মাধ্যমে কৃপাবর্ষণ হতে পারে কিন্তু মনের মিলন হয় না।...আমরা যদি মানুষের কাছ থেকে যথার্থ বাঞ্ছনীয় কিছু পেতে চাই, তাহলে নানা সরকারী কর্মের একত্রীভূত স্তূপের মধ্যে তা পাব না।... আর পাশ্চাত্ত্য জগতের যদি সত্যিই কোনো দেবার উপযুক্ত মহৎ সম্পদ থাকে তবে মানুষ হিসাবে সে সম্পদ দাবি করবার আমাদেরও জন্মগত অধিকার আছে। আমি তাই পাশ্চাত্ত্য জগতের কবিদের বিশেষভাবে বলছি যে তাঁদের সংগীতের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন আপনাদের কাছে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনসংগীত গান করেন।"

এই প্রসঙ্গে বলতে বলতে কবি বর্তমানে বণিকবৃত্ত সভ্যতার কবলে পড়ে গঙ্গার দুই উপকূলের চটকলের চিমনির ধূম্র-মলিন অবস্থার সঙ্গে তাঁদের বাল্যকালের গঙ্গাতীরের স্বচ্ছ নির্মল সৌন্দর্যের তুলনা করেন। কলকাতায় গঙ্গা আছে, অথচ গঙ্গার শোভা নেই, ব্যবসায়ীবৃত্তির কবলগ্রস্ত তার সৌন্দর্য—কবি কৌতুক করে বলছেন, "তোমরা হয়ত জান কলকাতা একটি upstart শহর...এর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যায়, প্রথমে ছিল দোকানের আত্মা, সে মেগাফোনের ভিতর দিয়ে ঘোষণা করলে 'অফিস হোক' (let there be office), অমনি জন্মাল কলকাতা।"

১৯২১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের রণাঙ্গন দেখে কবির মন কী রকম আর্ত হয়েছিল নানা স্থানে তার কিছু কিছু বর্ণনা আছে, সম্প্রতি রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থেও[১] তার উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সময়ে (২০/৪/২১) একজন

---

[১] The Edges of Time

দ্বিভাষী *Political Vieus* পত্রিকায় লিখছেন : "শ্রীযুক্ত ঠাকুর বলছিলেন —সেদিন ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম—ধ্বংসের বিকট নিঃশব্দ রূপ এখনও যন্ত্রণাকুঞ্চিত হয়ে আছে। মৃত্যু যুদ্ধের কুৎসিত আকৃতি কঠিন রেখায় মাটিতে মাটিতে চিহ্ন রেখে গেছে। এ দৃশ্য আমার মনের সামনে এক উৎকটাকৃতি রাক্ষসের মূর্তি নিয়ে এল, যার কোনো আকার নেই, অর্থ নেই, শুধু দুটি হাত আর বিবৃত মুখগহ্বর গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে আছে। আর আছে অতিস্ফীত মতলবদক্ষ মস্তিষ্ক। যেন একটি উদ্দেশ্য জীবন্ত শরীর পেয়েছিল, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতা পায় নি। জীবনের একটা প্রমত্ততা জেগেছিল যাতে প্রাণের সজীব স্বাস্থ্য ছিল না। এইরকমই একটি বেদনাদায়ক কণ্টকর মনের ভাব আমার মনে জাগে, এইরকম একটা সর্বশূন্যতার ভাব আমার মনে আসে যখন দেখি পূর্বদেশের মনের উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব কী রকম অসম্পূর্ণভাবে পড়েছে।...পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্ল্যান বা মতলব যখন মূর্তি ধরে অথচ মানবোচিত অতিরিক্ততা শূন্য হয়, অর্থাৎ যে সব প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবের মধ্যে মনুষ্যত্বের সার্থকতা তাকে ঢাকা দিয়ে কেবলই স্বার্থসাধনের রূপ নেয় তখন আমার তাকে এমনই সর্বনাশা মনে হয়...আমার সৌভাগ্য এই যে আমি পাশ্চাত্ত্য জগতে অনেক এমন ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি যাঁরা সেই দেবতারই সন্ধান করেন যিনি আমারও দেবতা।..."

ফরাসী কবি শিল্পী জ্ঞানী ও দার্শনিক বহু গুণিজনের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বর্ণনা আমার এ গ্রন্থে একত্র করা সম্ভব হল না। প্রধান বাধা ভাষার। রোমাঁ রোলাঁ, আঁদ্রে জিদ, সিলভাঁ ল্যভি দম্পতি, আঁদ্রে কারপ্লেস প্রভৃতি বহুজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যে কবির যে বিশেষ পরিচয় তার বিবরণ ফরাসী জানা থাকলে আরো কিছু সংগ্রহ করতে পারতাম। মহামতি এনড্রুজের ফরাসী থেকে অনূদিত Rene Ghil-এর একটি প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায় সেদেশে কী ভাবের আবেগ উদ্বেলিত হয়েছিল। কবির চিন্তা সূর্যালোকের মত কত মনকে উদ্ভিন্ন ঊর্ধ্বমুখী করে তুলেছিল সেই ভিন্নভাষাভাষী দেশে। 'ন্যাশনালিজম' নিবন্ধ রোমাঁ রোলাঁ কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের পূর্বেই ফরাসীতে অনুবাদ করেছিলেন। জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতা ঐ 'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধের বিষয়টি কিভাবে কবির মনে প্রথম জেগেছিল তা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

Rene Ghil লিখছেন :

"প্রভু, তোমার ছন্দিত বাক্যে প্রাচীনতম প্রজ্ঞার সঙ্গে মিশেছে আধুনিকতম চিন্তা...জাপানে টোকিও-র রাজবিদ্যালয়ে তুমি যে অভিভাষণ দিয়েছিলে

তোমার সে দেশকালের অতীত বাক্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আমাদের চোখ তেমন করেই খুলে দিয়েছে যেমন করে পূর্বদিকে উদিত হয়ে সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে পশ্চিমে পৌঁছিয়ে আমাদের নিদ্রাজড়িত চোখ খুলে দেয়।

"হে গুরু, আমি শুনেছি সেই আলোঝংকৃত গান। সে-গান মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মত আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তারপর আমাদের অতিক্রম করে চলে গেছে যেখানে নৈঃশব্দ্যের পূর্ণতার মধ্যে ধ্যানের আসন পাতা।... পশ্চিমের সভ্যতা থেকে আমার চিত্ত শুদ্ধ বিজ্ঞানে খুঁজেছিল পুষ্টি। সে-বিজ্ঞান বর্তমানের ধনিকের বাণিজ্যপরায়ণ পার্থিব বিজ্ঞান নয় যা আজ রক্তের পোশাক পরে ঘর্মাক্ত হয়ে ইয়োরোপের মর্মে ভয়াবহ ধ্বংস ও মৃত্যুর আঘাত হানছে—এ আমার সেই বিজ্ঞান যা এ বিশ্বের কবিতা, যেখানে আমি নূতন করে ঘোষণা করছি তোমার পবিত্র রচনার অনুবর্তী শাস্ত্র।

"এই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতে আমরা কবিতাকে ঘানিতে জুড়েছি, পার্থিব প্রয়োজনীয় আত্মাহীন যন্ত্রবিজ্ঞানকে করেছি তার সঙ্গী।...আমি এর মধ্যে প্রগতি দেখি না, দেখি পথভ্রষ্টতা, অতিকৃত অস্বাভাবিক কর্মচক্রে বাঁধা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় পশ্চিমের বোধে নৈতিক ও আত্মিক ভাব আজ ভ্রষ্ট। চিত্তের যে ভাবের প্রসারতায় মানুষ বিশ্বের সঙ্গে যোগ অনুভব করে তা বাড়তে পারেনি, যেমন করে বেড়ে উঠেছে অর্থসম্পদ—তাই সে সম্পদ অস্বাভাবিক।

"হে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা, তোমার দৃষ্টিতে আমি পেয়েছি আত্মবিশ্বাস, আমিও দেখেছি এশিয়ায় হবে আত্মার জাগরণ, যাকে তুমি বলেছ অমর আত্মা, তা মানুষের ইতিহাসে বারে বারে হবে সম্ভূত।

"তোমার বাণী যদি আজ সমস্ত এশিয়া গ্রহণ করে, যদি তোমার কণ্ঠস্বরে প্রেরণা পায় তবেই তারা কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য জগতের পুনরাবৃত্তি করার দৈন্য থেকে রেহাই পাবে।

"তোমার প্রাচ্য, পশ্চিমের সৃষ্ট বিজ্ঞানকৌশল গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের অতিশয় করে তুলবে না, তাদের দ্বারা অভিভূত না হয়ে নিজেকে রাখবে নিষ্কলঙ্ক ও তাদের ভারে মৃত না হয়ে অমর হয়ে থাকবে। আর আজ পাশ্চাত্ত্য জগৎ যাকে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়েছে, সেই সোনা-দেবতা ও সীসা-দেবতার কাছে যারা আত্মা ও দেহকে বলি দিয়েছে, তারা এই ভ্রমের জন্য কাঁদবে...এই যে বর্বর রীতি সৃষ্টি করেছে সেজন্য কাঁদবে...তোমার গভীর প্রজ্ঞা বুঝতে পারেনি বলে কাঁদবে...তোমাকে অনুসরণ করেনি বলে কাঁদবে।"[১]

---

[১] *M.R.*, 1920.

দুঃখের কথা আজও ফুরায় নি, পূর্ব-পশ্চিম কোথাও এই গভীর প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি গৃহীত হয় নি—পশ্চিমও কেঁদেছে, পূর্বের ক্রন্দন আরও মর্মান্তিক। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পার হয়ে গেল, দশদিক ক্রন্দনে পরিব্যাপ্ত করে মিথ্যা দেবতা আজ তাঁর বড় আশার ভারতবর্ষের মাঝখানে বসল অচল হয়ে।

এই সময়ে একটি সভাগৃহের বর্ণনা করে একজন যা লিখেছেন, তা কতকটা বর্তমান কালের running commentary-র মত। তার ভিতর দিয়ে আমরা একটি সুন্দর ছবি আজও দেখতে পাই—দূর মহাকালের সীমার ওপার থেকে তাঁর জনপ্রিয়তার একটি পূর্ণ সংবাদ ভেসে আসে।

"আমরা শুনেছিলাম—হিন্দুরা স্বভাবত গম্ভীর, তারা যেখানে সহানুভূতি পায় শুধু সেখানেই মন খোলে। ৪ঠা অক্টোবর ১৯২০ সালে এ কথাটা আমাদের সশঙ্ক চিত্তে স্মরণ হল—কারণ তখন আমাদের চারিদিকে আয়োজন চলছিল, একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটবার প্রত্যাশায় চারিদিকে উঠেছিল কলরব।

"কর্মব্যস্ত মানুষরা, যাঁরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী নন, তাঁদেরও অনেকেই দেখি ভিড় করে এসেছেন। 'প্যালেস দ্য জাস্টিস্' অর্থাৎ বিচারগৃহ, সেই সম্মেলনের স্থল, সেখানে রেলিং ধরে ঘেঁষে তাঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন। আটটা বাজতে বাজতেই মুখর এক জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল—সে বিস্তৃত সমুদ্ররেখা শ্বেতপাথরের দালান পার হয়ে বিচারকক্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিচারকক্ষের একটিও স্থান খালি ছিল না, টেবিল জানালা মঞ্চের সিঁড়ি সব জনাকীর্ণ...সেই উৎসুক, ব্যগ্র, কিন্তু নিস্তব্ধ জনতা মুহূর্তে মুহূর্তে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগল...ওরা কী মূর্তি দেখতে চায়? কাকে সভাপতি নিয়মানুসারে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন? অদম্য আগ্রহে ব্যগ্র জনতা একটু অধৈর্য হয়ে উঠছে, তাদের পাশ্চাত্ত্য ভাব যা এই দিনের জন্য একটু চাপা দিয়ে রেখেছিল তা সরে যেতে লাগল—এমন সময় একজন প্রবীণ তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কাঠের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেড়ার ওধারে ঘরের শেষ প্রান্তে...এক মহিমান্বিত রাজকীয় মূর্তি, শ্রেণীবদ্ধ জজ এবং ব্যারিস্টারদের ভিড়ের ওপারে উঠে দাঁড়ালেন– তিনি তাঁর চশমাটি খুলে ফেললেন। বিচ্যুত চশমাটি তাঁর বৃহৎ বেগনি রঙের আঙরাখার গায়ে বিলগ্ন হয়ে আকাশে তারার মত জ্বলতে লাগল...আমাদের চোখের সামনে আবির্ভূত হল একটি মুখ—সে মুখ খৃষ্টের মত, তেমনি ব্রোঞ্জ রঙে আঁকা তেমনি সমাহিত তেমনি অভাবনীয়—তখনি অদৃশ্য হয়ে গেল আমাদের

সামনে থেকে জজ-ব্যারিস্টারদের শ্রেণী, রইল না কোনো ব্যক্তিবিশেষ, সমগ্র জনতার মধ্যে শুধু রইল মানবসত্তা, উৎকর্ণ জাগ্রত, আর তাদের মধ্যে উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রকুঞ্চিতকেশদামমণ্ডিত মুখশ্রী, এক মহাপুরুষ। কবির দীর্ঘ দেহে, তাঁর ভঙ্গীতে প্রভুত্বব্যঞ্জনা।...

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাণী ইংরেজিতে পড়লেন—'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন'।

"তাঁর দীর্ঘ পরিচ্ছদের হাতার থেকে একখানি হাত বেরিয়ে এল, সে হাতেরও ভাষা আছে। বক্তৃতা করতে করতে মাঝে মাঝে সামনের রেলিং চেপে ধরছিলেন। তিনি সামান্যই নড়ছিলেন, কিন্তু তার প্রত্যেক ভঙ্গীতে ছিল বিশেষত্ব, নমস্কারের সযত্ন সুচিন্তিত ভঙ্গীর সৌজন্য যেন ধর্মকার্যের মত সুচারু...তিনি কথা বলছিলেন, আর মাঝে মাঝে একহাতের বদ্ধমুষ্টি থেকে আঙুলগুলি খুলে যাচ্ছিল—তারা শূন্যে কোনো আকার নির্দেশ করল আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে সামনের ডেস্কের উপর স্থির হয়ে রইল। শুধু ডান হাতের ভঙ্গীই সচল, অন্য হাতে তিনি একগুচ্ছ কাগজ ধরেছিলেন। এই অন্যতীরাগত দূত যে ভাষা উচ্চারণ করছিলেন সে ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা...মাঝে মাঝে তিনি বাংলা কবিতাও আবৃত্তি করছিলেন...তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমাদের মনে হল আমরা যেন মুক্ত বাতাসে আকাশের নীচে প্রকৃতির মধ্যে চলে গেছি...কবির সেই নিভৃত নিকেতন বোলপুরেই পৌঁছে গিয়েছি...

"মাঝে মাঝে কথার স্বর ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছিল—আবার করুণায় দ্রব হয়ে আসছিল...সে কারুণ্যের প্রভাব আমাদের Comedie Francaise-এর নাট্যকারদের মত নয়। তার মধ্যে কিছু ছিল না যার সঙ্গে আমাদের মেলোড্রামার তুলনা চলে...কিংবা হাইড পার্কের উত্তেজিত বক্তৃতার মতও [illegible] নয়. তাঁর বক্তৃতায় তেমনি বাঁধাধরা থামা ও জোর দেওয়ার রীতি ছিল না...এই হিন্দুর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার, শুদ্ধ...সে স্বরে ঘোষিত হচ্ছিল সত্য—সভাগৃহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেকে তাঁর কথা শুনতে পেয়েছিল।"১

---

১ *M.R.*, Jan., 1921.

ইটালি

মুসোলিনির রাজত্বে কবির ইটালি ভ্রমণ অতিসমারোহে আরম্ভ হয়েও এক অপ্রিয় সমাপ্তি ঘটেছিল—রবীন্দ্র-জীবনীতে তার বিবরণ আছে, এখানে আমরা তার সামান্য আলোচনা করব, বিশদ আলোচনা অসম্ভব—কারণ ইটালিতে প্রকাশিত কাগজপত্র আমাদের কারুরই হাতে নেই, রবীন্দ্র-জীবনীকারও তার সন্ধান পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।

১৯২৫ সালে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের মুখে ইটালির নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে কবি সেখানে আসেন। সে সময়ে মিলান, জেনোয়া প্রভৃতি কয়েকটি শহরে বক্তৃতা দেন ও বহু সমাদরে অভ্যর্থিত হন। টুরিন, ভেনিস, ফ্লোরান্স সর্বত্রই তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য প্রবল উৎসাহ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু কবির শরীর অসুস্থ। ল্যাটিন আমেরিকাতেই আরদ্ধ কাজ সমাপ্ত হতে পারেনি, কাজেই পুনর্বার আসবার আশ্বাস দিয়ে তিনি ইটালির বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেন। মিলানে কবির বক্তৃতায় মানবতা ও বিশ্বমৈত্রীর কথায় ইটালিতে তাঁর বক্তৃতা জনপ্রিয় হয়নি ও সেই কারণে তাড়াতাড়ি ইটালি ত্যাগ করেন, এইরকম একটি গুজব উঠেছিল, কিন্তু সেই সময়ে ইটালিস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে কবির সমাদরের প্রভূত বিবরণ ও অধ্যাপক ফর্মিকির সুন্দর অভিনন্দনে ও বর্ণনায় সেসব গুজবের অসত্যতা প্রমাণ হয়েছিল। কবির বক্তৃতার কিছু কিছু প্রতিবাদ নিশ্চয় হয়েছিল—তেমন তো সর্বত্রই হয়েছে। ইটালির লেক কোমোতে বন্ধুরা তাঁর জন্য একটি বাড়ি ঠিক করে রাখবেন, প্রতি বৎসর ইটালি যাওয়া হবে—এমনই এক প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে আনন্দিত হয়ে কবি দেশে ফিরে আসেন।

রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখছেন—“কবিকে ইটালি যাইতে দেখিয়া এদেশের ও বিদেশের লোকে একটু বিস্মিত হইয়াছিল...তথাচ রবীন্দ্রনাথ কখনই মুসোলিনির পদ্ধতিকে সমর্থন করিতে পারিবেন না একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন।”

‘সকলেই’ শব্দে কতদূর ব্যাপকতা বোঝা যায় তা আমাদের জানা নেই। সে সময় মুসোলিনির রাজত্বকালের সগৌরব আরম্ভের যুগ। তিনি ফ্যাসিস্ট দলকে সুসংবদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন। বিপর্যস্ত অনিয়ন্ত্রিত অথচ মহান একটি দেশের ভাগ্য এক বিরাট পুরুষের হাতে, এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের বিধানে সুনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, স্বাধীন হয়ে উঠছে, স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষে তা আদর্শরূপেই গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন ইংরেজ সমর্থিত ও

সরকারের সমর্থনকারী কাগজগুলি—যেমন *Statesman* বা *Pioneer*—এরাই মুসোলিনি-বিরোধী ছিল। 'মডার্ন রিভিউ'র মত পত্রিকা যা তখনকার চিন্তাশীল দেশানুরাগী ভারতীয় মনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক, সে কাগজে মুসোলিনির প্রশংসাসূচক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৫ সালের 'মডার্ন রিভিউ'তে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে মুসোলিনির কথা আলোচনা করা হয়েছে—

"সিনর মুসোলিনি তাঁর মতানুবর্তী দলের মধ্যে কঠিন নিয়মানুবর্তিতার প্রবর্তন করছেন, অস্ত্রশস্ত্র রাখা নিশ্চিত অনুমোদনসাপেক্ষ ও কোনো শোভাযাত্রায় অস্ত্র নিয়ে যাওয়া তিনি নিষেধ করেছেন।"

ডাঃ তারকনাথ দাস লিখছেন—"মুসোলিনি ইটালির মহাকর্মযোগী। মুসোলিনি ইচ্ছা করেন যে ফ্যাসিস্ট সৈন্যরা অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে ইটালির সেবা করবে—শুদ্ধ মনে, গভীর আদর্শবাদে একনিষ্ঠ হয়ে, বিশ্বাস স্থির রেখে, সর্বপ্রকার সুযোগ ও সাবধানতা উপেক্ষা করে—কারণ সুযোগের অপেক্ষা করা ভীরুতারই প্রকারভেদ—তার বিশ্বাসের চরম সার্থকতা হবে আত্মবিসর্জনে, ত্যাগে।"[১]

এই সংখ্যাতেই মেত্তি-ওতির হত্যার বিচারের খবর প্রকাশিত হয়। যে মেত্তি-ওতির হত্যার বিচার বা বিচারের প্রহসন ব্যাপারই মুসোলিনির বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগরূপে সর্বত্র আলোচিত হয় ও সেই অবিচারের সমগ্র বিবরণ শুনে কবি ফ্যাসিজমের স্বরূপ দেখতে পান। কিন্তু সেই খবরটি যখন প্রকাশিত হয় তখন 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদক লিখছেন · "আমরা ব্রিটিশ এজেন্সি মারফত খবর পাই, সত্য মিথ্যা জানি না, তাই দুই পক্ষের খবরই ছাপিব।" 'মডার্ন রিভিউ'র বিচক্ষণ সম্পাদকের এ সাবধানতা অমূলক নয়, কারণ ঐ সময়ে শক্তিশালী ইংরেজ ইটালির এই অভ্যুত্থান, ইয়োরোপের রাষ্ট্রমঞ্চে একজন সুদক্ষ নেতার আবির্ভাব, সুচক্ষে দেখেনি। মুসোলিনিও ইংরেজের অনুরাগী ছিলেন না, চোখা চোখা সত্য-শাণিত বাক্যবাণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তখন আমেরিকা প্রভৃতি ইংরেজের মিত্রদেশগুলিতে 'ভারতে ফ্যাসিজম্', ও 'ভারতে ফ্যাসিজমে ইংরেজের সংকট' ইত্যাদি নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। তার মধ্যে শান্তিনিকেতনে ইটালির প্রফেসরদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিতও থাকত। 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদক সে সমস্ত ইঙ্গিতের কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ করেন। ভাবতবর্ষের দেশীয় কাগজগুলিতে সর্বদাই মুসোলিনির প্রশংসা-

---

[১] *Modern Review*, June, 1926.

পূর্ণ নানা কীর্তির আলোচনা হয়েছে। অতএব এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের ইটালি যাত্রা খুব কিছু বিস্ময়কর বা অসম্ভব ঘটনা নয়।

“ইটালি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীর প্রশংসাপত্র জগৎসমক্ষে পেশ করিবার জন্য (মুসোলিনি) এইসব জাল বিস্তার করেন।” (রবীন্দ্র-জীবনী, তৃতীয় খণ্ড)।

আমরা এ মন্তব্যও সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারি না। ১৯২৫ সালে ইটালি থেকে ফিরে আসবার পরেই কবির নিমন্ত্রণে ফর্মিকি বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে আসেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ, ইটালির নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর মারফত মুসোলিনি বহুমূল্য ইটালীয় বইয়ের একটি বিরাট সংকলন উপহার পাঠান। জার্মানিও এই রকম বইয়ের সংকলন কবিকে উপহার দিয়েছিল। এর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কৌশল অনুমান করবার হেতু নেই। ফর্মিকি ভারতবর্ষে বাসকালে নানা প্রবন্ধে বক্তৃতায় ইটালিতে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার বর্ণনা করেছেন :

“আমাদের দুই দেশেব (ভারত ও ইটালির) প্রকৃতিগত মিলের প্রমাণ দেখা যায় ইটালিতে রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত সমাদরে। ঠাকুর আপনাদের কাছে যতখানি প্রিয় আমাদের কাছেও ততখানিই। কোনো কোনো ইটালিয়ানের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা একেবারে পূজার রূপ নিয়েছে।...ইটালি যে তাঁকে কি রকম ভক্তি করে কবি বোধহয় তা সম্পূর্ণ জানতেন না। তা না হলে সে দেশে আসতে তিনি এত দেরি করতেন না। আমার মনে আছে যখন তিনি দক্ষিণের দিকে না এসে উত্তরে নরওয়ের দিকে চলে গিয়েছিলেন, আমার দেশবাসীদের মনে এসেছিল কী গভীর হতাশা। অবশেষে এ বছর আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ইটালিতে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার। প্রত্যেক শহরই তাঁকে আগে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত—এ নিয়ে বিভিন্ন শহরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিদের মধ্যে তর্কাতর্কি মনোমালিন্য—ঠাকুর জেনোয়াতে পরিচয় না দিয়েই নামলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত শহরে তুমুল শোরগোল পড়ে গেল .কাগজে কাগজে শিরোভূষণে জানাল অভ্যর্থনা।

“...আমি তো ভাবতেই পারতাম না জেনোয়ার মত শহর, যেখানে খালি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য, সেখানে কবিত্ব এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে।...

“আমি জীবনে কখনো রেলওয়ে স্টেশনে কবির বিদায়দৃশ্যটি ভুলব না। যখন তিনি মিলান যাত্রার জন্য ট্রেনের দিকে.এগিয়ে চলেছিলেন সমস্ত কুলি ও স্টেশন কর্মচারীরা সহজাত বুদ্ধিবশে (instinctively) পথ ছেড়ে দিয়ে

এমনভাবে প্রণত হচ্ছিল যেন তাদের সামনে দিয়ে কোনো সম্রাট চলেছেন। শুধু জেনোয়াতে নয়, মিলানে ও ভেনিসে সর্বত্র আমি নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও তোমাদের কবির প্রতি গভীর ভক্তির ভাব দেখেছি—দেখে আমার মনে পড়েছে বুদ্ধের কথা—পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে যা পড়েছি, বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী নগরের পথ দিয়ে চলতেন তখন দুধারে জনতার মধ্যে যে বিস্ময় ও ভক্তি উদ্বেলিত হয়ে উঠত সেই বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথকে ইটালির জনপথে দেখে আমার মনে হয়েছে একথা মিথ্যা নয় যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।...কার্লাইল বলেছেন যে মহতের প্রতি ভক্তি মানবচরিত্রের মূলগত, বস্তুতান্ত্রিকতা বেড়ে গেলেই এর অভাব ঘটে এবং তাতেই বিনাশের সূচনা দেখা যায়...তাই সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে কবির প্রতি এ পূজার ভাব দেখে আমার দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশাই বেড়ে ওঠে...একটা ঘটনা কোনো দিন ভুলব না—সে সময়ে মিলানে হোটেলে কবি অসুস্থ হয়ে আছেন, একজন নিম্নশ্রেণীর লোক চার বোতল 'মিনারেল ওয়াটার' নিয়ে এসে উপস্থিত, তার ধারণা ঐ জল খেলে তার প্রিয় কবির অসুখ সারবেই। এক দিকে অগণ্য জনসাধারণের ভক্তি এইভাবে কবির প্রতি উৎসর্গিত হয়েছে, আবার অন্যদিকের একটি ঘটনাও বলি, অভিজাত Scala থিয়েটার-গৃহে কেবল ধনী লোকেরই ভিড় জমে। তাঁরাও দেখেছি বক্সে কবি বসে আছেন বোঝামাত্র উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করে উঠতেন। এর ফলে বহুদিনাগত একটি নিয়ম যে "অপেরা গৃহে" হর্ষধ্বনি করা হবে না সে নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যেত।[১] আমার মনে আঁরো শত শত ঘটনা ভেসে আসছে—কবির প্রতি ইটালির শ্রদ্ধার উদাহরণ।...

ইটালির এই যে শ্রদ্ধা—এ নিশ্চয় মুসোলিনির আদেশক্রমে হয়নি... জার্মানিতে যা ঘটেছে, ক্যানাডায় যা হয়েছে, এ তো তারই প্রতিরূপ। মুসোলিনি রেলস্টেশনে কুলিদের প্রণত হতে শিক্ষা দেননি। ভারতবর্ষের কবির প্রতি সমস্ত দেশের এই আন্তরিক অনুরাগ প্রত্যক্ষ করে তিনি তাতে আনুকূল্য করেছিলেন মাত্র। কারণ ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর নিজেরও বিমুখতা ছিল না। অধ্যাপক ফর্মিকি মুসোলিনির আদেশক্রমেই এসেছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ধাত্রী ইটালিয়ার সঙ্গে মহান ভারতবর্ষ পৃথিবীর সভ্যতার ধাত্রীর" মিলন ঘটানো। অধ্যাপক ফর্মিকির পর অধ্যাপক তুচি এলেন। তাঁদের উভয়ের সারাজীবন ভারতীয় শাস্ত্রালোচনায় নিবেদিত। আজ পর্যন্ত অধ্যাপক তুচি সেই কাজে নিযুক্ত থেকে প্রমাণ করছেন যে তাঁরা কারু চর মাত্র ছিলেন না, অধ্যাপক তুচি

---

[১] এ নিয়মের কথা ইয়োরোপের অন্য কোথাও শোনা যায়নি।

বলছেন, "আমরা যতই কবিকে দেখছি ততই ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের আকর্ষণ প্রবল হচ্ছে।...যে দেশের মানুষ তাঁর কথা বুঝতে পারে সে দেশের আধ্যাত্মিক ভাব ও বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য আধুনিক সভ্যতায় একটি বিশেষ স্থান নেবেই।"...

অতএব এর পর ফর্মিকির নিমন্ত্রণে কবি যদি ইটালি যাওয়া স্থির করেন, এমনকি মুসোলিনির নিমন্ত্রণও যদি গ্রহণ করেন, তাতে সমস্ত দেশের বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ঘটনাটা যা ঘটেছিল তার সঠিক বিবরণ 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকের নিখুঁত কলমে যেমন বর্ণিত আছে তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আর কিছু হতে পারে না!

"১৯২৬ সালের মে মাসে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কবির পুনর্বার ইটালি গমনের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ইটালি যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবদ্বয় দেখলেন ইটালীয় সরকার এ বিষয় অত্যন্ত অনুকূল। তাঁরা কবির ইটালি ভ্রমণের সর্বরকম সুবিধা করে দিতে প্রস্তুত। ইটালীয় জাহাজের ক্যাপটেন ও কর্মচারিবৃন্দ জাহাজে অতিশয় সমাদর, সরকারী অতিথির যোগ্য সম্মান দেখিয়েছিল। যখন জাহাজ নেপলস-এ পেঁছল তখন মুসোলিনি কবিকে সরকারের আতিথ্য গ্রহণ করতে নিমন্ত্রণ করলেন। সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হল। স্পেশাল ট্রেনে করে কবিকে (ও কবির ভ্রমণ-সহচরদের) রোমে নিয়ে যাওয়া হল।.. বিশ্বভারতীর সচিবদের কাছ থেকে যে বিবরণ পাচ্ছি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ইটালীয় সরকার কবিকে রাজোচিত সংবর্ধনা জানিয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইতিপূর্বে অন্য কোনো ভারতীয় বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে এমন প্রভূত সম্মান পাননি।...ভারতবর্ষ থেকে ইটালি অভিমুখে যাবার সময় কবি অবশ্য সরকারী আতিথ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বিশ্বভারতীর সচিবদিগের প্রদত্ত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে কবির মত পরিবর্তনের কারণ যাই হোক না কেন, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে ইটালিতে পরিচিত করবার পক্ষে এ কাজ উপযুক্ত হয়েছে।" তারপর ইটালিতে কবি-সংবর্ধনার বিপুল সমারোহের বিশদ বর্ণনা ও ভাষণের উত্তর-প্রত্যুত্তর, মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদির সমস্ত ঘটনার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। মুসোলিনি বলেছিলেন আপনার যে কটি বই ইটালীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি যে পড়েছে আমি আপনার তেমনি একজন ইটালীয় ভক্ত। সমস্ত কাগজে কবিসংবর্ধনার খবর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। দু-একটি বিরোধী মতও ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন যে প্রাচ্য দর্শন পাশ্চাত্ত্য কর্মময় সভ্যতার গ্রহণযোগ্য নয়, এসব বিষয় অন্যত্র যেমন ঘটেছে এখানেও তাই। কবি যখন ভারত ও ইটালির সম্বন্ধের মধ্যে মৈত্রী ও পরস্পরের সাহায্য কামনা

করে ইটালির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করলেন তখন বিখ্যাত কাগজ *The Tribune* লিখল—"কাগজের পাতা থেকে পাতায় মানুষের মুখ থেকে মুখে এশিয়ার দূরতম প্রান্তে কবির বাণী পৌঁছাবে, আশা করি সে বাণীতে যে আশা উচ্চারিত হয়েছে তা সত্য হবে।" রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিসংবর্ধনার বিপুল সমারোহ ব্যাপার—শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই এক প্রাচীনতম ভূমিতে কবি বিদেশী নন, পরমাত্মীয়রূপে অভ্যর্থিত যাঁরা তা স্বচক্ষে দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছেন সে কাহিনী তাঁরা নিশ্চয় সময় মত বাংলা দেশের জনসাধারণকে জানাবেন।" 'মডার্ন রিভিউ' আরো লিখছে :

"কবি প্রতিশ্রুত ছিলেন বলেই ইটালি গিয়েছিলেন, ইটালীয়ান সরকারের কাছ থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ হঠাৎও আসেনি বা পূর্বব্যবস্থামতও ঘটেনি, ঘটনাচক্রে স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। আমাদের ধারণা ছিল যে মুসোলিনির নেতৃত্বে ইটালিতে 'ন্যাশনালিস্ট' রাজত্ব চলেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি মনে করেন তাঁর বিশ্বকল্যাণকার্যের কোনো বাধা হবে তাহলে সরকারী নিমন্ত্রণ কখনো নেবেন না। যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, অন্তত আমাদের তাই ধারণা, যে তিনি সরকারী আতিথ্য নেবেন না। কী করে পরে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষরা (সচিবদ্বয়) তাঁকে এ আতিথ্য নিতে মত করিয়েছিলেন তা জানি না, হয়ত তাঁদের আশা ছিল এতে বিশ্বভারতীর সাহায্য হবে এবং সেইজন্যই তাঁরা কবিকে এই 'speculative step' নিতে প্ররোচিত করেন। আমাদের বরাবরই একটু আশঙ্কা ছিল, কিন্তু আমরা তাঁর পরামর্শদাতাদের বিবেচনার উপর নির্ভর করেছিলাম। কার্লো ফর্মিকি, অধ্যাপক তুচি, প্রশান্ত মহলানবিশ, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁরা সকলেই ছিলেন। আর আশা করেছিলাম শক্তিশালী ইটালীয় সরকারের প্রীতিতে বিশ্বভারতীর কার্য প্রশস্ততর হবে। ইটালি থেকে যখন প্রভূত ও উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা, রাজকীয় অনুষ্ঠানের খবর আসতে লাগল, সর্বত্র যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের আদর্শ প্রশংসিত হচ্ছে বলে শোনা গেল—পৃথিবীর নানা স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠা হবার আলোচনা শোনা গেল, তখন কবির আশাও বেড়ে গেল এবং কবির সাহায্যকারীদের উপর আমাদের বিশ্বাসও বেশী হয়ে উঠতে লাগল। ইটালিতে কবির সংবর্ধনা বিরাট ব্যাপার হয়েছিল, যদিও কোনো সোশালিস্ট বা কোনো কমিউনিস্ট এদিকে ওদিকে 'খুনী' মুসোলিনির আতিথ্য গ্রহণ করায় কবির নিন্দা করছিল তবু সমগ্র ইয়োরোপ চমৎকৃত হয়েছিল যে দাসজাতির একজন মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আত্মম্ভরি জাতির মধ্যে এমন উচ্ছ্বাস জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।.. কয়েক দিনের মধ্যে কবি ইটালির হৃদয় জয় করেছিলেন, এটা ছলনা নয় বা তোষামোদ

নয়। এমন জাতির সঙ্গে ছলনাময় মিথ্যা হৃদ্যতা দেখিয়ে কী হবে যারা অর্থ সামর্থ্য অস্ত্র কোনো কিছু দিয়েই যুদ্ধের সময় বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না। দুই দেশের দুঃখের ইতিহাসই এই সমবেদনার মূল—রবীন্দ্রনাথ নব্য ভারতের দূত হয়ে গিয়েছিলেন, ইটালি তারই সংবর্ধনা করেছে। এখন মানব-প্রেমিকের (Humanist) ফ্যাসিস্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের করমর্দন করা উচিত কিনা আমরা সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু ইটালিয়া ভারতের হাত ধরেছে, এতে আমরা আনন্দে পূর্ণ হয়েছি।”[১]

এর পরই সি এফ্ এনড্রুজের কাছে ফ্যাসিস্ট মতবাদের নিন্দা করে লেখা কবির একখানি চিঠি প্রকাশিত হলে, ‘মডার্ন রিভিউ’ অন্তত সে সংবাদ প্রথমে অবিশ্বাস্য ভেবেছিল।

ইটালি থেকে কবি সুইট্জারল্যান্ডে প্রবেশ করলেন। রোমাঁ রোলাঁর চিঠিপত্রে বোঝা যায় তিনি অধীর হয়ে কবির জন্য অপেক্ষা করছিলেন—ফ্যাসিজমের ভয়ানক গহ্বর থেকে কবিকে কী করে উদ্ধার করা যায়। এই সময়ের অনেক বর্ণনা রোমাঁ রোলাঁর ‘ইন্ডিয়া’ নামে ডায়রিতে আছে, অবশ্য সেখানে সবটা ঘটনাই তাঁর নিজের দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে রূপ নিয়েছে। তিনি লিখেছেন

“প্রথমেই ইটালিয়ান ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে কথা উঠল। মহলানবীশ ঠাকুরের ইটালিয় বন্ধুদের সম্বন্ধে কঠোর মতামত প্রকাশ করলেন। বিশেষ ফর্মিকি সম্বন্ধে তাঁর মতামত, মন্তব্য খুবই কড়া। তিনি ফর্মিকির দুর্বল চরিত্র ও মুসোলিনির প্রতি তাঁর দাসোচিত মনোবৃত্তির কথা বললেন। কবির সঙ্গীদের কথায় আরো বুঝলাম যে কবি মুসোলিনির প্রভাবে পড়েছিলেন কারণ মুসোলিনি ঠাকুরের সঙ্গে খুব সহজ সাধারণ ব্যবহার করেছিলেন। তবে এঁরা মুসোলিনিকে দেখবার সুযোগ পান নি। ..”

এর থেকে বোঝা যায় কবির সঙ্গীরা ইটালি ছাড়তে ছাড়তেই মুসোলিনির অন্যায়গুলি বুঝে ফেলেছিলেন, কিন্তু কবির বুঝতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল।

রোমাঁ রোলাঁর ডায়রি থেকে আর একদিনের কথার কিছু উল্লেখ করছি, ঐ দিন কবির সঙ্গে তাঁর কথা হয়। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, কবি জানালার দিকে মুখ করে একটি বড় চেয়ারে বসে আছেন—তাঁরা সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। রোমাঁ রোলাঁর মন কবির প্রতি অতি-অপ্রসন্ন—এমনকি তাঁর মনে হচ্ছে ইয়োরোপীয় সংগীতেরও কবি কিছুই বোঝেন না—যাহোক সংগীতের আলোচনা চলছিল, হঠাৎ কবি ইটালি ভ্রমণ ও ইটালিয় ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিলেন। তিনি বললেন,

---

[১] *M.R.*, Sept., 1926.

সরকারী নিমন্ত্রণ গ্রহণে প্রথমে তাঁর দ্বিধা ছিল। ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে জাহাজে ক্যাপটেনের সঙ্গে প্রথমে তাঁর আলোচনা হয়—পরে ইটালিতে বন্ধুরা সকলেই ঐ রাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করেছেন তাঁরা বলেছেন বর্তমানে সে দেশের পক্ষে এ ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন—কারণ জনসাধারণের যোগ্যতা নেই রাজ্যশাসনের (অর্থাৎ ডেমোক্রেসি চলবার উপযুক্ত হয়নি দেশ—এ কথার সত্যতা আজ কতকটা অনুমান করতে পারি)—শান্তি সুশৃংখলা বজায় রাখবার জন্য এ ব্যবস্থা বর্তমানে ভালই হয়েছে। কবি আরো বলছেন, তাই যদি সত্যি হয়, লোকের যদি সে যোগ্যতা না থেকে থাকে, যদি বিপর্যয়, হানাহানি ও মৃত্যু পরিণাম ঘটে, তার পরিবর্তে কঠিন হস্তে কোনো শাসক যদি ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং তাতে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুকালের জন্য খর্ব করেও সমগ্র দেশের উপকার হয়—তবে এমন ক্ষতি কী?...

রোমাঁ রোলাঁ কবির এই স্বগত বিতর্কে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। তিনি লিখছেন :

"আমি নীরবে এই কথা শুনছি—কবি ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে কথা বলছেন, তাঁর কথার খেই হারিয়ে যাচ্ছে। এসব কেন তিনি বলছেন। না কি তাঁর নিজের কথা শুনতে নিজের খুব ভাল লাগছে তাই বলে যাচ্ছেন।" অন্তত রোমাঁ রোলাঁর একটুও ভাল লাগেনি। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হচ্ছে, ভিতরে ভিতরে তিনি কাঁপছেন, অবশেষে তিনি বললেন—'কবি শোনো, আমি তোমাকে বলছি—শহীদ ইটালির পক্ষ থেকে তোমাকে বলছি—যারা অত্যাচারিত হয়েছে তাদের কথা তোমাকে বলব—তাদের কথা শোনা চাই।'

রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থে আমরা জানতে পারি যে রোমাঁ রোলাঁর এই আবেগপূর্ণ ভাষণেও কবি তখনি কোনো প্রকাশ্য মতামত দেননি। কবি শুনলেন, তাঁর নিজের বক্তৃতা ও ভাষণের বক্তব্যের মোড় ফিরিয়ে ইটালিয় অনুবাদে অর্থের পার্থক্য করা হয়েছে। ক্রোচের মত দার্শনিক পর্যন্ত নজরবন্দী। তথাপি কবি শুনে যাচ্ছেন নীরবে। তিনি মুসোলিনির মধ্যে তাঁর বহুদিনের একটি আদর্শ দেখতে চেয়েছিলেন। বরাবর তাঁর বক্তব্য Organization-এর চেয়ে Personality বড়। সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তারই মধ্যে সৃষ্টির প্রাণক্রিয়া আছে—আর নিয়ম ও আইনের শৃংখল দিয়ে যে দল বাঁধা তা যান্ত্রিক গঠন, তা প্রাণমূলক নয়। বহু প্রবন্ধে-ভাষণে এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর স্বগঠিত প্রতিষ্ঠানেও যান্ত্রিক নিয়মের চেয়েও মানুষের প্রাণপ্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য হয়েছে—দুর্দশাগ্রস্ত ইটালি এক শক্তিমান মানুষের চিত্তশক্তিতে প্রাণ পাচ্ছে, বেঁচে উঠছে এই আশাই তাঁর মনকে ইটালির নব

শাসনের অভিমুখে কিছুদিনের জন্য অবশ্যই অনুকূল করে থাকবে। তারপর যখন ক্রমে ক্রমে নানা নিষ্ঠুর কাহিনী শুনলেন, ইটালি থেকে বিতাড়িত, অধ্যাপক সলভাদারির স্ত্রী ফ্যাসিজমের অত্যাচারের বর্ণনা করলেন, বিতাড়িত, অত্যাচারিতদের পক্ষ থেকে অনেকেই যখন মুসোলিনির নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিয়ে গেলেন, তখন ব্যক্তিত্বের অন্যদিকটা সহসা সমস্ত বিপদ নিয়ে তাঁর গভীর বিশ্বাসকে আঘাত করল।

রবীন্দ্র-জীবনীতে ইটালি প্রসঙ্গে আছে—"একথা ভুলিলে চলিবে না যে রবীন্দ্রনাথ কবি। স্পর্শচেতন মন উত্তেজিত হইতেও যতক্ষণ শান্ত হইতেও ততক্ষণ।" সাধারণভাবে কবিচিত্তের এই বিশ্লেষণ বর্তমান প্রসঙ্গে সমর্থন-যোগ্য কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্র-জীবনীতেই যে বর্ণনা আছে তাতে আমরা বুঝতে পারি—রবীন্দ্রনাথ অতি সাবধানে চলেছিলেন, মুসোলিনির ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু ফ্যাসিজম সম্বন্ধে কোনো মত দেননি। রোমাঁ রোলাঁর ডায়রি পড়ে বুঝতে পারি রোমাঁ রোলাঁর মত বন্ধুর বিরাগভাজন হয়েও তিনি নিজের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারের পর্যালোচনা করছিলেন—যদিও সঙ্গীদের মধ্যে যাঁরা কবি নন, কাজেই 'স্পর্শচেতন' হওয়ার যাঁদের বিশেষ কারণ নেই, এবং যাঁরা 'মডার্ন রিভিউ' অনুসারে সরকারী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে কবিকে রাজী করান তাঁরা কিন্তু কবির পূর্বেই ফর্মিকি ও মুসোলিনির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বব্যাপারের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কবি অত্যন্ত সাবধানেই চলেছেন বলে মনে হয়—স্পর্শকাতর মনকে দপ করে জ্বলে ওঠার মত লাগাম ছেড়ে দেননি। মহারথীর হাতে রশ্মি ছিল। তবু যে ব্যাপারটা ঘটে গেল তা অপ্রিয়। তা সত্ত্বেও এ হঠকারিতা নয়, যে সত্য তাঁর অজ্ঞাত ছিল তা জেনে বুঝে নিজের ভ্রম ঘোষণা করা সৎসাহস বলেই আমরা মনে করি।

এনড্রুজের কাছে ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে লেখা চিঠিখানি প্রকাশিত হলে সকলেই বিস্ময়বিমূঢ়। এত সমারোহের খবরের পরেই কবির এই প্রকাশ্য বিরূপতা ভারতবর্ষে অনেকেরই ভাল লাগেনি। মনে হয় 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকেরও নয়। সে সময় অনেকেই বলেছিলেন যে এত সমাদর ও অভ্যর্থনা ভোগ করার পরেই এমনভাবে নিন্দা করা অশোভন হয়েছে। কবিকে অনেক কটুবাক্য শুনতে হয়েছিল, এবং এই অভিযোগের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা নিশ্চয় তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনকে পীড়া দিয়ে থাকবে। আমাদের মনে হয় বন্ধুবান্ধবের মতের চাপ যদি না থাকত কবির প্রতিবাদ তাহলে এমন নাটকীয় পরিণতির রূপ নিত না। কোনো কাজেই তিনি নাটকীয়তা পছন্দ করতেন না। একথা মানতেই হয় যে অন্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খুব বড় জায়গা দিতেন বলেই নিজেরটা সব সময় বজায়

রাখতে পারতেন না। মহাত্মাজির মত নিজের মতে অটল থেকে অন্যকে জোর করে মতানুবর্তী করানো তাঁর দ্বারা হত না। বরং স্নেহ ও প্রীতি-ভাজনদের কাছে নিজের ইচ্ছাকে হার মানিয়ে, কারো মনে এতটুকু আঘাত দিলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে, ক্রমাগতই ছোট মানুষের ছোট ইচ্ছাকে তাঁর বড় ইচ্ছার উপর ছায়া বিস্তার করতে দিতেন। অবশ্য তারপরে কৃতকর্মের ভোগটা তাঁর একাই করতে হত।

যাহোক ডিসেম্বর (১৯২৬) মাসে কলকাতায় কবি বলেছিলেন—আমার দুঃখ এই যে ইয়োরোপকেও আমার কথা (ইটালি সম্বন্ধে) বুঝিয়ে উঠতে পারিনি, ভারতবর্ষেও কেউ সন্তুষ্ট নয়। আমি বুঝতেই পারি না ভারত-বর্ষেও স্বেচ্ছাচারের সমর্থন হতে পারে, সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে প্রধান পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল সমাজের মধ্যেও অনেকে মুসোলিনিকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছেন এবং ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের কাহিনীগুলি প্রকাশ করেছি বলে বিরক্ত হয়েছেন।”

বিদেশে বন্ধুরা বললেন খুনী মুসোলিনির আতিথ্য নিয়েছিলেন, এ অমার্জনীয় অপরাধ। স্বদেশে অনেকেই মনে করেছেন দেশপ্রেমিক বীর মুসোলিনির নিন্দা করা অনুচিত।

কাগজে লিখলে, “যদি কবির সঙ্গে একজন উপযুক্ত ও বিবেচক (discreet) প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকতেন আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে তাহলে এমন অপ্রিয় ঘটনা ঘটত না।”[১]

অবশ্য একথা আমরা সমর্থন করি না। যতই বিবেচনা থাকুক না কেন, কবির স্বদেশীয় সেক্রেটারি তো ইটালিয় ভাষা বুঝতেন না। সেদেশের মনের গতি, কবির বক্তৃতার অনুবাদের ভিতরের চাতুরীর সন্ধান পাওয়া অসাধ্য হত। তাছাড়া সকলেই মানুষ, সেই বিপুল সমারোহ উপভোগ করতে করতে কেই বা খুঁত খুঁত করে দোষ অনুসন্ধান করে ফিরতে পারে!

প্রথমবার ইটালিতে একজন ইংরেজিভাষী, সম্ভবত আমেরিকান সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আমেরিকান একটি কাগজে তার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

“কবি শুধু রোমেই বহুমানিত হননি। সেখানে স্বয়ং মুসোলিনি তাঁকে সংবর্ধনা করেছেন। ফ্লোরেন্স, টুরিন প্রভৃতি স্থানেও তিনি একই রকম অভ্যর্থনা পান। কবির সঙ্গে ফ্লোরেন্সে অনেকক্ষণ আলাপ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, “ইটালি আমার কাছে চিরসুন্দর আর

[১] *Daily Mail*, Bombay, India, 15 Sept., 1926.

ইটালির সব শহরের মধ্যে ফ্লোরেন্স পরমাসুন্দরী। কিন্তু ইটালিতে নাম যশ ও জরার ভারে ভারাক্রান্ত অবস্থায় না এসে অল্প বয়সে এলেই অনেক ভালো হত। শেলী ও কীট্স যেমন এসেছিলেন। শিষ্যের মত শিক্ষা নিতে যদি এদেশে আসতাম! ইটালির কবিতার মর্মবাণী যৌবনেই ভালো বোঝা যেত। কিন্তু কী করব—নাম খ্যাতি ও বয়স কোনোটাই আমার নিজের তৈরি নয়। নিজের দোষেও হয়নি।"

সাংবাদিক লিখছেন, "একেবারে অব্যর্থভাবে আমাদের আলোচনা পূর্ব ও পশ্চিমের সম্বন্ধ নিয়ে উঠল। ঠাকুর বললেন, 'আমি সব সময়ই মনে করি এ দুই সভ্যতার নিজস্ব বিশেষত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখে, এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত। এশিয়াতে আমরা দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে, ধর্মমতে বিশ্বাসে বিচিত্রভাবে বিভক্ত। আমাদের পার্থক্য বড় বেশী। কিন্তু ইয়োরোপে অনেক মতদ্বন্দ্বের মধ্যেও তোমরা দীর্ঘদিনের চেষ্টায় একটি সমভাবাপন্ন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছ। এই ঐক্যসৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়কর লোকোত্তর ভাব আছে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মিলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা আছে এভাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার।...'"

কিছুক্ষণ যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার পর সাংবাদিক আবার জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনার কি মনে হয় যা অনেকেই বলেন, যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে আবর্জনা জমে উঠেছে তা পরিষ্কার করবার জন্য আমাদের বাহিরের সাহায্য প্রয়োজন আছে? ইয়োরোপের পুনর্গঠনের কাজে আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য আসতে পারে কি?"

"না, আমেরিকা বড় বেশী দূরে। এবং ইয়োরোপ যে রোগে ভুগছে, আমেরিকারও সেই একই ব্যাধি, তাছাড়া জিনিসপত্র নিয়েই আমেরিকা বড ব্যস্ত, সে বড় বেশী ধনী।. .ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার থেকে উটের পক্ষে ছুঁচের গর্ত দিয়ে ঢোকা বরং সহজ—নয় কি? তেমনি আমেরিকার ইয়োরোপকে সাহায্য ও ভাবের প্রেরণা দেওয়া তেমনি কঠিন, সে যদি এই দুঃখের গভীর সমুদ্র পার হয়ে আসত তবে অন্য কথা ছিল।"

কবির মন্তব্যে নিউইয়র্কের 'মর্নিং টেলিগ্রাফ' কিন্তু ভারি বিরক্ত হয়েছিল। তারা লিখলে, "দার্শনিকরাও মাঝে মাঝে কি জলো কথা বলতে পারে—ধনীর স্বর্গ-রাজ্য প্রবেশ ইত্যাদি, এই রকম কথাবার্তা চলতে থাকলে শেষে আমবাও ভাবতে থাকব যে আমরা যেন যুদ্ধে যোগই দিইনি।"...

ইটালির প্রসঙ্গে এখানে অপ্রাসঙ্গিক কথা কিছু এসে গেল, কিন্তু একটি মর্মগত সত্য কবির কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে যা বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্য-

যোগ্য। যে দেশ দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে আসছে কবির মনে তাদেরই স্থান বেশী। কবি তাদের পাশে এসে দাঁড়ান—যারা ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে তুলেছে জয়বাদ্য, যারা ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করছে নীলাকাশ। ইটালির প্রতি তাই তাঁর আকর্ষণ। তারা যে “দুঃখের হোমাগ্নি” (fire bath) পার হয়ে আসছে। জার্মানি, রাশিয়া সর্বত্র এই দুঃখের মন্থনোদ্ভূত শক্তির সঙ্গে আর্ত ভারতবর্ষের বিমুখ ভাগ্যের তুলনা কি কবিকে তাদের হৃদয়ের নিকটে নিয়ে যায়?

> আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে,
> তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও ডাক তারে।

ক্যানাডা

"শুধু তাঁর উপস্থিতিই তোমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। তোমার চোখে এ বিশ্ব সুন্দর হয়ে ওঠে। এ জীবন মনে হয় যেন কী বিস্তৃত এবং কর্তব্য, এমনকি তুচ্ছতম কাজও, মনে হয় আনন্দজনক, প্রেম মনে হয় এ-বিশ্বে পবিত্রতম; আর ঈশ্বর যেন অতি নিকটে আছেন পরম প্রিয় হয়ে। যদি শ্রীযুক্ত ঠাকুরের পরিচয় এই হয়ে থাকে যে তিনি একজন সুরসাধক ও মনীষী, তার চেয়েও বড় কথা যে তিনি ভক্ত। তাঁব কাছে অতি স্বাভাবিক ও সর্বোচ্চ ভাব হচ্ছে ভক্তি এবং মানুষের জীবনে এর চেয়ে পবিত্র মধুর ও প্রিয় অভিজ্ঞতা আর কিছু ঘটতে পারে না। তাঁর কাছে পূজা শুধু চার্চে মন্দিরে কোনো বিশেষ কালে বা স্থানে আবদ্ধ হবার নয়। উদয় ও অস্তের প্রভাত ও সন্ধ্যার সূর্য তাঁকে আহ্বান করে পূজায়—আকাশের গভীরে যে তারাগুলি আলো জ্বেলেছে, যে শিশিরবিন্দু ঘাসের উপর জ্বলছে, যে গভীর সমুদ্র বিস্তৃত, যে পুষ্প সদ্য বিকশিত, বিশ্বের এই সৌন্দর্যরূপই তাঁর পূজাকে জাগ্রত করে, তাঁর পূজা সব চেয়ে বেশী উত্থিত হয় মানুষের প্রতি তাদের হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যাকুলতায় স্পর্শিত হয়ে।

আমাদের শাস্ত্রে একটি গল্প আছে, পূর্বদেশ থেকে যে জ্ঞানীরা যিশুকে বেথলাহেমে দেখতে এসেছিলেন যখন তাঁরা তাঁদের সম্পদের থলি খুললেন তার মধ্যে শিশু যিশুর জন্য উপহার ছিল সোনা, ধূপ ও সুগন্ধি। আজ এই যে পরমজ্ঞানী পূর্বদেশ থেকে এসেছেন বিনয়বশত সম্পদের থলি খুলতে এঁর দ্বিধা হয়। কিন্তু যদি আমাদের এই দ্রুত ধাবমান জীবনগতি পশ্চিমজগতের মানুষদেব যথেষ্ট বুদ্ধি থাকে এবং তাঁর সম্পদ লাভ করতে ইচ্ছুক হই. যদি তাঁর কথা শুনবার জন্য আমরা একটু থেমে দাঁড়াই, তাহলে তিনিও আমাদের মূল্যবান উপহার দিতে চাইবেন, আত্মিক স্বর্ণ, ধূপ ও সুগন্ধি। আমি জানি এবং তিনিও জানেন সেই আত্মিক সম্পদ আমরা যেসব জিনিসকে মূল্য দিয়ে থাকি, যার পিছনে ছুটি সেসবের চেয়েই মূল্যবান, যেসব নিরর্থক ছুটোছুটির পর আমরা অবশেষে দেখি আমরা অর্থব্যয় করেছি যার জন্য তা খাদ্য নয়—আমাদের শ্রম দিয়েছি যার জন্য তাতে সন্তোষ নেই।"[১]

আমরা পূর্বে আমেরিকায় ইমিগ্রেশন আইন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি,

---

[১] J. T. Sunderland, Tagore Number, Young India, New York, 1921

ক্যানাডাতেও ভারতীয়দের প্রবেশ সম্বন্ধে আইনের কড়াকড়ি ছিল। ভারতীয় ছাত্র ও সমগ্র এশিয়াবাসীর প্রতিই সন্দেহ ও বিদ্বেষের প্রাবল্য সেদেশের প্রতি ভারতীয়দের মনকে অনুকূল রাখেনি। ইতিপূর্বে তাই নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কবি ক্যানাডায় যাননি। ১৯২৯ সালে ক্যানাডা থেকে পুনর্বার নিমন্ত্রণ আসে—এবার আসে এডুকেশন কাউন্সিলের তরফ থেকে। এই সংগঠনের প্রস্তাবিত বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে বিশ্বভারতীর কার্যক্রমের ভাবগত সাদৃশ্য, ও দুই দেশের মধ্যে বিরোধ মালিন্য দূর করার পক্ষে তাঁর উপস্থিতি কিছু সাহায্য করতে পারে—এই দুই কারণে কবি এবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

কবির ক্যানাডায় আগমনের সম্ভাবনা সেদেশে সাদরে গৃহীত হয়েছিল—উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিল সেদেশের জনসাধারণ। "মুক্তির আলোকিত দূত" আজ প্রাচ্যদেশ থেকে এসে পৌঁছেছেন।..."যখন থেকে এ খবর রাষ্ট্র হয়েছে যে ছবির মত অপরূপ সুন্দর ভারতীয় কবি এডুকেশন কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে আসছেন তখন থেকে তাঁর কাছে স্রোতের মত কেবল্‌, টেলিগ্রাফ, আমেরিকা ও ক্যানাডা থেকে আসতে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্য সংঘ, ক্লাব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানান হচ্ছে।"[১]

"ভারতবর্ষের কবি অর্ধ পৃথিবী পার হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন এই একটি বক্তৃতা দেবার জন্য। তাঁর সে ভাষণে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিয়েছেন, আর তা পৃথিবীর মানুষের মন অধিকার করে বসেছে। তিনি সভামঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন, শুভ্র বিলম্বিত শ্মশ্রু, বিস্তৃত স্কন্ধদেশের উপর শুভ্র চুলের গুচ্ছ বিলগ্ন, দীর্ঘ পরিচ্ছদে আবৃত দেহ, সেই মূর্তি সমগ্র শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করেছিল। মনোহরণ করেছিল সেই বিপুল জনতার যারা থিয়েটার-গৃহ পূর্ণ করে বাইরে বহুদূর পর্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করে বলছিলেন তাঁর মুখের রেখায় রেখায়, উজ্জ্বল কালো চোখে, বঙ্কিম নাসায়, ওষ্ঠের সূক্ষ্ম ভঙ্গিমায় অপূর্ব সৌন্দর্যরূপ আর তাঁর চতুর্দিকে মোহমুক্ত শান্তি বিকীর্ণ হচ্ছিল।"[২]

সম্মেলনের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল 'শিক্ষা ও অবসর'—এবং সেই সূত্রে সাহিত্য সংগীত নাট্য ও নানা শখের চর্চা, স্বাস্থ্য রেডিও সিনেমা সমস্তই আলোচিত হচ্ছে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রণালীর

---

[১] *The Daily Times*, Victoria, April 1929.

[২] *The Daily Province*, Voncouver, 7. 4. 29.

সঙ্গে যোগ স্থাপন। চিন্তার আদানপ্রদান ও শিক্ষার আদানপ্রদান ছাড়া ভাবের মুক্তি নেই, পূর্ণতা নেই—এই উদ্দেশ্য কবির একান্তই মর্মগত। কবির বক্তৃতার বিষয় অবসরতত্ত্ব (Philosophy of Leisure), এ বক্তৃতার বহু আলোচনা ও সমালোচনায় দীর্ঘদিন বিদেশের জনমনে তরঙ্গ তুলেছিল, তাই সংক্ষেপে এখানে কবির বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি, নইলে সমস্ত আলোচনার অর্থ পরিষ্কার হবে না।

প্রথমেই তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক কারণেই অবসরের প্রয়োজন ঘটেছে—সে দেশে কাজ করবার নানা উদ্দেশ্য থাকলেও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য শরীরের উত্তাপ সৃষ্টি করতে কর্মের প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষ গরম দেশ সেখানে অশ্রান্ত কায়িক পরিশ্রম আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। ভাগ্য আমাদের দেহের গতি এতটাই মন্দীভূত করে দিয়েছে যে সম্পদ উপার্জনের কঠিন কাজের পক্ষে তা নিতান্তই কম হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যের এই প্রতিকূল কৃপণতার যদি একেবারেই ক্ষতিপূরণ না থাকত তবে তা নিশ্চয়ই শোচনীয় হত। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা শূন্যতা তার মধ্যে সঞ্চিত থাকে পূর্ণতার সম্পদ। অরণ্যের প্রভূত প্রাণসম্পদকে শূন্য তৃণপ্রান্তরের ঔদার্য যেমন করে পূরণ করে তেমনি মানুষের জীবনের চির-উদ্যমশীল প্রাণের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উর্বরা অবসরের শূন্যতারও প্রয়োজন আছে।

"মানুষের দুই ভাব, একদিকে সে বিশ্বভুবন থেকে শক্তি আহরণ করে ইন্দ্রিয়জ শক্তিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্য উপলব্ধি করতে তার প্রয়াস। এ জগতে সমস্ত জীবের মতই তারও বাঁচার উপকরণ চাই—বুদ্ধি ও শক্তির চালনা করে সেই উপকরণসম্ভার বাড়িয়ে তুলে জীবনসংগ্রামে সে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই সাংসারিক উন্নতির পরিমাণ করা হয় দ্রুতগতি ও বস্তুর প্রভূত পরিমাণের উপর। কিন্তু মানুষ তো কেবল জীবমাত্র নয়—তার গৃহ, সমাজ, দেশ, এ সমস্তকে নিয়ে এবই পটভূমির উপর বিকশিত তার পূর্ণ মানবসত্তা...এরা নির্ভর করে সৃষ্টির ভাবের উপর, বিভিন্ন চিত্তের সম্মিলনের উপর, উদার প্রেম ও ত্যাগের উপর...এইখানেই অবসরের রাজত্ব—"যে অবকাশের বুকে মানবসত্তা অস্পষ্ট নীহারিকাপুঞ্জ থেকে নিজেকে তারা রূপে ফুটিয়ে তোলে।"

জাগতিক নিয়মের পূর্ণজ্ঞান আয়ত্ত করা ও কর্মকৌশল প্রয়োজন, কিন্তু ভাবের দৃষ্টিও চাই। অনেক সময় অবিরত অশ্রান্ত কর্মব্যস্ততার ফলে দ্রুতগামী সময়ের নিরন্তর ঘর্ষণে মানুষের মনের সূক্ষ্ম বোধগুলি অসাড় হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় তাদের জাগিয়ে তুলতে নানা বাঁকা কৌশলের

প্রয়োজন। চমকপ্রদ ঘটনার অদ্ভুতত্বের ধাক্কা দিয়ে মনকে নাড়া দেওয়া চাই। যা অভূতপূর্ব বটে কিন্তু সৃষ্টি-মহিমায় নবীন নয় (novelty but not originality), এমনকি কুৎসিত যেসব জিনিস মনের সামঞ্জস্য নষ্ট করে, তাও দরকার হয়ে পড়ে। যেসব জিনিসের অর্থ শুধু তার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতার মধ্যেই লাভ করা যায় তাদেরও এরা ছিন্নভিন্ন করে অর্থ খোঁজে এবং যখন ব্যর্থ হয় তখন জাগে হতাশা। তাদের সেই অনুভূতিশূন্য জগতে দেবতার পরাজয় ও দানবের জয় হয়ে থাকে।”

কবির এই কথার সত্যতা বর্তমানের Horror Comics নামক রোমাঞ্চকর কাহিনীর নেশায় পাওয়া অবসর বিনোদন, রক্ এন্ রোল-এর মত ভয়াবহ সংগীতের জনপ্রিয়তা, Jazz নৃত্যসংগীত সর্বোপরি বিকৃত যৌনতা ইত্যাদিতে দেখা যাচ্ছে। অসাড় মনকে খুঁচিয়ে তুলে আমোদ সৃষ্টির জন্য মনস্তত্ত্বের অস্বাভাবিক বঙ্কিম গতি নানা সাহিত্যনামধারী গল্পে উপন্যাসে যত্রতত্র প্রমাণ করছে যে স্বাভাবিক সুস্থ বুদ্ধিতে নির্মল সরল আনন্দে রুচি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কর্মক্লান্ত জগতের।

কবি বলছেন, “প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি সম্ভাবনারূপে আছে বুদ্ধিপূর্বক তার ব্যবহারে কৃতকার্য হওয়ার উপর নির্ভর করে উন্নতি। জাগতিক উন্নতির এই ভাবের মধ্যে নীতি বা দুর্নীতি কিছুই নেই—...এই উন্নতির জগৎকেই উপনিষদে বলেছে ‘অন্নব্রহ্ম’—যেখানে অনন্তকে প্রয়োজনের দিক থেকে দেখছি।...বর্তমান যুগে প্রকৃতির শক্তিকে উপযুক্তভাবে আয়ত্ত করায় মানুষের পশুর জগৎ থেকে মুক্তি হয়েছে। মানুষের বিজয়ধ্বনি ঘোষিত হচ্ছে। তবে এই তো চরম মুক্তি নয়।...এই বাস্তব জগতের মধ্যেই অমরত্ব আছে...কিন্তু তার সে ভাব নষ্ট হয়ে তা অপকারী হয়ে ওঠে আমরা যখন লাভের অংশ হিসাব করতে বসে তার বড় অর্থটি ভুলে যাই—সেই বড় অর্থেই শক্তির ব্যাপকতায় মানুষ এ জগৎকে মানুষের জগতে পরিণত করবার দৈব অধিকার পেয়েছে। সত্যের অন্য দিক আছে যাকে উপনিষদে বলা হয়েছে বিজ্ঞানব্রহ্ম বা আনন্দব্রহ্ম; এখানে অনন্তকে দেখি বোধনায়, দেখি আনন্দে। এটা জ্ঞানের রাজ্য প্রেমের জগৎ, সেখানে কেবলি বৃদ্ধি গতি ও প্রাচুর্যের কোনো মূল্য নেই। এখানে সত্যের মূল্য পরিণত চিত্তের ধৈর্যে সংযমে সাধনায় নিহিত আছে। অনন্তের এই ভাবের প্রকাশ অবকাশের ব্যাপকতায়, “সেই বিস্তৃত অবসরের পথ দিয়েই জীবনের অদৃশ্য দূতরা আলো হাতে সৃষ্টির বাণী নিয়ে আসে...বর্তমান জগৎ ঘূর্ণিপাকের মত ছুটে চলেছে—প্রচুর পদার্থ উৎপাদনের প্রবল ঝোঁকে এর উন্মত্ত গতি আমরা বন্ধ করতে পারি না—শুধু আমাদের উদ্বেগ এই যে আমরা যেন ভুলে না যাই, সুদীর্ঘ অবসরের যে সব সুফল তাতে মানুষের প্রয়োজন আছে...”

আমরা বারে বারেই দেখছি ভারতবর্ষের চেয়েও চীন ও জাপান যেখানে পুরাতন জগতের স্থিতবুদ্ধি অন্তর্মুখী সভ্যতার পাশাপাশি, বর্তমানের কর্মচঞ্চল বস্তুবাদী জীবনের গতি যখন দেখছেন কবির মনে সহজেই তুলনা আসছে। তিনি দেখছেন এশিয়ার পুরাতন জগতের যা কিছু সুন্দর যা কিছু গম্ভীর যা কিছু ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে উঠেছিল আজ নূতন জগতের ঝোড়ো হাওয়ায় তা উদ্‌ভ্রান্ত, বিস্রস্ত। ইয়োরোপে বসে কবি জাপানের উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অভিঘাত চিন্তা করেন ও তাঁর চিত্ত বিকল হয়ে যায়।

"খুব দ্রুত গতিতে টিনে ফল পোরা যায় কিন্তু সে ফল সুপক্ক পরিণত হতে সূর্যালোকিত সুদীর্ঘ অবসরের প্রয়োজন আছে। একজন যথার্থ ভদ্র মানুষ তৈরি হতে, সুসভ্য সুসংস্কৃত হতে দীর্ঘ দীর্ঘ শতাব্দীর অবকাশের প্রয়োজন হয়েছে। যার ফলে তাঁর আত্মসম্মানবোধ জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পেরেছে।"...

এখানে স্মরণ হয় জাপানে আত্মসম্মানের হানি ঘটলে মানুষ কত সহজে প্রাণ-ত্যাগ পর্যন্ত করে থাকে। তুলনায় ইয়োরোপের ডুয়েল লড়া প্রায় একই; অবশ্য ভাবের পার্থক্য আছে। যুদ্ধের যথার্থ প্রয়োজনের নীতি 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' তবু যুদ্ধেরধর্ম নীতির বিভিন্ন নিয়ম ও আইন সুসভ্য মানুষের পরিচয় দেয়—নিরস্ত্র, পরাঙ্মুখ, আশ্রয়প্রার্থী শত্রুর প্রতি অস্ত্রাঘাত না করায় যুদ্ধরীতিতে যে মানবমহিমা চিহ্নিত ছিল আজ শূন্য পথে অসহায় অগণ্য জনসাধারণের উপর বোমা ফেলে ভ্রষ্টচরিত্র মানুষের মধ্যে দানবের বিজয়ে তারই ধ্বংস দেখা গেছে। উন্নতিলাভের দ্রুত প্রচেষ্টার এইসব কুফল পদেপদেই আজ লক্ষ্য হচ্ছে।

কবি বলছেন, "জাপানে যখন ছিলাম মানুষের দুই বিপরীত দিক দেখেছি—একদিকে পুরাতন জগতের সামাজিক আদর্শ, সৌন্দর্যবোধ, ব্যবহারের রীতি নীতি, অন্যদিকে তার সর্বদিক থেকে ধন-সংগ্রহের নিরন্তর অব্যাহত গতি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই জাপান এই উন্নতির ভাব আয়ত্ত করেছে।...চীনও আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে জেগে উঠেছে এবং যে অস্ত্র দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছে সে অস্ত্র শীঘ্রই আয়ত্ত করে নেবে।...

"জীবনের যে আদর্শ জাপানের সভ্যতারূপে দীর্ঘদিন ধরে বংশপরম্পরাক্রমে তৈরি হয়ে উঠেছিল—তার উদ্দেশ্য ধন লাভ বা সংগ্রহ নয়, তার মধ্যে জীবনের সৌন্দর্যরূপ ফুটিয়ে তুলবার জন্য প্রচুর অবকাশের বিস্তৃতি ছিল।

"...সংক্ষেপে আধুনিক জগৎ তার নিজের স্বধর্ম সৃষ্টি করতে যথেষ্ট

সময় দেয়নি যার ফলে বর্তমান সমাজে সমস্ত বিরুদ্ধ চিন্তার উপযুক্ত সম্মিলনে জীবনশিল্প তৈরি হয়ে উঠতে পারে।...

“...আমরা জীবনের হালকা দিকগুলি যা যাত্রাপথের আবর্জনা তাই পুঞ্জীভূত করে তুলছি, তারই ভক্ত হয়ে পড়ছি, এদের যথাস্থানে ন্যস্ত করতে যে সময় লাগে তা হাতে নেই—তাই আমরা বলি, ‘সময় মানে অর্থ’, কিন্তু ভুলে যাই অবকাশ হচ্ছে সম্পদ।’ (Time is money, but leisure is wealth.)

“তারই ফলে মাতাল যেমন মদের মত্ততায় অল্প সময়ের মধ্যে আমোদের উদ্দামতা খোঁজে তেমনি সমস্ত উপভোগের মধ্যেই একটি মত্ততার ভাব এসে পড়ে, কারণ সর্বকিছুই খুব তাড়াতাড়ি হওয়া চাই। তাই চমকপ্রদ ঘটনার প্রতি আসক্তি এবং সাহিত্যে মানবচরিত্রের অস্বাভাবিক গতি, অল্প সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত উপভোগের মত্ততাকে খোঁজে, কেবলমাত্র বাজারদর অনুসারে সর্বকিছু যাচাই হওয়ায়, স্বপ্রভ যে সব জ্যোতির্ময় সত্য আছে তার মূল্য হারিয়ে যায়..”

পরে নানা কাগজে কবির এই বক্তৃতার বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। তার সবগুলিই উল্লেখযোগ্য নয়; যেমন কোনো কোনো কাগজ লিখলে—“কবি বলছেন—Time is money but leisure is wealth—অর্থ বুঝলাম না, একেবারে দুর্বোধ্য—leisure কী করে wealth হল? আমি যদি দোকানে গিয়ে বলি আমার টাকা নেই বটে কিন্তু কিছু leisure আছে, আমায় এক পাউন্ড মাংস দাও—দেবে কি?” এ জাতীয় সমালোচনা বাদ দিলেও কয়েকটি নিবন্ধে ঐ দেশবাসীর তৎকালীন চিন্তাধারার খবর পাওয়া যায়। কবির বক্তব্যের মর্ম, যা আজ দিনে দিনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, বলাবাহুল্য তা অনেকেই পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি।

“একজন কবি ও আধুনিক জগৎ” এই শিরোনামায় একব্যক্তি লিখছেন—“এসব আদর্শ ভালো। বহু চিন্তাশীল মানুষ আধুনিক জীবনের উদ্দামতা, বিলাস ব্যসনের প্রতি ঝোঁক, লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, তবু স্যর রবীন্দ্রনাথের নিজের দেশ যেখানে আধুনিক জগতের কোলাহল কমই পৌঁছেছে, কবির প্রচারিত আদর্শের কিছুটারও যেখানে সাধনা হয়েছে, সে-দেশের বর্তমান অবস্থা পাশ্চাত্ত্য জাতির মনকে আকৃষ্ট করে না। হতে পারে কবি যা বলছেন বহু ক্যানাডিয়ান তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে কিন্তু তারা কি ভারতবর্ষে তাদের বাকি জীবনটা কাটাতে রাজী হবে?”[১]

বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষে যে আদর্শ লাভ হয়েছে সে কথা কবি কোথাও

---

[১] *The Morning Leader*, Regina Suk, 9 4. 29.

বলেননি বরং বহুদিনের বহুভারপীড়িত প্রথাবদ্ধ অচলতা যে সর্বদিক থেকে তাকে দুর্বল ও সবলের মুখের শিকার করে রেখেছে সে কথাই উদ্ধৃত প্রবন্ধে বলেছিলেন। কবির প্রধান বক্তব্য শুধু এই যে যেসব নীতি জাগতিক দিকে ব্যবহারিক সংসারে প্রয়োজন মেটায় না, মানবিক দিকে তার সার্থকতা আছে। জীবনের বিন্যাসে সমাজের ব্যবস্থায় যে জীবনশিল্প রচিত হয় তার ব্যবহারিক মূল্য যতই কম হোক তার সৌন্দর্যরূপ মানবচরিত্রকে মর্যাদা দেয়। ভারতবর্ষের মনীষী তাঁর মননায় ও বোধে জীবনব্যাপারের মধ্যে মানবমহিমার যে প্রতিষ্ঠা দেখতে চান পরাধীন হৃতসর্বস্ব ভারতবর্ষের পথে ঘাটে অবশ্যই তা ছড়ানো নেই। যা শ্রেয় তা সুলভ নয় বলেই মিথ্যা নয়। যা হোক, বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রধান কারণ তাঁর বক্তব্য বুঝতে না পারা। প্রথমেই লোকে ধারণা করে বসে থাকে যে কবি হয়ত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে নিন্দা করে প্রাচ্য ভাবকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে উদ্যোগী। বস্তুত প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য সেখানেই বস্তু আত্মাকে, কর্ম চিত্তকে অতিক্রম করে অতিকায় হয়ে উঠেছে, আত্মার উপরে কায়ার সেই অতিবৃদ্ধির তিনি প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র পক্ষপাত নেই—তবু ভ্রম উৎপন্ন হয়। আর একজন বিরুদ্ধ সমালোচক লিখছেন—

"এই হিন্দু মিস্টিক যা বলছেন তা শুনতে সত্য বোধ হয় তবু তা অরণ্যে রোদন মাত্র! পাশ্চাত্ত্য জাতি যন্ত্রের কাছে একেবারেই দাসখত লিখে দিয়েছে, তারা এমন যান্ত্রিক কৌশল তৈরি করছে যাতে অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগতিতে প্রচুর জিনিসপত্র তৈরি হতে পারছে। যার ফলে এদেশে আজ প্রত্যেক ব্যক্তি তার ঠাকুর্দা যা শ্রম করতেন তার অর্ধেক পরিশ্রম করে যত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ, যত আমোদ করতে পারছে দুই পুরুষ আগে তা কল্পনাতীত ছিল। কাজেই আজ এ জগৎকে এ বিশ্বাস করানো কঠিন যে অবিরত জীবনসংগ্রামরত দ্রুতধাবমান কর্মচক্রের আবর্তন নিরর্থক। যদি সত্যই সে কারণেই মানুষের শান্তি নষ্ট হচ্ছে ও সে আত্মমর্যাদাভ্রষ্ট হচ্ছে একথা সত্যও হয়, তবুও তা গৃহীত হবে না। মর্যাদা ও শান্তির কল্পনাবিলাসের সঙ্গে শারীরিক অসুবিধা, দুঃখ, অসুস্থতা যা প্রাচ্যে রয়েছে তা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা প্রশংসনীয় বা লাভজনক মনে করতে পারে না। 'মাদার ইন্ডিয়া' বই তো একেবারে মিথ্যা নয়।"[১]

বলা বাহুল্য, এ সমালোচনায় যে সত্যতা আছে তা কবির অগোচর নয়—ভারতবর্ষের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য দূর করা প্রয়োজন বলেই নগ্ননৃত্য ভালো লাগার প্রয়োজন নেই। কবি আলোচনা করতে গিয়েছেন 'শিক্ষা ও অবসর'

---

[১] *The Star*, Saskatoon, Canada, 9. 4. 29.

—অবসর যাপনও যে শিক্ষণীয়, অবসর বিনোদন যে আত্মমর্যাদাভ্রষ্ট হয়ে উন্মত্তবৎ ব্যবহারে কীভাবে রুচিবিকার সৃষ্টি করে, বর্তমান জগতের প্রমোদ ব্যাপারে তার উদাহরণের অন্ত নেই। বিশেষত এশিয়ার ক্লিষ্ট দেশগুলির উপর যখন নাইট ক্লাব থেকে শুরু করে বহুবিধ বিকৃত উল্লাসের ছায়া তাদের বহুযুগলালিত সুকুমার সৌন্দর্যবোধকে আচ্ছন্ন করে দেয় তখন কোনো চিন্তাশীল তার নিন্দা না করে পারেন না। এই প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তার আপন চারু জীবন-শিল্প আচারে আচরণে, ললিতকলায় জীবনবিন্যাসে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করে সতীত্বভ্রষ্ট। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণ বহু—কিন্তু সেগুলির মধ্যে তার যা শ্রেষ্ঠ চিন্তা তা নয়। তার যে নিষ্ফল প্রয়াস, অকৃতকর্ম, বিপুল ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিচ্ছে তার কারণ মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ নীতিগুলির পালন নয়—বরং যা জেনেছে তার ব্যবহার করতে পারেনি, চিন্তা ও কর্মের এই অসামঞ্জস্যই তার মূল। বর্তমানে এই অসামঞ্জস্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সমাজ জীবনকে যে কলঙ্কে কলঙ্কিত করছে তার জন্য বুদ্ধ, চৈতন্য, গীতা বা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপদেশ ও সাধনা মিথ্যা প্রমাণ হবে না। শুধু সেই চিরসত্য মনে রাখতে হবে যে মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি কোনো এক বিশেষ স্থানে উচ্চারিত হলেও তা সমস্ত বিশ্বের. অতীত ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ সম্বন্ধে সত্য. যেখানে যখনই তা গৃহীত হবে তখনই তার সুফল ফলবে।

কবির বক্তব্য বুঝে বা না বুঝে যে সমালোচনা হয় কবি যখন তাঁর বক্তব্য বলেন তখন তাঁর শ্রোতার মধ্যে কিন্তু সমালোচনার উদ্যত খড়্গ দেখা যায় না। কবির উপস্থিতি তাঁর মুখের বাক্যে যে সম্পূর্ণতা দেয় তা বিশ্লেষণে খণ্ডিত হবার পূর্বে সমগ্র সত্তাকে উদ্ভাসিত করে। সংস্কার ও মতামতের সংকীর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে যাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা জন্মায় প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে তার নিঃসন্দেহ সত্যতা আপনার যাথার্থ্য প্রমাণ করে—বুদ্ধিতে যাকে চুলচেরা বিচার করতে চাই, প্রাণের জীবন্ত স্পর্শ শিল্পের মত তা অহেতুক রসে পূর্ণ করে দেয় শ্রোতার বোধনা।

“সোমবার রাত্রে সহস্র সহস্র লোক কবির দর্শন চেয়েছিল, চেয়েছিল তাঁর কথা শুনতে. কিন্তু প্রবেশ করতে পেল না। তারা রঙ্গালয়ের বাইরে দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিল...তিনি বক্তৃতা সুরু করবার পরও প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক সহস্র সহস্র লোক দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। সাড়ে আটটার আগেই সেই জনশ্রেণী গ্র্যানভিল স্ট্রীট পার হয়ে ভেওরাজিয়া পার হয়ে, হোটেল ভ্যাঙ্কুভার অতিক্রম করে কাউন্ট হাউস পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলে যে সমস্ত ডেলিগেট বিভিন্ন দেশ থেকে এসে-

ছিলেন সকলের চেয়ে কবিই সমস্ত জনতার চিত্ত অধিকার করেছিলেন।”১

এইখানে মনে পড়ে শান্তিনিকেতনের এক আশ্রমবাসিনী একদা আমাকে বলেছিলেন যে গুরুদেব বিদেশ থেকে আসবার সময়, বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে একত্রে তোলা কোনো একটি অনুষ্ঠানের সিনেমা ছবি এনেছিলেন। আশ্রমে সেটি যখন দেখানো হয় তাঁরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে সেদেশেও বহু মহামান্য মানুষদের মাঝখানে গুরুদেব তেমনি আকাশস্পর্শী বনস্পতি, অন্যরা সে তুলনায় গুল্মমাত্র। ছবিতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা আসছেন যাচ্ছেন, কিন্তু সহসা কবির আবির্ভাব মাত্র 'মনে হয়েছিল ইনি সম্পূর্ণ পৃথক, মহামানব।

“যে দুই সহস্র লোক ভ্যাঙ্কুভার রঙ্গমঞ্চে ভিড় করেছিল যারা সেই শান্ত সমাহিত প্রবীণের মধ্যে প্রতিভার অগ্নিশিখা অনির্বাণ প্রজ্বলিত দেখেছিল তাদের মনে সে স্মৃতি তাঁর বাক্যের চেয়েও চিরস্থির থাকবে। তিনি তাঁর শ্রোতাদের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র কর্ম থেকে, প্রাত্যহিকতা থেকে বহু দূরে সুন্দরের জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে হয়ত সঠিক তাঁর বাক্যগুলি স্মরণ করতে পারবে না, কিন্তু তাঁর ভাষণ তাঁর স্বকৃত শিল্পবর্ণনার অনুরূপভাবেই তাঁর শ্রোতাদের মনে প্রবেশ করছিল। তারা তাঁর স্বরভঙ্গী সমস্তের সঙ্গে একত্রীভূতভাবেই তাঁর মতকে গ্রহণ করছিল। অবশেষে তিনি সংক্ষেপে বলেছিলেন যে শিল্পের চরম সার্থকতা এই যে সে মনে নিঃসংশয় প্রত্যক্ষতার মত সত্যবোধ জন্মাতে পারে। তারপর যে বই থেকে তিনি পড়ছিলেন সেটি বন্ধ করলেন, তাঁর স্বর স্তব্ধ হল, গুরু রেডিও মাইক্রোফোন থেকে সরে গেলেন। ঐ যন্ত্রটিকে এতক্ষণ আত্মার এই জ্বলন্ত রূপের পাশে অত্যন্ত অসমঞ্জস বোধ হচ্ছিল। তাঁর শ্রোতারা এই মোহন মন্ত্রশক্তির প্রভাব কাটিয়ে ফেলতে অনিচ্ছুক হয়ে যে স্তব্ধ নীরবতায় বসে রইল কবির প্রতি সেই তাঁদেব পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।”২

“কবি আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের এই সভ্যতা কিসের সন্ধানে চলেছে?...তাঁর এইসব প্রশ্ন যদি আমাদের চিরকালের বিশ্বাসের বিপরীতও হয় তবুও অধৈর্য হবার কিছু নেই। হয়ত এইরকম প্রশ্ন প্রত্যেক যুগেই মানুষ করেছে এবং নিশ্চিত চিরকাল ধরে করবে, জানতে চাইবে এই রহস্যময় জীবন-খেলার অর্থ কী?...তিনি আমাদের বলেছেন, “সময় মানে অর্থ—শুধু এইটুকুই মানবসত্য নয়, অবকাশই সম্পদ।” (Time is money, but leisure is wealth.) তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, সমগ্র বিশ্বও

---

[১] *Vancouver Sun,* 9. 4. 29.

[২] *The Vancouver Sun,* 9 9. 29.

যদি করতলগত হয় তাতেই বা কী লাভ যদি আমাদের মনই নষ্ট হয়ে যায়? তিনি মনে করছেন যে আমরা "হিসাবের দপ্তরখানায়" সমস্ত সময়টা কাটাচ্ছি, তাই আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে এই দপ্তরখানার বাইরে "তারার মহাসভা আছে।" এদেশে এই মাননীয় ক্রান্তদর্শীর ভর্ৎসনা-বাণীকে পূর্বদেশ থেকে উচ্চারিত পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রতি নিত্যকালের প্রশ্ন মাত্র, এইভাবে উল্লেখ করাই রীতি হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় কবির বাণীর এটি উপযুক্ত আলোচনা নয়—এভাবে বলায় কোনো ফল নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবের বৈপরীত্যের তুলনা করে আমাদের লাভ নেই, কবি যা বলেছেন তা মানবচরিত্রের মূলে নিহিত, তা সর্ব-মানবসমস্যা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত বহিরঙ্গ ঘটনায় বর্তমানের সমস্ত কার্যক্রমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা পূর্বদেশের উপর আপন জীবনরীতি বিস্তার করেছে। যখন ঠাকুর আমাদের বলেন, সময় ও অবকাশ এক কথা নয়, যখন তিনি বলেন যে যে সভ্যতা আমাদের যন্ত্রকৌশলে পারদর্শী করে তুলেছে তা আমাদের অবকাশের সম্পদ থেকে বঞ্চিত দরিদ্র করছে, তখন তাঁর অভিযোগ ভ্যাঙ্কুভারের জনপথের প্রতি যত সত্য, বারাণসীর মন্দিরের পক্ষেও তাই। তিনি আমাদের যে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নটি করেছেন তা ইয়োরোপ ও আমেরিকার মত চীনেও প্রযোজ্য।"২

এই সুচিন্তিত মন্তব্যটি কবির মতকে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে তুলেছে। বলা বাহুল্য আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যে অংশ সম্বন্ধে কবি সন্দিহান সে সন্দেহ জাপানে ও চীনেই তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। অনুকরণ-প্রয়াসী দেশগুলির মধ্যে আরোপিত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ত্রুটিগুলি জীবন-ব্যাপারের সঙ্গে সহজে মিশে যায় নি বলেই তা আরো বিকৃত বোধ হয়েছে। আর বারাণসীর মন্দিরে পান্ডা-তাড়িত আধ্যাত্মিকতার যে কবি প্রশংসা করেন না তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পার্থক্য আলোচনা করতে গেলে বর্তমানের মানবসমাজে প্রচলিত রীতির তুলনা নয়—শুধু মাত্র এই যে পূর্বদেশে একদা মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে যে জীবন-বাদ উচ্চারিত হয়েছিল বর্তমানের উদ্‌ভ্রান্ত কর্মাক্রান্ত মানুষের কাছে কবি তারই বিস্মৃত সংবাদ স্মরণ করিয়ে দেন। তার অর্থ এ নয় যে কলিকাতা বা দিল্লীবাসীরা ভ্যাঙ্কুভারবাসীদের চেয়ে কোনো অংশে মানবমহিমার চিরসত্যে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত এবং 'তারার সভায়' নিমন্ত্রণে তারাই এসেছে যোগ দিতে। মানুষের চরিত্রে জীবনে ও সমাজে জৈব প্রয়োজনের প্রাবল্য যেখানেই দৈবভাবকে আক্রান্ত করে, রুদ্ধ করে, কবি সেখানেই আসেন দ্বার

The Daily Province, Vancouver.

খুলে দিয়ে মানুষের মুক্তির সংবাদ দিতে।—যে শক্তি একদা জড়ে বদ্ধ ছিল, মূক মাটিতে অঙ্কুরে উদ্ভিন্ন হয়ে প্রাণরূপে এল তার মুক্তি; সেই প্রাণ কত পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে অভিব্যক্ত করে মানুষের চৈতন্যে এসে পৌঁছেছে; মানুষের মধ্যে প্রাণের জৈবরূপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে দেহাতীত ভাবের সংবাদ, কবি তাকেই স্মরণ করিয়ে দেন, মনকে করেন ঊর্ধ্বমুখী—মানুষকে বলেন তোমার লাভের থলি, হিসাবের খাতা, আহারের খোরাকই একমাত্র নয়; চেয়ে দেখো "ওই আলোক-মাতাল স্বর্গ-সভার মহাঙ্গন", স্মরণ করো "হোথায় ছিল কোন যুগে মোর নিমন্ত্রণ"—

বিদেশে কবির জীবনদর্শনের যে সমালোচনাগুলিতে বিরুদ্ধতার ভাব দেখা যায় সর্বত্রই তার মূল কথা এক, সে এই যে ভারতবর্ষ এর ফলে কী পেয়েছে? এ প্রশ্নের কারণ এই যে তৎকালীন মানুষের কাছে কবির চিন্তার সমগ্রতা বহু স্থলেই ধরা পড়ে নি। কী সাধনায় তাঁর সমগ্র কর্ম স্বদেশে নিয়োজিত, ভ্যাঙ্কুভারবাসী তার সামান্যই খবর রাখে, আবার স্বদেশেও তাঁর বাণীর পূর্ণরূপ গ্রহণযোগ্য মনের অপ্রতুলতা তার কর্মকে করে বাধাগ্রস্ত। ১৯২৬ সালে কবি বিদেশ থেকে ফিরে এসে বম্বেতে একদল সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে যা বলছেন এ প্রসঙ্গে তা লক্ষণীয়। সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থা দেশে এবং বিদেশে সন্দেহদৃষ্টিতে পড়ে ক্লান্ত শরীরে নিয়ত দূর-দূরান্তরে ছুটোছুটি করে কবি নিজেও অনেক সময় ভাবেন কেন এ বিড়ম্বনা। কিন্তু তাঁর জীবনদর্শন ধর্মবোধ ও ধর্মসাধনা সব কিছুরই যেন সার্থকতা ও অর্থ মানবতীর্থের ঘাটে ঘাটে খুঁজে ফিরছে। চিন্তায় যা পেয়েছেন অভিজ্ঞতায় তা সত্য কববার জন্য, সম্পূর্ণ করবার জন্যই, এই প্রয়াস।

"আমি চাই সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ করতে। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের এরকম প্রচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়—পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় সভ্যতার পুনর্গঠনেব কাজে আমাদের যেটুকু সাহায্য করা কর্তব্য তা করে সম্মানের স্থান নেওয়া উচিত। আমি এও বুঝেছি যে আজ পাশ্চাত্ত্য জগৎ পূর্বদেশকে জানতে চায়...আমি আশা করি বিশ্বভারতীর আদর্শ ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে সাহায্য করবে। আজকের যুগে প্রত্যেক দেশের সমস্যা বিশ্বসমস্যার অন্তর্গত। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো দেশই বাঁচতে পারে না। এবং যতদিন না আমরা বিশ্বের মধ্যে আমাদের নিজেদের স্থান অধিকার করতে পারি ততদিন আমরা অজ্ঞাত অবহেলিত থাকব—আমাদের সভ্যতার দান জগতে গ্রাহ্য হবে না"...

"কিন্তু কী করে এ ইচ্ছা সাধন করবেন?"

"সৌভাগ্যবশত ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্বের হৃদয়ে আমি আমার স্থানটি জয় করে নিতে পেরেছি। এই বিশেষ কারণেই ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সংযোগের পথটি খুলে দেবার দায়িত্ব আমি অনুভব করেছি।... আজকের জগতে যাতায়াতের পথ সহজ হওয়ার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি খুব কাছাকাছি এসেছে, এই নৈকট্যকে যথার্থ সখ্যে সৌভ্রাত্র্যে পরিণত করতে হবে—যতদিন না জগতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সভ্যতার সংস্কৃতির জ্ঞানের মিলনের পথে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় হয় ততদিন কোনো স্থায়ী শান্তি হতে পারে না...বিশ্বভারতীর মাধ্যমে মানবজাতির অন্তর্নিহিত সেই মূল অভেদ্য ঐক্যকে রূপ দেবার চেষ্টা করছি...

"আমি জানি যে একথা লোকে বলতে পারে যে আমার নিজের দেশেই আমার এ আদর্শের পূর্ণ স্বীকৃতি হয়নি...কিন্তু সত্যানুসন্ধানী দু-একজনও যে এ সত্য দেখেছেন বুঝেছেন এই যথেষ্ট।

"...আমাদের বুদ্ধি কম নয়, আমাদের স্বভাবের মধ্যে, জাতীয় জীবনে, আধ্যাত্মিকতা আছে—আমি জানি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি বহু বহিরঙ্গ কারণে আমাদের অধঃপতন ঘটেছে। আমার মনে হয় আমরা সমস্ত বড় আদর্শে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি ও ক্রমেই হারাচ্ছি, আমরা কেবল লাভের উপায় খুঁজছি, কাজেই materialistic হয়ে পড়েছি—এ কথাও আমার বলতে ইচ্ছা হয় যে ইয়োরোপের চেয়েও বেশী materialistic হয়েছি।"

এই শেষের মন্তব্যটি আমাদের কাছে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"এ দেশ কি যথার্থই ইয়োরোপের চেয়েও বস্তুবাদী হতে পারে?"

"হাঁ—ব্যাপক অর্থে একথা সত্য। বস্তুবাদ অর্থ কী? সে কি অনুষ্ঠানের বাহুল্যে নেই?—আজ যা আমাদের ধর্মে প্রধান হয়ে উঠেছে? বাহ্যিক আবরণকে আত্মিক মূল্য দেওয়া কি বস্তুবাদ নয়? পাপকে জল দিয়ে ধোয়া যায় বা পদধূলি নেওয়া বা পাদস্পর্শ করায় পাপ দূর হয় এ বিশ্বাসের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা কোথায়?...হ্যাঁ, আমি materialism শব্দটা ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছি—অর্থহীন অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম যা আমাদের জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে সবই তার মধ্যে পড়ে। আনুষ্ঠানিক কর্মের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু ততটুকুই প্রয়োজন যতটুকুতে মানুষে মানুষে ঐক্যের দৃষ্টি ব্যাহত না হয়—এই ঐক্যের অনুভব অন্তরের গভীরে ঘটা চাই, শরীর বা বস্তুর ঐক্য এ নয়।...আমি কেবল এই কথাই বলব যে যতই বাধা থাক, যে গভীর আত্মিক ভাবের আমরা উত্তরাধিকারী তার উপযুক্ত হয়ে ওঠা চাই। আমরা মানুষের পুত্র এবং মানুষের সেবক।"[১]

---

[১] *M.R.*, 1925.

ক্যানাডায় নোয়েল রবিনসন নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারের একটি সুন্দর বিবরণ আছে। এই বিবরণের আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য বলছে রবিনসন সার্থক সাংবাদিক। ভাষা ও ভাবের নিখুঁত যাথার্থ্য পরিচিত জনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—

"রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ সাক্ষাৎ করতে রাজি হন, তাই এ সুযোগ পাওয়া আমার পরম সৌভাগ্য। যদিও তাঁকে পূর্বেই দূর থেকে দেখেছিলাম তবু নিকট থেকে দেখলে এই মানুষটির মধ্যে যে অপূর্ব মহিমা আর মনোহারী সৌন্দর্যের আশ্চর্য সমাবেশ দেখা যায় তা আগে ধারণাই করতে পারিনি... কবির উচ্চগ্রামে বাঁধা স্বরের শুধু আলাপকালীন সুরমাধুর্য কেউ বক্তৃতা মঞ্চ থেকে শুনে অনুমান করতে পারবে না। তাঁর ছবির মতন সুন্দর আকৃতির মধ্যে কিছুই কৃত্রিম নেই, দেখলাম চিত্তশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সরলতার সংমিশ্রণ। তিনি পরিহাসচ্ছলে বলছিলেন ১৯১৬ সালের আমেরিকা ভ্রমণের কথা, সে ভ্রমণের ক্লান্তি, বোধ হয়, তিনি অদ্যাপি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কবি হাসতে হাসতে বলেছিলেন—"আমার একজন এজেণ্ট জুটেছিল সে আমাকে হাতে নিয়ে নিলে ও যতটা পারে শোষণ করলে...পরে সে আমাকে বলেছিল যে আমার বক্তৃতাগুলি নাকি আশ্চর্য-রকম সফল হয়েছে। অবশ্য আমার মত ঠিক তার সঙ্গে মেলেনি। তখন ন্যাশনালিজম্ সম্বন্ধে (অর্থাৎ বিরুদ্ধে) বলছিলাম, সে সময়ে তো তা জন-প্রিয় হতে পারে না।...অনেকে মনে করেন আমি সব সময় পাশ্চাত্ত্য বস্তু-তান্ত্রিকতার নিন্দা করছি ও আমার দেশের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তার তুলনা করছি এ কথা সত্য নয়, এবং আমার দেশবাসীরা তা জানেন। আমি পাশ্চাত্ত্য জগৎকে চিনেছি এবং সেখানে আত্মিক চিন্তার গভীর অন্তর্নিহিত রূপ দেখেছি। এখানে এমন অনেক আছেন যাঁদের মনে জীবনাদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি আছে। আমার শুধু এই মনে হয় যে বর্তমান যুগের চিত্ত একটা বিরাট কুগ্রহের মাধ্যাকর্ষণে আকর্ষিত হচ্ছে যার ফলে তার চিন্তা প্রচেষ্টা সবকিছু ভ্রষ্ট ও মানুষের স্বাভাবিক গন্তব্য পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মুনাফা রোজগারের লোভ মানুষের মনে জগতের নূতন ও পুরাতন সমস্ত সভ্যতার উপরই ছায়া ফেলেছে।"

কবি এই ব'লে জগতের সর্বত্র কুৎসিতের কাছে সৌন্দর্যের পরাজয় বর্ণনা করতে লাগলেন। গঙ্গার দুই উপকূল যেখানে বাল্যকালে তাঁরা বিশ্ব-শোভা দেখেছেন সেখানে আজ ধূম্রমলিন ফ্যাক্টরি কুৎসিতের রাজত্ব বসিয়েছে। জাপানের মত দেশ যেখানে চিরদিন জীবনে, আচরণে, সৌন্দর্যের চর্চা হয়েছে সেখানেও লোভের বিকট আক্রমণ এসে পৌঁছেছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির ভাণ্ডারের দরজা খুলে প্রচুর উৎপাদন সম্ভব করেছে—

এর মধ্যে একটা মহত্ত্ব আছে। কিন্তু যথাযথভাবে চালিত না হলে এর ফলে সর্বনাশ ঘটতে পারে। আজ বিজ্ঞান মানুষকে যে ঘুষ দিচ্ছে তা এতই প্রচণ্ড যে মানুষ সে উৎকোচ গ্রহণে লজ্জিত নয়। সে তার জন্য সর্বস্ব বিকিয়ে দিতে পারে,—এমনকি যা পরম মূল্যবান তাও খোয়াতে রাজি... তারপর তার আনন্দ, তার জ্ঞান, সমস্ত বিসর্জন দিয়ে সে তার নিজের তৈরি দপ্তরখানায় চিরনিবদ্ধ হয়ে থাকতেও রাজি...আমি এ কথা কখনই বলছি না যে পাশ্চাত্ত্য দেশে আধ্যাত্মিক মনোভাব নষ্ট হয়ে গেছে—আমি দেখছি এ দেশে মানুষ সত্য ও জ্ঞানের জন্য বিপদের মুখে, মৃত্যুর মুখে যেতে প্রস্তুত রয়েছে, সর্বত্র দেখেছি জড়ের উপর বিজয়ী মানবাত্মা। কিন্তু আজ আবার এও দেখছি “ধুলোর রাজত্ব” (kingdom of dust) থেকে ঘুষ নেওয়ার ফলে সেই মানবের অবমাননা।...”

নোয়েল রবিনসন জিজ্ঞাসা করলেন, “এ সমস্যা থেকে উদ্ধারের উপায় কী নেই— ?”

“নিশ্চয় আছে—আশা করি বিজ্ঞান নিজেই এর প্রতিকার আনবে—তার অনুষঙ্গে যা কিছু আপদ জুটেছে তার শোধন করবে। বিজ্ঞান কখনো বস্তুতান্ত্রিকতা প্রচার করে না, কারণ সত্য জড় নয়—সত্য মানুষকে উদ্ধার করবে, আরোগ্য করবে, কিন্তু আজ তা বধ করতে উদ্যত।” কবি ভালো করেই জানেন ফেরবার পথ নেই। গঙ্গার উপকূলে ফ্যাক্টরিগুলি ধূম উদ্‌গীরণ করবেই। তিনি তাই বলেন মানুষের আবিষ্কারের শক্তি বাস্তব সত্য, তাকে কাজে লাগানো চাই—কিন্তু মানবসভ্যতার বিভিন্নমুখী দরজা খুলে দেবার জন্য অন্য শক্তিরও প্রয়োজন। ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের সঙ্গে সৃষ্টিশক্তির মিলন ঘটানো চাই—“আমি দেখতে চাই দ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে আবিষ্কারকের সামঞ্জস্য। আমরা বহুদিন থেকে বলে এসেছি, ‘আকাশকে জয় করব’; তোমরা তো জয় করলে—এখন তেমনি করে নৈতিক সমস্যাগুলি জয় করো।”

এ প্রসঙ্গে লীগ অফ নেশনের কথা উঠলে কবি বলেন—“তোমরা কখনো মানুষকে এ অবস্থা থেকে organisation বা institution-এর দ্বারা উদ্ধার করতে পারবে না...ব্যক্তিগত মানুষই সর্বদা মানুষের উদ্ধার করেছে, মানবসভ্যতা বিভিন্নক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মহৎ ব্যক্তিদের দান। জগতের পরিবর্তন ঘটবে অজ্ঞাতসারে—কেমন করে ঘটবে হয়ত আমরা জানতেও পারব না। হয়ত সেই মুক্তির শক্তি এখনই কাজ করছে এবং আমাদের হয়ত জানাই নেই কত ঊর্ধ্বমুখী মানবচিত্ত নীরবে সেই মুক্তিপথের সাধনা করে চলেছেন...আদর্শের সত্যতায় বিশ্বাস স্থির রেখো। যখন সে আদর্শ প্রচার হবে তখন বহু মানুষ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, তাদের

প্রভাবে বিপুল পরিবর্তন আসবে এবং জগৎ আশ্চর্য হয়ে ভাববে এ কী করে ঘটতে পারল।”১

দ্রষ্টার এই ভবিষ্যদ্‌বাণীকে বিশ্লেষণ করে বিস্মিত মনে লক্ষ্য করি জগতের যুদ্ধাশ্রয়ী ও সর্বাপেক্ষা সংঘগ্রথিত দেশগুলির মধ্যেও ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রভাব আজ কত বড় হয়ে উঠেছে—organisation-এর মধ্যে personality অজ্ঞাতসারে আপন কর্তব্যে রত হয়েছে। দেশে বিদেশে রাষ্ট্রনেতাদের যাতায়াত ও বিরুদ্ধবাদী দেশগুলির মধ্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিচয়কে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে, বড় করে তুলে তারই সাহায্যে বিশ্বসমস্যা সমাধানের দিকে বিশ্ববাসীর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। চলেছেন নেহরু, ক্রুশেচভ, আইসেনহাওয়ার, সঙ্গে সঙ্গে কত মিশন, কত দল, কত গায়ক, বাদক, লেখক মানুষে মানুষে—দেশে দেশে মানুষের সম্বন্ধকে সত্য করতে চলেছে। এর মধ্যে কিছু ভান, কিছু কৌশল, কিছু ব্যর্থ আয়োজন থাকলেও যে সত্য সন্ধানেব প্রেবণায় এর জন্ম বহু বৎসরের পূর্বে পরাধীন বাধাগ্রস্ত ভারতবর্ষের কবির ভাবনা ও কর্ম তার মূলে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আকাশে ছড়িয়ে থাকে চিন্তার বীজ, আমাদের মনের ভূমিতে অনুকূল সময় পেলে তা উদ্ধত উদ্ভিন্ন হয়, কে-ই বা খেয়াল করে কোন পথে কোথা থেকে এ ভেসে এল। বুদ্ধিমান ভাবে এ আমারই বুদ্ধি, কৌশলী ভাবে এ আমারই কৌশল মূক অতীত কোনো দাবি করে না, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করে সেই উর্বরাভূমিতে—জানে এ ফসল তারই।

ক্যানাডায় সম্মেলন শেষ হবার পূর্বে একটি ঘটনা ঘটেছিল যাতে বোঝা যায় ঐ দেশে কবি মানুষের কত প্রিয় হয়ে ছিলেন। “একদা একটি সিনেমা ছবি দেখানো হচ্ছিল তার মধ্যে জার্মানির ছাত্র-আন্দোলনের দৃশ্য ছিল, একটি অংশে এক জার্মান ছাত্রদলের শান্তিনিকেতন ভ্রমণদৃশ্য দেখানো হচ্ছিল। সেই দৃশ্যে কবিকে বিদেশী ছাত্রদের অভ্যর্থনারত দেখা গেল। কবির পরিচিত মূর্তি ছায়াপটে ফুটে ওঠা মাত্র সমস্ত দর্শকবৃন্দ হর্ষধ্বনি করে উঠল ও যতক্ষণ শান্তিনিকেতনের দৃশ্য চলছিল ততক্ষণ অবিরাম উল্লাসে তারা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিল।”২

ক্যানাডায় শুধু বক্তৃতাকালীন জনপ্রিয়তা নয়, কবির ব্যক্তিত্বের স্পর্শ বহু চিত্তকে গভীর ভক্তিরসে পূর্ণ করেছিল, পাশ্চাত্ত্য জগতে এ ঘটনা সুলভ নয়। কাগজে লিখছে—‘ঠাকুরের অনুরক্ত ভক্তদের ভিড় আটকানো অসম্ভব হয়ে পড়ত। সকলেই একবার তাঁর দর্শনপ্রার্থী, একটিমাত্র কথা শুনে চলে যাবে। তবু অনেক সময় অনেককেই বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে,

---

[১] *Vancouver Star*, April 12, 1929.

[২] *Vancouver Star*, A Reflection by Noel Robinson.

তখন তাঁর ঘরের দরজার সামনে ফল ফুল যে যা এনেছে অর্ঘ্যের মত সাজিয়ে রেখে চলে গিয়েছে...একজন মহিলা তিনশত পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মোটরে এসেছিলেন কবিকে একটি পুষ্পমাল্য উপহার দিতে, কিন্তু এসে দেখলেন তখন বিশ্রামের সময়, তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ। বৃদ্ধ দরজার সামনে সিঁড়ির উপর মালাটি রেখে তিনি লিখে গেলেন, 'আপনার এক অজ্ঞাত ভক্তের উপহার।' এমন ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস বহু কবিতায়, ছন্দবন্ধে সে সময়কার কাগজে পত্রিকায় দেখা যায়। একটি কবিতার শিরোনামা দেখেছি —'জনতার মধ্যে তোমার বাণী শ্রবণপ্রার্থী আমি একজন।'

ক্যানাডায় মহামতি এনড্রুজ কবির বক্তৃতাকালে উপস্থিত ছিলেন। কিছু দিন পরে 'কবির ক্যানাডা ভ্রমণ' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ক্যানাডার যে অংশকে 'ব্রিটিশ কলম্বিয়া' বলে সেই অংশে এশিয়া-বিরোধী মনোভাব অর্থাৎ বর্ণবিদ্বেষ বহুদিন ধরে খুবই প্রবল। প্যাসিফিকের তীর ধরে বহুদূর পর্যন্ত এই বর্ণবিদ্বেষের প্রাবল্য। কবিকে নিমন্ত্রণ করাতেও ঐ এডুকেশন কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ যুক্তিহীন মূঢ় আক্রোশেপূর্ণ বর্ণবিদ্বেষ সেখানে এমনই প্রচণ্ড ছিল যে, যে কোনো মুহূর্তেই তা দাঙ্গায় পরিণত হতে পারত। রবীন্দ্রনাথের মত সর্বজনমান্য মহাজনের সামনেও তা ঘটা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবি এ বিদ্বেষের কিছুমাত্র চিহ্ন ক্যানাডায় দেখতে পাননি। ঐ সম্মেলনে তিনিই ছিলেন প্রধান, তাঁর ব্যক্তিত্ব আর সকলের ঊর্ধ্বে তাঁকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছিল। যে কেহ সে কন্‌ফারেন্সে গিয়েছিলেন তাঁর জন্যই তাঁদের প্রধান আগ্রহ ছিল। এনড্রুজ সাহেব লিখেছেন :

'আমার এই সংক্ষিপ্ত রচনায় জনসাধারণের উপর তাঁর প্রভাব কী রকম প্রবল হয়েছিল তারই একটা ছবি দিতে পারি।...তিনি যেন অন্য এক জগৎ থেকে এসেছেন, সেই সত্য,, সুন্দর ও সামঞ্জস্যের জগতের প্রভাব সকলে যে অনুভব করেছিল তা সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যখন পথ দিয়ে চলেছেন, পথচারী জনতা ভক্তিনম্র হয়েছে, সে ভক্তি এমনি গভীর যেন তাদের সামনে দিয়ে স্বয়ং যিশুখ্রীষ্ট চলেছেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র ভক্তির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় চিন্তামাত্র না করে টুপি খুলে ফেলেছে, নত হয়েছে। এমন অনেক কঠিন হৃদয় লোকের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে যাদের বুদ্ধি কঠিন, ভাবাবেশের বিশেষ বালাই নেই, তাঁরাও আমায় বলেছেন যে ইতিপূর্বে তাঁদের জীবনে আত্মিকভাবের এমন প্রভাব কখনো পড়েনি, ইন্দ্রিয়াতীতের এ রকম অনুভব কখনো জানেন নি।...সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখেছি যখন মায়েরা তাঁদের শিশু সন্তান নিয়ে কাছে এসে

দাঁড়াতেন। জনপথের হোটেলের দরজার সামনে ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। একবার একটি বিধবা পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে কবির কাছে এলেন—ছেলেটি অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। স্নেহ-বিচলিত হৃদয়ে কবি তার ছোট মাথাটির উপর হাত রাখলেন। যাবার সময় ঐ নারীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তাঁর জীবনের সে বড় আনন্দের দিন, তাঁর সর্বস্বধন সন্তান আজ মহতের স্পর্শ পেয়েছে। শিশুটি তার শিশুসুলভ ঔৎসুক্য নিয়ে আমায় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল—"ইনি কি যিশাস?" আমি বললুম, "ইনি তাঁরই মত শিশুদের ভালবাসেন।"

...ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপের ভিক্টোরিয়াতে তিনি প্রথম বক্তৃতা দিলেন। ভিক্টোরিয়াতে ৪০ হাজার মাত্র লোকের বাস—দু-হাজার লোকের জন্য টিকিটের বন্দোবস্ত হয়েছিল তবু সেই বৃষ্টির রাত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যার উপরে তিন হাজার লোকের বেশী বাইরে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল যদি শেষ মুহূর্তে কোনো স্থান খালি হয় সেই আশায়। ভিড়ের চাপ এত বেশী ছিল যে কয়েকটি মেয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, এম্বুল্যান্সের দরকার হল। নিষ্ঠুর বর্ষা পড়তে লাগল, তবু তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল সভাগৃহের বাহিরে, পথে, শুধু একবার তাঁকে দেখবার জন্য।...ভ্যাঙ্কুভারে ভিড় আরো বেশী হয়েছিল, তাঁর বক্তৃতা-সভায় পাঁচ হাজার লোক এসেছিল আর বাহিরে এক চতুর্থ মাইল দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ জনতা দাঁড়িয়েছিল। কবি একই বিষয় আবার বললেন, আবার ঐ রকমই ভিড় হল। রাত্রি পৌনে দশটার সময় কবির বক্তৃতা সুরু হবে কিন্তু বিকাল ৩টা থেকে লোক জড় হতে লাগল—আবারে বৃষ্টি নামল, আর এবার অবিরাম ধারায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পড়তে লাগল—তবু লোকে ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে রইল। এরকম দৃশ্য আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। এত দুর্যোগেও সেই অপেক্ষমান মানুষদের ধৈর্য আর খোস্‌মেজাজের অভাব হয়নি। তারা একেবারে কৃতনিশ্চয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তবু শেষ পর্যন্ত বাহিরের জনসংখ্যার থেকে পঞ্চাশ জনের বেশী ঢুকতে পায়নি। অবশেষে কবির ভাষণ রেডিওতে শোনা যাচ্ছে শুনে অনেকে দৌড়ে বাড়ি ফিরে গেল শুনতে। এ সমস্তই ঘটেছিল প্যাসিফিক তীরের সব চেয়ে বেশী 'এশিয়া বিরোধী' সহরে—একেবারে সেই স্থানেই যেখানে 'কোমাগাটা মারু'র বিপত্তি ঘটে গেছে।'...

এই ঘটনার আলোচনা করে এন্‌ড্রুজ বলছেন—"এর অর্থ কি? নিশ্চয় এ চিত্তশক্তির প্রভাব, আত্মার বিজয়।" তা ছাড়া আর কিছুতেই এমন ফল পাওয়া যেতে পারে না। তাঁর আরো মনে হয়েছে যে এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যে সব অন্যায় আচরণ সে দেশে ঘটেছিল তার জন্য কিছু অনুতাপও এর মধ্যে ছিল।

…"যাই হোক এই প্রীতি সুন্দরতর কোনো দিনের উষার আভাসের মত দেখা দিয়েছিল। এ জন্য কবির নিজের কি যে দাম দিতে হচ্ছিল তা যাঁরা তাঁর নিকটে থাকতেন তাঁরা ছাড়া কেউই জানেন না। সভামঞ্চে প্রত্যেকবার প্রচেষ্টার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন, মাঝে মাঝে তাঁর বেদনা ও কষ্ট অত্যন্ত বেশী হত। ধারণা করা যায় না যে তাঁর মন কী রকম পরিশ্রান্ত শরীর কী রকম অবসন্ন হয়ে পড়ত।…যাহোক জাতি বিদ্বেষের সঠিক রূপটা না দেখে তাঁর এ যাত্রা শেষ হয়নি। ইউনাইটেড্ স্টেটে ঢুকবার পথে তিনি নিজেই যে ব্যবহার পেলেন তাতে ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বজাতিদের কী দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। ব্যাপারটা যদিও তিনি হালকা করে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর বিপুল ধর্মবিজয়ের উপর একটি কালো ছায়া ফেলে রইল।"

মহামতি এনড্রুজ যে ঘটনার আভাস দিয়েছেন, আমেরিকার সেই অপকীর্তি উল্লেখ না করে ক্যানাডা কাহিনী শেষ হয় না। ক্যানাডা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পাশপোর্ট হারিয়ে যাওয়ায় আমেরিকা প্রবেশের মুখে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তারই খুচরো খবর নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে খুব বড় রকম আন্তর্জাতিক গুজবের সৃষ্টি হয়। 'দি সানফ্রান্সিস্কো নিউজ' নামে একটি কাগজে তার বিস্তৃত একটি বিবরণ রয়েছে। বিবরণটির শিরোনামা 'জগতের রীতি' (Ways of thc World) ও 'ঠাকুরের প্রতি অসৌজন্য' Discourtesy to Tagore—

"কিছু দিন পূর্বে ক্যানাডা গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিখিল-বিশ্বশিক্ষা-সম্মেলনে ভ্যাঙ্কুভারে নিমন্ত্রিত হন—ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আরউইন ও বাংলা গভর্নমেন্ট একজন কর্মচারীকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করেন। যখন ঠাকুর জাপানে পৌঁছলেন কোবেস্থিত আমেরিকান কন্‌সাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে যে ইউনাইটেড স্টেটে তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হবেন। ক্যানাডার তীরে বিদায়কালে সরকারীভাবে তাঁকে অভিনন্দিত করে—ভ্যাঙ্কুভার ও ভিক্টোরিয়াতে সহস্র সহস্র লোক তাঁর কথা শোনার জন্য বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়েছিল—ফেরার পথে অল্প কয়েকদিনের জন্য তাঁর সানফ্রান্সিস্কো যাবার ইচ্ছা ছিল। লস্ এঞ্জেল্‌স-এ কাজ শেষ করে পানামা ক্যানাল দিয়ে তাঁর ইংল্যান্ড অভিমুখে যাবার কথা। অক্সফোর্ডে তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া স্থির ছিল। ক্যানাডার সীমা পার হবার মুখে একটি ঘটনায় এসব ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। তাঁকে জানান হয়েছিল যে ইমিগ্রেশন অফিসে তাঁকে নিজেকে উপস্থিত হতে হবে। বন্ধুরা বলেছিলেন তাঁর শরীর অসুস্থ একটা নির্দিষ্ট সময় স্থির হওয়া চাই। ইমিগ্রেশন অফিসের

কর্মচারী বললে—“বিকেলের দিকে এলেই হবে, তারপর দেখা যাবে কি করতে পারি।” বিকেলে ঐ কর্মচারীকে যদিও কবির পরিচয় দেওয়া হয়েছিল তবু তাঁকে প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পরে ঐ ব্যক্তি হাত নেড়ে ইসারা করে, ‘এদিকে আসুন’। একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে, ‘এখানে বসুন’। তারপর প্রশ্ন শুরু করে। প্রশ্নগুলি এই প্রকার—‘আপনার প্যাসেজের টাকা কে দিল? আপনি জেলে ছিলেন? লিখতে পড়তে জানেন? আপনি কি আমেরিকায় বরাবর থাকতে চান?’ রবীন্দ্রনাথ ধীরভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, ‘শেষ প্রশ্নে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, এক মুহূর্তের জন্য বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন, ‘না, না, না।’ কাগজটি মন্তব্য করছে—‘অবশ্য এ ঘটনায় আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রীতি বেড়ে উঠতে পারে না। সভ্যতার উজ্জ্বলতম রত্ন বলে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যাঁর খ্যাতি তাঁর প্রতি এ ব্যবহার সমগ্র জগতের কাছে আমাদের অভদ্রতা ও অসৌজন্যের দৃষ্টান্ত হয়ে গেল।’

১৮ই এপ্রিল কবির লস্ এঞ্জেল্স্-এর পৌঁছবার সংবাদ সবিস্তারে প্রকাশিত হল। তারপরই খবর বের হল যে তিনি আমেরিকা থেকে এখানে এসেছিলেন ও হঠাৎ জাপান চলে গেলেন। অসুস্থতাই তাঁর মত পরিবর্তনের কারণ এই রকম প্রথমে রাষ্ট্র হয়েছিল, পরে ক্রমে ক্রমে সব খবর প্রকাশ পেল।

পরে কবি নিজেই এ সম্বন্ধে সাংবাদিকদের বলেছিলেন—“আমেরিকায় আমার অনেক বন্ধু আছেন, তাঁরা যথার্থ ভাবুক, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অসীম—আমি আমেরিকার মহাজনদের লেখা বই পড়েছি, তাতে আমার মন তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, আমার আশা হয় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে বিশেষ রূপটি প্রকাশ পাচ্ছে এই দেশে তা সম্পূর্ণ হবার একটি বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আমি আমেরিকার জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখি কিন্তু যাদের গায়ের রং কালো আমার সেই স্বদেশীয়দের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা আছে কাজেই যদি তারা আমেরিকায় এই ধরনের ব্যবহার পায় তা হলে কোনো আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন এশিয়াবাসীর ঐ দেশের উপর জোর করে আতিথ্যের দায় চাপাবার প্রয়োজন দেখি না।..ঐ কর্মচারীর কোনোই দোষ নেই—তার এশিয়াবাসীদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করাটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে যে কোনো পার্থক্য করেনি তাতে আমি খুশীই হয়েছি...” বলতে বলতে তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ও একটু হেসে বললেন, “জানো আমেরিকান কাগজে এই রটেছে যে সে দেশের প্রতি আমার ভারি বিদ্বেষ। একথা একেবারেই মিথ্যা। ঐ দেশের লোকদের আপন আপন সদগুণ আছে, কিছু কিছু রূঢ় গ্রাম্যতাও আছে, আবার কিছু আছে যা মনোরম।

...এই ঘটনা আমি কখনই প্রকাশ হতে দিতাম না কিন্তু আগেই তা হয়ে গেছে, কাজেই এখন মনে করি সবটা সত্য যেন প্রকাশ হয়। লস এঞ্জেলসে সাংবাদিকরা আমায় বহু প্রশ্ন করেছিল কিন্তু আমি একেবারে নীরবে ছিলাম। আমার নালিশ করে বেড়ানোর অভ্যাস নেই, ওটা ভারি অশোভন। কিন্তু আমার সঙ্গে একজন আমেরিকান সঙ্গী ছিলেন, তাঁকে এই অপমান আমার চেয়েও তীব্রভাবে বেজেছিল। তিনি ঐ কর্মচারীকে এমন চটকদার সব আমেরিকান গাল দিয়েছিলেন যে সে ভাষা আমার পূর্বে শোনাই ছিল না। নৈলে এসব কথা প্রকাশই পেত না।"[১] তিনি আবার হাসলেন, সখ্যপূর্ণ সহৃদয় হাসি।

এক বৎসর পূর্বে কবি একটি সভায় সাংবাদিকদের কাছে ইংল্যান্ডে বলেছিলেন যে, আজ যদি স্বয়ং যিশুখৃষ্ট আমেরিকায় আসতেন তবে তাঁর যথেষ্ট ডলার নেই বলে তাঁকে নিশ্চয় বহিষ্কৃত করা হত। কবির এই কথার অনেক সমালোচনা হয়েছিল। এই ঘটনাতে সে কথার সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেছে কাজেই বিদেশে কবিকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি সহজে রাজনীতি আলোচনায় লিপ্ত হতে চান না। আমেরিকায় সাংবাদিকদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়ে কবি বলেছিলেন—"আমি শুধু দুটি দেশে পলিটিক্স আলোচনা করি—এক ইংল্যান্ডে ভারত রাজ্যশাসনের যাদের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ, আর এক ভারতবর্ষে।"

তথাপি মিস্ মেয়োর কুখ্যাত বই সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে—"যে বই থেকে পচা মাংসের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে তাতে এত রুচি কেন তোমাদের? ঐ বই আমেরিকায় এত বিক্রী হল কি করে, পাপ দুর্নীতি ও কুৎসিত যৌনাচারের খবরে এত আমোদ পেতে অভ্যাস করেছ বলেই নয় কি?"

সাংবাদিক লিখেছেন—কবি তাঁর নির্ভুল অক্সফোর্ড উচ্চারণে বলে চলেছেন ভারতের অচ্ছুৎদের কথা।

"মানব চরিত্র কি বিচিত্র! তোমাদের কাগজ পড়তে আমার ভারি মজা লাগে...তোমরা অস্পৃশ্যদের কথা এমনভাবে বল, লেখ যেন এরকম একটা ব্যাপার কল্পনার অতীত। তবু তোমাদের নিজের দেশে তো এই ব্যাপারই ঘটছে, নিগ্রোরা তোমাদের অস্পৃশ্য! তোমরা তাদের সঙ্গে অস্পৃশ্যের মতই ব্যবহার কর।"

ঠাকুর তারপর অনেকদিন পূর্বের একটি ঘটনা বললেন—একবার আমেরিকা

---

[১] Pekin & Tienstin in China, Tokyo, May 14, 1919.

ভ্রমণকালে 'বাসের' যে অংশ নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে সেখানে বসেছিলেন তখন কন্ডাক্টার এসে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিল। ভাবখানা ছিল—'নিগ্রোদের জায়গায় বসতে লজ্জা নেই!'

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল অবশ্য উল্টোভাবে। কবি বললেন, "ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্যদের সঙ্গে একসঙ্গে খায় না—তোমরাও তো ঠিক তাই করো। তোমরা তো এক রেস্তোরাঁয় কৃষ্ণবর্ণের সঙ্গে খাও না। তোমাদের এমনি অন্ধতা যে এর মানেটা বোঝ না, এসব জিনিসের তাৎপর্য লক্ষ্য কর না। যখন তোমরা অন্যদেশের বিচার কর একটা কিছু ত্রুটি ধরে সমগ্র দেশের সমালোচনা কর—কিন্তু যখনই ইয়োরোপীয়ান ও এশিয়াটিকরা একত্র হয় এই ঘটনাই তো ঘটে—জাতিভেদ দেখা দেয়।"[১]

আমেরিকাবাসী আর একজন অখ্যাতনামা সাংবাদিকের রবীন্দ্র সন্দর্শন অভিজ্ঞতা কৌতূহলজনক। সাংবাদিকের প্রধান উদ্দেশ্য চটকদার খবর সংগ্রহ করে—কাগজে ফলাও করা। কিন্তু বারেবারেই দেখেছি যে কেহ তাঁর নিকটে গিয়েছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমস্ত উদ্দেশ্য তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে তাদের কাছে, তারা বিস্মিত মনে দেখেছে মানুষের পূর্ণতার ছবি, যখন লিখেছে—লেখাব আনন্দেই ভরে উঠেছে মন, বৃত্তান্ত বিবরণ ঢাকা পড়ে গেছে।...

"সেদিন আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটিয়েছি—হোটেল ভ্যাঙ্কুভারের অষ্টম তলায় উঠতে উঠতে আমি শ্রীযুক্ত এনড্রুজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি নামে কবিকে সম্বোধন করা হয়। তিনি বলেছিলেন কবি এসব বিষয় গ্রাহ্য করেন না। সোজাসুজি 'মহাশয়' বললেই চলে। এনড্রুজের কথায় আমি তাঁর চরিত্রের একটা দিক দেখতে পেলাম।

"ঠাকুরকে প্রথম দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারের পিছন থেকে। তাঁর হাতের উপর দিয়ে চেয়ারের ওপাশে উপবিষ্ট তাঁর উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। কবিদের চেহারা যে কবির মত হওয়া চাই এমন কোনো কথা নেই—কিন্তু হলে যে কত ভালো হয় তাতে আর সন্দেহ থাকে না। আমি নাপিত, রুটিওলা, কসাই প্রভৃতি লোকের মধ্যে কবির মত চেহারা দেখেছি, আবাব এমন কবিও দেখেছি যাদের চেহারা নাপিত, রুটিওলা বা কসাই যা কিছু বললেই চলে। এই প্রথম আমি এমন একজন কবি চোখে দেখলাম যাঁর মধ্যে ভাব ও রূপ (reality and appearance) একেবারে এক হয়ে গেছে।...কবির বক্তব্য খুব সহজ...সবচেয়ে লক্ষণীয় যে নিজের প্রাধান্য

---

[১] *Herald Tribune*, Dec., 1930.

সম্বন্ধে তিনি একেবারে উদাসীন। সমস্ত যথার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির মত নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করার অবস্থা তিনি পার হয়ে গেছেন—তিনি বিবেচনা করে যথাযথভাবে কথা বলেন, সে কথা এমন ধীর প্রশান্ত যে তাঁর চারদিকে যারা আছে তাদের মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে।...তিনি সমালোচনা করেন কিন্তু আমি তো কখনো মনে করতেও পারি না যে তার মধ্যে তিনি বিষ ছড়িয়ে দিতে পারেন—স্বর্গীয়, বিমূর্ত ভাবে নানা বিষয় আলোচনা করেন এবং পথচারী জনতার মাথার উপর দিয়ে এমন বায়বীয়ভাবে ভেসে যান যে তাদের পা মাড়িয়ে দেবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কুমতলব মনে নিয়ে আমি দুবার চেষ্টা করেছিলাম যে, তাঁর পদক্ষেপের পথের উপরে কি করে জনতার পা এগিয়ে দেওয়া যায় যাতে অসতর্ক হয়ে তিনি মাড়িয়ে ফেলেন, কিন্তু দুবারই অকৃতকার্য হলাম। একবার আমেরিকার মদ্যপান নিরোধ আইন সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করলাম, আর একবার জানতে চাইলাম ভারতবর্ষ ও আমেরিকার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে তুলনায় তাঁর কাকে কিরূপ মনে হয়। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—একটু ঘুরিয়ে এবং তাঁর উত্তর শোনা সত্ত্বেও সার রবীন্দ্রনাথের মদ্যপান নিরোধ সম্বন্ধে সঠিক কি ধারণা, বা উভয় দেশের শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাদের তিনি শ্রেয় মনে করেন সে বিষয় গত খৃষ্টমাসেও আমার যা জ্ঞান ছিল এখন তার চেয়ে বেশী নেই। ঠাকুরকে মিষ্টিক্ বলা হয়। এ বিশেষণ ভ্রমাত্মক। তাঁর চিন্তাক্রমে এমনই যুক্তিবাদ, তা এমনই তীক্ষ্ণ, যে তাতে রহস্যবাদী মরমীভাবের চাহিদা মেটে না।...ঠাকুর বস্তুতন্ত্রবিরোধী...তিনি যন্ত্রপাতির কদর্যতার প্রতি বিরূপ। কিন্তু সে বিরূপতা কোনো কুসংস্কারে উদ্ভূত নয়। গঙ্গার দুই উপকূলকে কল কারখানার ধূম্রকলঙ্কিত দেখার চেয়ে তরুশ্রেণী বলয়িত দেখতেই তাঁর ভালো লাগে—তাঁদের বাল্যকালে যেমনটি দেখেছিলেন—তবু তাঁর আপত্তি বৃদ্ধ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের মত নয়—যাঁরা মনে করেন পুরাতন সর্বদাই নূতনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ!...

..."আমি পূর্বেই বলেছি ঠাকুরের কাছে এলে আপনা থেকে মনে ভক্তির ভাব জেগে উঠে। এখানে তারই একটি উদাহরণ দিচ্ছি যাতে আমার বক্তব্য বোঝা যাবে। সাধারণত কোনো সাংবাদিক সাক্ষাৎকারের সময় আমি আমার আঙ্গুলের মধ্যে সিগারেট চেপে ও মাঝে মাঝে দু-এক টান দিতে দিতে কথোপকথন করি, করতে ভালবাসি। কিন্তু তাঁর সামনে যে সিগারেট খাওয়া যায় একথা আমার মনেই আসতে পারল না। চার্চে গিয়ে সিগারেট খাওয়া যেমন অশোভন তাঁর সামনেও ঠিক তেমনি হত।...তোমরা মনে করতে পার এ আমার একটা বোকামি, ঠাকুর নিজেও হয়ত তাই বলবেন ...টেবিলের উপর ছাইদান তো ছিলই..."

মনে রাখতে হবে একথা লেখা হচ্ছে আমেরিকা থেকে, অনুভব করছে একজন সেই দেশের সাংবাদিক যে দেশে সাধারণের রীতি গুরুজনের সম্পর্কে নম্রতা প্রকাশ করে না, ধূম্রপান যে রীতিবিরুদ্ধ সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই থাকতে পারে না।

কবি নিজেকে উচ্চমঞ্চে তুলেও রাখেন না, হাস্যে পরিহাস্যে আলাপে সকলের সঙ্গে মিলিত হন তবু তাঁর সত্তা মন্দির চূড়ার মত থাকে স্থির উন্নত—ভক্তির পরিমণ্ডল সৃষ্টি ক'রে।

রাশিয়া

১৯২৬ সালে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েও অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ স্থগিত রইল। ১৯৩০ সালে পুনর্বার নিমন্ত্রণ আসে ও শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী ও অন্যান্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কবি রাশিয়া-ভ্রমণে যান। আমরা শুনেছি যে রাশিয়া-ভ্রমণের সংকল্প থেকে তাঁকে অনেকে বিরত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু এই নূতন সমাজ-পরীক্ষা স্বচক্ষে দেখবার আগ্রহ তাঁর প্রবল। কাজেই তাঁরা কৃতকার্য হননি।

ঐ দেশের কাগজে-পত্রে তৎকালীন যেসব খবর বেরিয়েছিল তার কিছু কিছু রক্ষিত থাকলেও তা রুশভাষায় লিখিত হওয়ায় আমার অনধিগম্য হয়েছে। কাজেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে নূতন কোনো কাহিনী বা রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে, সন্দর্শনে ঐ দেশবাসীর ব্যক্তিগত মনোভাবের কোনো বিবরণ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কঠিন।

রাশিয়া ভ্রমণকালের বক্তৃতা, ভাষণ, ও নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার কিছু কিছু শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী কর্তৃক রক্ষিত হওয়ায় তা মডার্ন রিভিউ ও বিশ্বভারতী বুলেটিন-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া সে দেশের নূতন সমাজব্যবস্থা, শিক্ষার আদর্শ ও প্রচারনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে কবি তাঁর মতামত 'রাশিয়ার চিঠি'তে খুলে রেখে গেছেন। সে সম্বন্ধে নূতন করে জানাবার কিছুই নেই।

তবু বর্তমান গ্রন্থে ঐ মহাদেশের প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিতে [illegible] র না। সেজন্য অন্যান্য প্রসঙ্গে কবির ঐদেশের প্রতি ভাবনার যেটুকু বিবরণ পেয়েছি তা এখানে সংগৃহীত হল। কেউ যেন মনে না করেন খুঁজে খুঁজে প্রশংসা-গুলিই আমি সংগ্রহ করেছি। তার কোনো কারণ নেই—ঐ দেশের সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো আত্মীয় সম্বন্ধ নেই। একবার আমেরিকায় ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কোনো প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হয়ে কবি বলেছিলেন—ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে আমি দুটি দেশে আলোচনা করি. আর কোথাও নয়, এক ভারতবর্ষে আর এক ইংল্যান্ডে যে দেশের লোক ভারতের অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমার মনে হয় রাশিয়ার সম্বন্ধেও কবির মনোভাব কতকটা সেইরকম। সেদেশের সম্বন্ধে যা কিছু আশঙ্কা তা তিনি সেদেশেই বলে এসেছিলেন, বাইরে বড় একটা বলেন নি। মডার্ন রিভিউতে একটিমাত্র প্রবন্ধে সেই আশঙ্কারই পুনরুক্তি দেখেছি। আমরা কারু কারু কাছে এও শুনেছি যে রাশিয়াতে মানবকল্যাণকর্মের মূলনীতির বহু প্রশংসা করলেও

রবীন্দ্রনাথ কমিউনিজমের তত্ত্ব বা ইডিওলজি সম্পূর্ণ বুঝতে পারেননি, যেমন রাসেল বা রোমাঁ রোলাঁ পেরেছিলেন। এ কথার বিশদ বিশ্লেষণ করবার মত শাস্ত্রজ্ঞান আমার নেই। কমিউনিজমের ইডিওলজি আমার জানা নেই তো বটেই, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরও ছিল না, বিশেষত তিনি কোনো ইজমেরই ধার ধারতেন না, সহজভাবে যা ভালো ও যা মন্দ তা গ্রহণ-বর্জনের নীতিই ধর্মাধর্মের নিত্য পথ খুলে রেখেছিল, সেই উন্নত প্রশস্ত মুক্ত পথই তাঁর পথ, কোনো ডগমা বা মতবাদের খোঁদল-কাটা পথ নয়।

যেমন অন্যদেশের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে রাশিয়াতেও তাই, সেইরকমই, ন্যায়নিবদ্ধ দৃষ্টিতে ভালোমন্দ বিচার করে স্বচ্ছন্দে নিঃসংকোচে নিজের বক্তব্য বলে গেছেন, তা কোনো উদ্দেশ্যপ্ররোচিত নয় বলেই সমালোচনাও অপ্রিয় ঠেকেনি। অন্তরের সত্য বিশ্বাসে ও হিতাকাঙ্ক্ষায় উচ্চারিত শাসন-বাণী নিন্দা বলে বোধ হয় না, তা আশীর্বাদের মত শ্রোতার মনের উপর ঝরে পড়ে।

রাশিয়ার মানবহিতকর কর্মের মধ্যে উচ্চমঞ্চ থেকে দয়াদাক্ষিণ্য বর্ষণের পরিবর্তে মানুষকে ভিতর থেকে তৈরি করার কাজ তাঁকে বিশেষভাবে চমৎকৃত করেছিল। এই কাজে তিনিও ব্রতী। দারিদ্র্যে, অশিক্ষায়, মূঢ়তায় অবহতচেতন মানুষকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার যে বিপুল সমস্যা ঐ দেশে প্রবল উদ্যমের সঙ্গে সমাধান করা হচ্ছিল তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অবস্থার তুলনা করে তিনি যেন পথ দেখতে পাচ্ছিলেন। কারণ নানা ধর্মে এবং জাতিতে বিভক্ত ও দারিদ্র্যের সহযোগী কুসংস্কারে পঙ্গু ঐ দেশের জনসাধারণের অবস্থা ভারতবর্ষের সঙ্গে একই রকম ছিল।

এই কঠিন কাজ যে নীতির দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছিল তার মধ্যে সৌভ্রাত্র্য, মানবতার আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। তথাপি অল্পদিন দেখেছেন বলে যে প্রধান ছিদ্রটি তাঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল তা নয়। কিংবা চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে আনাও সম্ভব হয়নি। মস্কো পরিত্যাগের দিন ইজভেস্তিয়ার রিপোর্টারের মারফত রাশিয়ার প্রতি তাঁর সাবধানবাণীতে সে কথা স্পষ্ট হয়েছে। সেই প্রীতিবদ্ধ অনুশাসনের মধ্যে কবির সদাপ্রসন্ন করুণাপূর্ণ হৃদয় উদ্ভাসিত। তিনি বুঝিয়ে বলছেন, তোমরা যে কাজের ভাব নিয়েছ তা মহৎ, সেইজন্যই মহত্ত্বেই যেন তার প্রতিষ্ঠা হয়। তোমাদের কাজ তো শুধু তোমাদের দেশটুকুর জন্য নয়, সর্বমানবের জন্য। মানুষে মানুষে মতভেদ থাকবেই, তাছাড়া মতও ক্রমাগতই পরিবর্তনশীল। তোমরা যাদের মতানুবর্তী করতে চাও নৈতিক বুদ্ধিতে প্রেরণার দ্বারাই তা করণীয়। নিষ্ঠুরতার দ্বারা হিংস্রনীতির দ্বারা তা হবার নয়। তোমরা তো সর্বমানবের বন্ধু হবার ব্রত নিয়েছ—শত্রু কি মানুষ নয়—তাদের প্রতি বিদ্বেষ করবে

কেন? তোমাদের সংকল্প সাধনের দ্বারা তাদের মিত্র করে, অনুবর্তী করে নাও। সত্যকে জানবার জন্য মনের মুক্তি চাই, জবরদস্তি করলে তা ভয়েই মরে যায়। পাশব শক্তির দ্বারা পাশব শক্তি জয় করা যায় না, সে শুধু মানুষই পারে। তিনি আরো বলেছিলেন জারের সময়কার যেসব দুষ্য জিনিসের তোমরা উত্তরাধিকারী হয়েছ, অত্যাচারস্পৃহা তার মধ্যে একটি—এটিও কেন নষ্ট করে ফেল না?—তাঁর শেষ উপদেশ—তোমাদের আদর্শ মহৎ তাই তোমাদের বলে যাচ্ছি মুক্তির বিস্তৃত ক্ষেত্রে এর ভিত্তি গড়ে তুলে সে আদর্শ সার্থক করো।

যা নিয়ে এত গোলযোগ অর্থাৎ মতের স্বাধীনতার অভাব বা শাসনের জুলুম এই প্রধান দুটি অনুযোগের কারণ কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। এবং আতিথ্য-সমাদরের সমারোহে সে বিষয়ে চুপ করে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মুক্ত কণ্ঠে অন্তরের সত্য বিশ্বাস ঘোষণা করাই সেই স্বাধীনচিত্ত, নির্ভীক বিশ্ববন্ধুর চিরধর্ম। তবু যদি আমরা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে লক্ষ্য হয় এই দেশের প্রতি তাঁর একটু পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করলেও রাশিয়া সম্বন্ধে কঠিন বিরুদ্ধতা পাওয়া যায় না। বোঝা যায় তাদের প্রচেষ্টার সততায় তাঁর বিশ্বাস ছিল। ত্রুটির নির্দেশ করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে বিমুখতা নেই। মানব-কল্যাণকর্মের সর্বদিকব্যাপী বিপুল প্রবাহে তাঁর মন প্লাবিত। সন্দেহ হয় আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন হয়ত বা কমিউনিস্ট বলে তাঁকে জবাব-দিহিতে পড়তে হত! অন্তত রবীন্দ্র মেমোরিয়াল প্রাইজ তো পেতেনই না!

রোমাঁ রোলাঁ তাঁর ডায়রিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা লিখেছেন (১৯২০)। সেখানে রাশিয়ার উল্লেখ রয়েছে :—"তাঁর (কবির) মনোগ্রাহী ভদ্রতা সত্ত্বেও বোঝা যায় যে তাঁর মনে ইয়োরোপের চেয়ে এশিয়ার বিশেষ করে ভারতবর্ষের নৈতিকজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়। তিনি বললেন, 'ইয়োরোপ কুশলী কর্মীর মত একটি সুন্দর বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেছে কিন্তু তার থেকে সংগীত উৎসারিত করতে শেখেনি। এ কাজ ভারতবর্ষের।'—"

তারপর তাঁদের দুজনের হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলল। কবি বলেছিলেন শান্তির আদর্শ ভারতবর্ষের মর্মগত—হিন্দুরা কখনো হিংসা দ্বারা হিংসাকে রোধ করতে চায় না। (অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধম্‌ অসাধুং সাধুনা জিনেৎ।) রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন, আমি বললুম, "সে কাজ একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে করা সহজ এবং হয়ত অহিংসার পথে তারা সফলও হতে পারে কিন্তু ইয়োরোপীয়দের পক্ষে তা সম্ভব নয়—তারা যে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে!"

নানা প্রসঙ্গে কথা চলেছে, কবি বলছেন, "ইয়োরোপীয়রা ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবহারে ভদ্রতা দেখালেও যথার্থভাবে বুঝতে পারে না। মর্মে প্রবেশ করতে পারে না। কোনো কোনো ইংরেজ খুব চেষ্টা করেছেন, হয়ত কিছু বুঝতেও পেরেছেন কিন্তু হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের সান্নিধ্যে আসতে পারেননি। এর কারণ সমবেদনার দৃষ্টির অভাব।"

রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন, "আমরা দুজনেই একমত হলাম যে এ বিষয়ে রুশীয়রা দক্ষ। তারা অপর জাতির ভাবপ্রবণতা ঠিকমত বুঝবার শক্তি রাখে—এমন একদিন আসবে যখন তারাই এশিয়া ও ইয়োরোপের মধ্যে সেতুবন্ধন করবে।"

রবীন্দ্রনাথের ঐ দেশ সম্বন্ধে যে প্রীতি লক্ষ্য হয় তিনি তার প্রত্যুত্তর পেয়েছেন। রাশিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার প্রমাণ দিয়েছে।

আমরা জানি বর্তমানে পাশ্চাত্যদেশে রবীন্দ্রকাব্য অনুশীলনে তাঁরাই অগ্রণী। আটখানি গ্রন্থাবলীতে সংকলিত রবীন্দ্রকাব্য সরাসরি বাংলা থেকে অনুবাদ করেছেন। সম্পূর্ণ নিজেদের উৎসাহে নিজেদের চেষ্টায় তাঁরা এ কাজ করেছেন যা আজ পর্যন্ত অন্য কোনো ভাষায় হয়ে ওঠেনি।

এমনকি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাতেও কেউ কষ্ট করে একাজ করেননি। ইংরেজি থেকে অনুবাদ হয়ে এসেছে। রাশিয়াতে দেশব্যাপী রবীন্দ্রানুরাগ এত গভীর যে কোনো বই প্রকাশ হওয়া মাত্র লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এ সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অন্যত্র লিখেছি।[১] অনেকে মনে করেন এর মধ্যে কোনো চালাকি আছে, এ একটা প্রচারকৌশল মাত্র। আমাদের তা মনে হয় না। কবির প্রতি গভীর অনুরাগের চিহ্ন সেদেশে সর্বত্রই দেখা যায়। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত সুধীন্দ্র বসুর একটি প্রবন্ধে টলস্টয়ের পুত্র কাউন্ট ইলিয় টলস্টয়ের কথাবার্তায় এই অনুরাগের কারণ অনেকটা বোঝা যায় এবং এও বোঝা যায় যে এই অনুরাগ দৃঢ়মূল। কারণ তা এ দুই দেশবাসীর মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য থেকে উদ্ভূত। বর্তমান রাশিয়ার ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক মিতালি করবার কৌশল মাত্র নয়।

ইলিয় টলস্টয় প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতার রুশ অনুবাদ করেন। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় সুধীন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রচিন্তাধারার সঙ্গে তার মিল আছে। যদিও প্রকাশভঙ্গী একেবারে পৃথক। সে সময়ে আমেরিকা ও রাশিয়া এরকম দুই পৃথক প্রবল শত্রুসমাজে বিভক্ত হয়নি।

---

[১] 'মহাসোভিয়েট' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে মহামতি টলস্টয়ের দ্বিতীয় পুত্রের কাছে আমেরিকা একেবারে ভাল লাগেনি। এই বিরূপতার মধ্যে প্রাচ্যমনের যে মিল আছে রাশিয়ায় রবীন্দ্রপ্রীতির সেখানেই মূল। তাই আমাদের প্রসঙ্গের মধ্যে স্পষ্টত না পড়লেও কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি যাতে সেই সাদৃশ্য লক্ষ্য হবে। ইলিয় টলস্টয় বলছেন :

“জানো আমেরিকায় আর রাশিয়ায় পার্থক্য কী? সোজা কথায় এই—ধরো যদি আমেরিকায় কোনো মানুষ দরিদ্র হয়, বেশী রোজগার করতে না পারে আমেরিকানরা মনে করে তার নিশ্চয় কোনো ত্রুটি আছে। আবার রাশিয়ায় কোনো লোক যদি প্রচুর রোজগার করছে দেখা যায়, রাশিয়ানরা বিচলিত হয় ভাবে, লোকটার গোড়ায় গলদ আছে। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই পৃথক। আমার দেশে বহির্জীবনের গতিবেগ এত দ্রুত নয়। কাজেই মানুষের অবসর আছে মানবজীবনের যা যথার্থ প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে মননা করবার। আর সেইজন্যই যদি কারু মন তার প্রতিবেশীর সঙ্গে একই খাতে না বয় সেও বেঁচে থেকে নিজের জীবনে নিজের পথে চলতে পারে। এখানে সে ধ্বংস পাবে। মামুলী চিন্তার স্তূপের মধ্যে তার কবর হয়ে যাবে (buried under the mass of average thought)।”

বিস্ময়ের কথা এই যে বর্তমানে রাশিয়া সম্বন্ধেই এই অভিযোগ শোনা যায়।

“তাই তো রাশিয়ায় আমরা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে থাকতে পারি। যে যার মতে থাকতে পারি (original)। যদিও আমাদের (এখানে অর্থ প্রাচ্য জাতির) জীবনদর্শন, রুচি পৃথক হতে পারে তবু আমাদের প্রাচ্যজাতির এই বিশেষত্বই (originality) জগতের উপর প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে, প্রকাশিত হয় আমাদের শিল্পে সংগীতে স্থাপত্যে সাহিত্যে। তার ফলে মানবজাতি উপকৃত হয়।”

ইলিয় টলস্টয়ের জনমতের দাসত্ব সম্বন্ধে মতামত অতি স্পষ্ট। তিনি বলছেন—

“সত্য স্বাধীনতা অর্থ আত্মার স্বাধীনতা, বিবেক মুক্ত রাখার স্বাধীনতা, স্বাধীন মতামত গড়ে তোলবার স্বাধীনতা। আইনের ভিত্তিতে তাকে গড়া যায় না, সে জীবনের মূলে স্থাপিত অন্তরের বিশেষ ক্ষমতা, বাইরের আরোপিত কিছু নয়। আবার রাশিয়ার সঙ্গে এদেশের (আমেরিকার) তুলনা করা যাক। সেখানে পূর্বের (জারের সময়ের) স্বেচ্ছাচারের যুগেও আমার অন্তরজীবন এখানকার চেয়ে মুক্ত ছিল। রাশিয়াতে আমার ভয় শুধু এ কাজ পুলিশ অনুমোদিত কিনা, কিন্তু আমার প্রতিবেশীর মত আমি গ্রাহ্য না করে স্বচ্ছন্দেই চলতে পারতাম। এখানে তা

নয়। আমেরিকায় জনমতের চাপে মানুষের দুর্ভোগ অতি অত্যাচারী পুলিশী জুলুমের চেয়েও বেশী।[১] আমেরিকায় সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হচ্ছে জনমতের প্রবাহের বিরুদ্ধে যাওয়া। সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষকেই স্রোতের সঙ্গে ভেসে গিয়ে অবশেষে কৈবল্য লাভ করতে হবে! যেমন চেষ্টা করে দেখো না একবার নারী আন্দোলনের (suffragates movement) বিরুদ্ধে কিছু বলতে। এই তুমুল আন্দোলনের প্রতিবাদ করলে যা হবে আর কোনো পাপেরই তার চেয়ে বেশী প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়।”

আমেরিকান সাহিত্য সম্বন্ধেও ইলিয় টলস্টয়ের মতামত স্পষ্ট।

“সত্য বলতে কি, আমেরিকান সাহিত্যে কিছুই নেই। তারা ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প ছাড়া আর কিছু লেখে না।”

সুধীন্দ্র বসু বলছেন, ‘টলস্টয়ের আমেরিকার সাহিত্যসমালোচনা বেশীরকম কড়া। আমেরিকা মাত্র একশ বছরের মধ্যে এমন সাহিত্য কি কিছু সৃষ্টি করেনি যার স্থায়ী মূল্য আছে! ওয়েবস্টারের বক্তৃতা, কুপার ও হাউওয়েলের উপন্যাস, বনক্রফ-এর ইতিহাস, ব্রাইয়েন্ট-এর কবিতা, লংফেলো ও এডগার এলেন পো, আরভিং-এর কিছু লেখা, এমার্সনের প্রবন্ধ ইত্যাদি. . এগুলি নিঃসন্দেহে যে কোনো দেশের সাহিত্যে গৌরবের স্থান পাবে।’

সুধীন্দ্র বসু আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি হুইটম্যানের উল্লেখ করেন নি। তাঁর তালিকাটি অবশ্য বড় কিন্তু এত বড় বিরাট দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ইলিয় টলস্টয়ের অভিযোগের মধ্যে মূলকথা বোধ হয় এই যে জনসাধারণের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে যে সাহিত্যের তা এমার্সনের নয়। আজ তার প্রমাণ প্রকট হয়ে উঠেছে বিভীষিকার গল্পগুলিতে। আমেরিকার এই জনপ্রিয় সাহিত্যের বিষাক্ত রসে ভবিষ্যৎ বংশের রক্ত গেল বিষিয়ে। এ ছাড়া কতগুলি ভয়াবহ সংগীত ও বীভৎস যৌনাচারের বর্ণনায় জনমনকে নামিয়ে নিয়ে চলেছে কোনো গহ্বরের দিকে। যদি তর্ক তোলা যায় যে সব দেশেই তাই, জনসাধারণের অপথ্যেই রুচি, তা আমরা মানতে পারি না। অন্যদেশের কথা জানি না, ভারতবর্ষে তা ছিল না। সেখানে কবীর ও দাদুর দোঁহা, চণ্ডীদাসের কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত জনপ্রিয়। সেখানে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ সাধ্বীর গল্প শুনে শুনে কেউ ক্লান্ত হয় না, ফিরে ফিরে সেই চিরন্তন মানবসত্য নূতন হয়ে আসে। সেদেশের রবীন্দ্রনাথও নূতন করে চিরপুরাতন গল্প লিখতে লজ্জিত হন না। খুনের গল্প

---

[১] আমেরিকায় লিঞ্চিং-এ তার প্রমাণ। আর ভারতেও বড় কম ছিল না, সতীদাহে তার চূড়ান্ত প্রকাশ।

ভারতীয় জনসাধারণের মনে আজও কোনো স্থায়ী রসধারা প্রবাহিত করতে পারেনি। তবে চেষ্টা চলেছে, জানি না ভবিষ্যতে কী হবে।

সুধীন্দ্র বসু লিখছেন—যাই হোক ইনি কিন্তু সত্যবাদী, এই সত্যনির্ভরতা তাঁর স্বভাবগত, কাউকে খুশী করবার জন্য কিছু বলবেন না। ইলিয় বললেন, "ইয়োরোপ বা আমেরিকা কোথাও সত্য ক্রিশ্চানিটি নেই। সব চার্চগুলিতে দারুণ কপটতা ছলনা মিথ্যাচার। আর ইয়োরোপের চার্চগুলো মানুষের উপরে অত্যাচার চালাবার সরকারের হাতের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। আমার হাতে যদি উপায় থাকত তবে আমি ইয়োরোপের প্রত্যেক চার্চের নিচে ডাইনামাইট বসিয়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিতাম।"

বৃদ্ধ সাংঘাতিক বটে! কিন্তু আর-এক বৃদ্ধও এই কথাই লিখেছেন অন্য ভাষায়—"যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে—ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে--ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো।"

ভারতবর্ষে মিশনারিদের ত্রাণকার্য সম্বন্ধে সব খবর শুনে বৃদ্ধ ইলিয় ভারি রেগে উঠেছিলেন, "দেখো একবার, এই খ্রীষ্টান মিশনারিরা কী ভণ্ড, ওরাই অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতার বীজ বপন করে। এখন কথা হচ্ছে কে কাকে ত্রাণ করে, ভারতীয়রা, যাদের মন সুসংস্কৃত না মিশনারিরা যারা চরম অজ্ঞ! যদি একজন করে ধরো, প্রত্যেক ভারতীয় প্রত্যেক মিশনারিকে শিক্ষা দিতে পারে—আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে যখন শুনি ভারতবর্ষে মিশনারি পাঠাবার কথা কেউ বলে।"

কী কারণে রাশিয়ার বর্তমান পরিবেশেও রবীন্দ্রনাথের আসন এমন সত্য তা বোঝবার জন্য আরো দু-একটি কথা উদ্ধৃত করছি।

"আমার পিতা (লিও টলস্টয়) ভারতে ও চীনে যেরকম সমাদর পেয়েছেন ইয়োরোপ ও আমেরিকায় সেরকম পান নি। তাঁর ভাবের সঙ্গে ভারতীয় মনোভাবের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।..রাশিয়া এশিয়ারই দেশ এবং টলস্টয় যিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান, তিনি মনে প্রাণে এশীয়।...রাশিয়ার এই ঋষি ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে 'বার্নিশ-করা বর্বরতা' বলতেন। তিনি ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রতি তার বাহ্যিক চাকচিক্য ও অন্তঃসারশূন্যতার জন্য একেবারে বিমুখ হয়েছিলেন। তিনি চাইতেন সহজ সরল জীবনে নির্মল দারিদ্র্যের মহিমা যা প্রাচ্য ঋষিদের চিরন্তন আদর্শ।"

কাউন্ট ইলিয়ই প্রথম রুশ পণ্ডিত যিনি ঠাকুরকে রাশিয়ায় পরিচিত করেছেন। অন্তত তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর ভারতবর্ষের এই ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা অপরিসীম—"আমার মনে হয় ঠাকুর বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের মধ্যে প্রধান।"

মিশনারিদের প্রচারকার্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিজ্ঞতার গল্প

মনে আসে—১৯১৩ সালে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে জাহাজে দুজন মিশনারির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই বেকার অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে তাঁরা তাঁর সংশোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে কবি বলেন যে তাঁর বয়স তো অনেক হয়ে গেছে, এখন আর বিশেষ সংশোধনের আশা নেই। সেই জাহাজেই ধূম্রপানের জন্য নির্দিষ্ট কামরায় সর্বদাই মদ্যপান জুয়াখেলা ও আনুষঙ্গিক ব্যাপার চলত। রবীন্দ্রনাথ নাকি সেই ঘরের দিকে মিশনারিদের দৃষ্টি নির্দেশ করে বলেছিলেন যে যদি বেকার অবস্থা তাঁদের অসহ্য হয়ে থাকে এবং যদি এখনই ত্রাণকার্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে থাকেন তাহলে ঐখানে আপন লোকদের মধ্যে তার চেষ্টা দেখেন না কেন।

'পেলমেল গেজেট' নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকা এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখছে :—"এরকম অজ্ঞতাপ্রসূত অপমানের এর চেয়েও কঠোর ভাষায় কবি ভর্ৎসনা করতে পারতেন।". মিশনারিদের মূর্খতার বহু পরিবাদ করে ঐ কাগজ আরো লিখছে যে—"এই ঘটনায় বোঝা যায় যে বহুদর্শী বিধর্মীরা (heathen) ক্রমেই এসব মিশনারিদের কথা অগ্রাহ্য করতে শুরু করেছে। কারণ তারা নিজেবাই এমন দেশ থেকে আসছে যেখানে মদ্যপান জুয়াখেলা খুনখারাপি বেড়েই চলছে।"

১৯২২ সালের 'ক্রিশ্চান' পত্রিকা, একজন মিশনারিকে লেখা কবির একটি চিঠির সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছে। এই চিঠিতে ভারতীয় ধর্মসাধনার ভাবের সঙ্গে ক্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকদের মূল ভাবেব পার্থক্য, 'করা' এবং 'হওয়া'র পার্থক্য গভীর চিন্তার উদ্রেক করেছে।

"ক্রিশ্চানের আদর্শ হবে খৃষ্টের মত হওয়া...যথার্থ প্রচার হতে পারে পূর্ণতাব সাধনায়, নম্রতা প্রেম ও আত্মোৎসর্গের পথে।

"আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নিজে ভাল না হলে অন্যের ভাল করা যায় না। ক্রিশ্চান ধর্মমত প্রচার করতে পার না যতক্ষণ নিজে না খৃষ্টের অনুরূপ হও, যতক্ষণ না যাদের তোমরা 'নেটিভ' নাম দিয়েছ তাদের সঙ্গে খৃষ্টেরই মত প্রেমে মিলিত হতে পার।

"কারণ যা প্রেমের দান নয় এমন কোনো সুবিধার ভিক্ষা অন্যের হাত থেকে গ্রহণ করায় হীনতা আছে। ঈশ্বরই প্রেম, তাই যা তাঁর কাছ থেকে পাই তা জীবনের আশীর্বাদ। কিন্তু যখন কোনো মানুষ ঈশ্বরের স্থানে অনধিকার দখল করে বসে এবং ঈশ্বরের প্রেম বিতরণ না করে নিজেই দাতা হয়ে উঠতে চায় তখন শুধু তার অহমিকা প্রকাশ করে।"

এই চিঠি ক্রিশ্চান মিশনারি মহলে অহংকারে আঘাত করে জাগিয়ে তোলে আত্মবিচার, গভীর মননা। কবি আরো বলছেন :

"সব সময়ই নিজেদের ধর্মমতগুলি প্রচার করতে চেষ্টা কোরো না—

নিজেকে উৎসর্গ করো প্রেমে। খৃষ্ট তো নিজের প্রচার করেন নি, ঈশ্বরের প্রেমের প্রচার করেছিলেন। চা বাগানের ঠিকাদার যেমন তার প্রভুর বাগানের জন্যে কুলি জোগাড় করে ফেরে তেমনি ঠিকাদারিতে নিযুক্ত হয়ো না।”

কবি উপমা দিয়ে জগৎ প্রকাশ করেন, উপমা দিয়ে জীবনের সত্যকে চেনেন—এই উজ্জ্বল কৌতুকচিহ্নিত উপমার ভিতরে শুধু ক্রিশ্চান নয়, সমস্ত ধর্মপ্রচারের ত্রুটি কোথায় তা সহজে পরিষ্কার হয়ে যায়।

ধর্মসাধনার আনুষ্ঠানিক অংশে কবির আস্থা নেই। তাঁর মতে ধর্মবোধ বাহির থেকে আরোপ করা যায় না, ভিতর থেকে তা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করাই শুধু আমাদের সাধ্য। ধর্মভাবের সেই উদ্বোধনে উৎসর্গিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাধনা। গানে, সুরে, সৌন্দর্যরূপের বিচিত্র উদ্ভাসে চিরসুন্দরকে প্রতিভাত করিয়েছেন কত মানুষের জীবনে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমজীবনে যুক্ত একজন বিদেশী লিখছেন :

“বিশ্বভারতীর সমস্ত কাজের মধ্যে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারই হচ্ছে সবচেয়ে প্রধান ও মনোরম। কবি মনে করেন ধর্ম কাউকে শেখানো যায় না, তা আমাদের অন্তরের গভীর থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়। যেমন প্রাণের প্রক্রিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, তেমনি আমাদের আত্মার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ধর্ম। আমরা শুধু অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে মানুষের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে তুলতে, ঈশ্বরের প্রতি ভাবনাকে উন্মুখী করতে সাহায্য করতে পারি। প্রকৃতির সংযোগ, নির্জনতা ও নীরবতাই ধর্মভাবের সহযোগী। তাঁর মতে সূর্যোদয়ের সুন্দর মহিমা ও সূর্যাস্তের বিপুল বর্ণচ্ছটা বহু ধর্ম-উপদেশের চেয়েও ঈশ্বরের কথা আমাদের ভালো করে বলতে পারে।” বিদেশী মনীষীর এই রচনায় তাঁর মনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কত স্পষ্ট ছিল তা বোঝা যায়। কবির স্বদেশবাসীর মধ্যেও কম লোকেরই এমন স্পষ্ট ধারণা আছে। একটি অভিযোগ বারবার শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক না হয়েও কী করে নাস্তিকতার দেশের অনুমোদন করেন। তাঁর ধর্মমতের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এ প্রশ্ন ওঠে না।

রাশিয়া থেকে কবি আমেরিকা গিয়েছিলেন। তখন সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের ফেরে তাঁকে পড়তে হয়েছিল এবং সেখানেও রাশিয়ার নাস্তিকতায় তাঁকে কাতর না দেখে সাংবাদিকরা বিস্মিত হয়েছিল।

“...ছ ফুটের উপর দীর্ঘ শরীর আপাদলম্বিত দীর্ঘ পরিচ্ছদাবৃত শুভ্র কুঞ্চিত কেশদামে শোভিত মস্তক রবীন্দ্রনাথকে দেখলে তুষারাবৃত শিখর উত্তুঙ্গ পর্বতের কথা মনে পড়ে—। রাষ্ট্রনীতি বা অর্থনীতির আলোচনায় তাঁর উৎসাহ নেই। শিক্ষা ও ধর্মকেই তিনি আর্ত জগতের ঔষধ বলে জানেন।...

নিউ ইয়র্কের আমেরিকানদের তিনি বললেন :—"রাশিয়া এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়েছে। মস্কোতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম কৃষক ও শ্রমিকরা যে ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে তাতে শুধুই তারা ফ্যাকটরির মজুর তৈরি হচ্ছে না, তাদের মনের শিক্ষাও হচ্ছে।...রাশিয়ার জনসাধারণ কনসার্ট হলে যাবার সুযোগ পেয়ে সাংস্কৃতিক জীবনের আস্বাদ পাচ্ছে। গত আট-দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে আমাদের কাছে—ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলেই মনে হয়।" . .শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পর কবি বলছেন, "রাশিয়ানরা প্রচলিত ধর্মকর্মে বিশ্বাস করে না। মানুষের সেবাই তাদের ধর্ম হতে পারে।..."

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন তোলেন এই ব্যাপক গণশিক্ষা হয়ত প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হচ্ছে, যাতে লোকের মন রাষ্ট্রনীতির একটা বিশেষ ব্যবস্থাই স্বীকার করে নেয়।.. কবি এ কথা মানলেন না।

"তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিকভাবে হচ্ছে না। তারা ফ্যাকটরিতে জিনিস উৎপাদনের যন্ত্র হয়ে উঠছে না। ..এই তো প্রথম নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জানতে পারল থিয়েটার মানে কী, অপেরাতে কী হয়।. .রাশিয়ার ঐ কৃষকরা আজ তাদের আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়ে জারের সময়কার অত্যাচারিত পদদলিত দাস মানুষেব চেয়ে অনেক বেশী অনুভব করবে যে এই চলনশীল জগৎ সংসারে যে অগণ্য মানবস্রোত প্রবহমান তারা একই পরম সত্যে বিধৃত।"

কবি বস্তুতন্ত্র বা materialism কথাটা তার ক্ষুদ্র অর্থে ধরেন না। সৌন্দর্যেব প্রকাশ, শিল্পের অনুভব বস্তুতন্ত্রের আবাধনা নয়; কিন্তু অর্থহীন আচার অনুষ্ঠান, ইহলোকে লাভেব উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা তাঁব কাছে স্থূল বস্তু উপাসনা। মানবজীবনের ঐক্যবোধে যে ধর্মসাধনার কথা "মানুষেব ধর্মে" বিস্তাবিত লিখেছেন এখানে সংক্ষেপে একটি লাইনে তার তাৎপর্য রয়েছে। মানুষেব জৈবিক অবস্থার বিপুল পার্থক্য তার দৈবসত্তার ঐক্যবোধকে খণ্ডিত করে না কি? 'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে' সে ঐক্যবোধ জন্মাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় না।

কবি শেষজীবনে স্মরণ করতেন যে রাশিয়াতে তাদের দারুণ দুঃখের দিনে রাজা অভিনয় হয়েছে। বাশিয়ান নটশিল্পীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রভূত সমাদর হয়েছিল। ইয়োরোপে সর্বত্রই ডাকঘর, চিত্রা ও রাজা বা 'আঁধারঘরের রাজা' বহুবার অভিনীত হয়েছে। সে সময়ে ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশে তা হয়নি এমনকি বাংলা দেশেও কবির স্বনির্দেশে ছাড়া আর কেউ করেছে বলে জানি না। শ্রীমতী জারমেনোভা প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী,

তাঁকে রুশীয় বিয়োগান্ত নাটকের রানী বলা হত। তিনি মস্কোর এই শিল্পীদের অগ্রগণ্যা ছিলেন। তিনি বলছেন :

"১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যখন বিদ্রোহের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরমতম দুঃখের দিন তখন তাঁদের সহকর্মীরা সকলে স্থির করেছিলেন যে সাধারণ শিক্ষামূলক নাটকের পরিবর্তে তাঁরা এমন কোনো নাটকের অভিনয় করবেন যাতে চারিদিকের মলিন আবহাওয়া থেকে দৃষ্টি জীবনের গভীরতর দিকে প্রবিষ্ট হয়।" তখন তাঁরা 'আঁধারঘরের রাজা' অভিনয় করেছিলেন। জারমেনোভা সুদর্শনার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সংবাদটি উদ্ধৃত করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন : রবীন্দ্রনাথের রাজা যখন রূপক নাট্য, যার মধ্যে রাজা ঈশ্বর ও রানী মানবাত্মা, তখন এই নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় রাশিয়ানরা একেবারে নাস্তিক ও বস্তুতান্ত্রিক হয়ে যায়নি, যদিও আমরা বারে বারেই ঐরকম খবর শুনছি। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যার মানুষ নিশ্চয় এখনো আছেন যাঁদের সেই আদিম স্বভাব এখনো টিকে আছে যার ফলে তাঁরা 'রাজা' নাটকে আনন্দ পান। বস্তুত জারমেনোভার মতটি গভীর। পারিপার্শ্বিক মলিন আবহাওয়া থেকে মনকে গভীরতার অভিমুখে সুন্দরের অভিমুখে প্রবিষ্ট করাই কবির ধর্মপ্রচার। তারই অনুকূল অবস্থা তিনি সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন দলমতে বিভক্ত মতদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গলোকের সন্ধান দেন তাঁর কাব্যে গানে নাটকে ছন্দে। তখন নাস্তিকতায় কৃতসংকল্প দেশের মানুষেরও সে স্বর্গে প্রবেশ করতে দ্বিধা থাকে না।

রাশিয়া সম্বন্ধে আমার এই সামান্য আলোচনা কবির একটি ছোট্ট কথোপকথনের উল্লেখ করে শেষ করব।

"আমার বয়স সত্তর হল মহাত্মাজি। আমি আপনার চেয়ে অনেকটাই বুড়ো হয়েছি।"

প্রাণখোলা হাসি হাসলেন গান্ধিজী—"কিন্তু ষাট বছরেব বুড়ো তো নাচতে পারে না, সত্তর বছরের তরুণ তো তা পারে।"

প্রশংসায় খুশী হয়েছেন কবি, তবু একটু ঈর্ষা আছে। কারণ গান্ধিজী পরিণত বয়সের উপযুক্ত ঔষধ পাচ্ছেন, তিনি তাতে বঞ্চিত। তাই বলছেন, "আপনি তো আর একবার arrest cure-এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আমার তো এরা সে ব্যবস্থা করে না।"...ছোট্ট ঘরটি হাস্যরোলে ভবে গেল।

কবি নানা বিষয়ে কথা বলছিলেন। সেই কোরীয় যুবকের কথা উঠল যে জাপানী শোষণের হাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল (রাশিয়ার চিঠি দ্রষ্টব্য)।

"একথা কি সত্য নয় মহাত্মাজি যে ধনীরা মিলতে পারে না, অত্যাচারিত ক্লিষ্ট মানুষেরাই দুঃখে মিলিত হয়?"

"অতি সত্য, পরম সত্য।"

"আমরা যতই কেন না রাশিয়াকে আটকাতে চাই, বেড়া দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে চাই তা হবে না। ভাবের আক্রমণ বন্ধ করা যায় না (invasion of an idea)।

"একদা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ছিল। তারপর এল ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য; এখন বৈশ্য-প্রাধান্য চলছে; এর পর শূদ্র-প্রাধান্য আসবে, সংখ্যায় তারাই তো বেশী।"[১]

---

[১] *Young India*, 1930

বিদেশে চিত্রপ্রদর্শনী

মনের মধ্যে ভাঙা-গড়া কতই জোড়াতাড়া
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে
একদিন এইসব আকাশবিহারীদের
ধরেছি কথার ফাঁদে
মন তখন ছিল বাতাসে কান পেতে
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারই খোঁজে
আজকাল আছে সে চোখ মেলে
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখবে বলে—
সে তাকায় আর বলে সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।

কবি সহাস্যে বলেছিলেন, “যাক, অবশেষে একটা কিছু পাওয়া গেল যেখানে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারব। শিল্পী হিসাবে আমার খ্যাতি খোয়াবার কোনো ভয় নেই। এ কাজে আনাড়ির সব সুবিধা হাতে আছে।”[১]

১৯৩০ সালে প্যারিসে যখন ছবির প্রদর্শনী হয় তখন স্বদেশে মহাকবির এই নূতন প্রতিভার পরিচয় ও স্বীকৃতি হয়নি। অনেকেই এ সংবাদে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। মাসিকপত্রে অবশ্য দু-একবার দু-একটি নকশা ইতস্তত ছাপা হয়েছিল, বলা বাহুল্য তা কারু বিশেষ মনোরঞ্জন করতে পারেনি। কবির খেয়াল বলেই যে কতকগুলি উদ্ভটাকৃতির প্রশংসা করতে হবে এমন কোনো মানে নেই—এমনি একটা মনের ভাব নিয়ে অনেকেই বিদ্রূপমিশ্রিত ঈষৎ হাস্য করে জিজ্ঞাসা করতেন—এগুলোর মানে কী? ওটা কী বস্তু?—

মানে থাকা তো সম্ভবই নয়। কোনো দৃশ্যবস্তুর তো প্রতিরূপ তিনি আঁকছেন না—খাতার পাতায় কাটাকুটির অসামঞ্জস্য ঢাকতে গিয়ে গড়ে উঠেছে নকশা। কবি বলতেন—যাদের মৃত্যু হল তাদের একটা ভালমত কবর তো দেওয়া চাই! (I must give them a decent burial!)

Osmosis-এ যেমন চলে বৃক্ষের প্রাণরস তেমনি কলমের মুখে একটি রেখা টেনে আনে আর-একটি সংগত রেখা, গড়ে ওঠে রেখার জগৎ, রূপের আকার, স্বেচ্ছাকৃত প্রতিরূপের নয়। একটি চিঠিতে কবি লিখছেন :

---

[১] *Ceylon Observer.*

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তার কারণ আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনি—দৈবক্রমে একটা কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে, জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটিমাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল, বিশেষত সে নাম যখন বিষয়-সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি, তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিস্টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে। জানি রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন তাঁরা অনামীকে নিজেই নাম দান করুন—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন—২ পৌষ ১৩৩৮।"[১]

একথা কবি এই প্রথম বলেননি বা কেবল ছবি সম্বন্ধেই এ সত্য নয়—যেমন লেখক ও পাঠকের ভাবনার সংগমে কাব্যের সার্থকতা তেমনি দর্শন ও শিল্পীর চিত্তসংগম চাই ছবির পূর্ণতার জন্য। বোঝবার মন চাই, দেখবার চোখ চাই—তাও সৃষ্টি করতে হয়, তাও সাধনাসাপেক্ষ। তৎকালে এ দেশে সে সাধনার ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। পাশ্চাত্ত্য মধ্যযুগীয় চিত্রকলার প্রভাব হ্যাভেলের সাহায্যে যাঁরা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিলেন—ঐতিহাসিক ভারতের শিল্পদৃষ্টি যাঁরা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পাশেই ছিলেন। হ্যাভেলের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। ১৯২০ সালে লন্ডনে বলছেন, "ইয়োরোপে একটা চেষ্টা দেখি, গ্রীসেব কাছে. খৃষ্টধর্মের কাছে আমাদের যে গভীর ঋণ আছে সে কথা খুব জোবেব সঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া হয় এবং ভারতবর্ষের যা কিছু দান তা অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি ভারতবর্ষ নিজেই অনেক সময় নিজের মূল্য বোঝেনি। ই বি হ্যাভেলের মত মানুষরা তখন অসাধ্য সাধন করেছেন--ভারতবর্ষের মধ্যে সৃষ্টিশক্তি যখন জাতীয় চেতনা ভ্রষ্ট হয়ে কেবলি পশ্চিমের অনুকরণে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল হ্যাভেল তাঁর ছাত্রদের বলেছিলেন কখনো অন্যের অনুকরণ কোরো না। নিজের আত্মাকে লাভ করবার চেষ্টা করো। তাঁকেই শিল্পে প্রকাশ করবার চেষ্টা করো। তখন নব্য ভারত তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। তাঁকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল কিন্তু তিনি জয়ী হয়েছিলেন। এবং বাংলা দেশের এই সব শিল্পসৃষ্টি যদিও এখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে এবং সুচারু হয়ে ওঠেনি তবু এর মহৎ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। হ্যাভেলের প্রভাবেই এটি ঘটেছে।"

---

[১] প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮।

ভারতীয় শিল্পের এই অভ্যুত্থানের পিছনে শিল্প প্রেরণার সঙ্গে স্বাজাত্যাভিমানও কিছুটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। নষ্টগৌরব, হৃতসৌন্দর্য পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকারে শিল্পরুচির সঙ্গে সমসাময়িক চিন্তার দাবি অগোচরে নিজের অধিকার বিস্তার করেছিল। জাপানী আর্টিস্টরা এলেন—ওকাকুরাও বললেন, আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জানো। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপীয় চিত্রকলা যা আপনার বিষয়পরিচয়ে নিপুণ এবং নিশ্চিত, মন সরে গেল তার থেকে। এশিয়ার ধ্যানদৃষ্টির দেখা দিয়ে গড়তে চাইলে ছবির জগৎ। ইয়োরোপে তার পূর্বেই অন্যপথে নূতনের সন্ধানে নব নব নিরীক্ষা চলেছে। নূতন যুগের শিল্পীরা বলছেন, "আমি যা দেখছি তাই তো আঁকি না—যা দেখেছি তাই আঁকি" (Mauch)। যা দেখেছি—দেখার মধ্যে যে অংশ আমার সত্তা সে তো বাহিরের বস্তুতে নেই- ভিতরের মিলনে দর্শকের মানসে তৈরি হয় দৃশ্যরূপ। এই দেখার কথাই ছবি আঁকতে শুরু করবার প্রায় ৩৮ বছর আগে কাব্য সম্বন্ধে মানসীর আশ্চর্য কবিতাটিতে বলেছেন :

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব, কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্রগানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা
ছাড়ি অন্তঃপুর বাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস·
সে আনন্দক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ—

"রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরাতে চাচ্ছে না।"

এই যে আকার সে সত্য হচ্ছে, মূর্ত হচ্ছে, রূপ নিচ্ছে, কিন্তু নিরাকারেই অর্থাৎ দ্রষ্টার জ্ঞানে। তাই দার্শনিক বলেন, 'আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি, যেন আমার মন আয়না মাত্র। কিন্তু আমার মন্ আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে

মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে, যেন দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি।"...

..."আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় মন প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়, তার থেকেই বুঝতে পারি জগৎ আমার মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত।"...

সেইজন্য চিত্রকরের চিত্রে, কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন নূতন রূপ নিয়েছে। ভিতর ও বাহিরের এই মিলনে কবির শক্তিশালী বেগবান মনে যে রূপ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে বাইরে তার ঠিক প্রতিরূপটি নেই। তাই শিল্পী বলেন, 'আমি যা দেখেছি তাই আঁকি।' বহুমুখী বিচিত্ররূপী মনের রসায়নে তাই একই দৃশ্য পৃথক হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখি মনের বেদনা দিয়ে তাকে ধরবার চেষ্টাতেই আধুনিক শিল্পের নূতন বাণী। সে রূপ বস্তুর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি হতে পারে না, কারণ মন যে নিরাকার, ছবির যে অংশে শিল্পীর মনের সংযোগ সে অংশ অরূপ নিরাকার ভাবরস—ভাবকে আকারে গ্রথিত করতে গেলে যে অভাবনীয় আবির্ভূত হয় নূতন যুগের শিল্পে তারই প্রকাশ। সব সময় তা সার্থক সংবেদন জাগায় না কারণ মনের প্রকারেই তো তার আকার।

দর্শকের মনের সংবেদনা জাগিযে তুলবার জন্য অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন—সে সৃষ্টিব জন্য এ যুগেব শিল্পীকে তাই দর্শকের মন তৈরি করে নিতে হয। ধীরে ধীবে তা হয বর্তমানে রবীন্দ্রচিত্রকলা তাই যে সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে এসেছে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এ দেশে তা ঘটেনি। প্রধান বাধাই ছিল—they tell no story—অন্যান্য আধুনিক চিত্রকলার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের ছবি বিশেষ কবে চলেছে অভাবনীয় পথে। শুরু হয়েছে উলটো দিক থেকে। বূপের আকার অজানা থেকে জানার দ্বারে বেরিয়ে আসছে রেখা ও রঙের পথ ধবে। কল্পনা'ব পথ দিযে নয়। আলপনার নকশায় যা দেখেছি রেখার সঙ্গে রেখার সংযোগে ফুটে ওঠে সৌন্দর্যরূপ যা কোনো কিছুর প্রতিরূপ নয়। তার অর্থ তাই নিজের মধ্যেই, তার সার্থকতা তার আপন অস্তিত্বে। নকশা বা আলপনা সম্বন্ধে অভ্যাসবশত কোনো সংশয় ওঠেনি—কিন্তু চিত্রে এই অভাবনীয় ভঙ্গী দেখে অপরিচয়ের শঙ্কায় বিস্মিত মন বলে—এ কে? কিন্তু রেখা ও রঙের মিলনে এই যে প্রকাশ, এর মধ্যে এমন কথাই বলা হয়েছে যা রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যময়ী পরমকুশলী ভাষাও এতকাল বলতে পারেনি বা বলেনি। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুদ্ধারের মৃতসঞ্জীবনের আবহাওয়ায়—কিন্তু তিনি তেমনি মানুষ যাঁর মধ্যে অতীত রস জোগায় ভবিষ্যৎকে উদ্ভিন্ন করবার জন্য—

পুনরাবর্তন তার চলার রীতি নয়। একটি সভাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে বিখ্যাত থিয়োসফিস্ট অরুণ্ডেল দেখেছিলেন—সভা বসেছিল আশ্রমে তরুতলে যেমন অতীত ভারতের তপোবনে জ্ঞানবৃক্ষের কাছে জিজ্ঞাসুরা সমাগত হত। অরুণ্ডেল বলছেন :

"রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করা মাত্রই একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন হল—কোন জাদুমন্ত্রে তিনি আমাদের চোখের সামনে একটি নূতন ছবি নিয়ে এলেন আমাদের কাছে অতীত প্রকাশিত হল। ভবিষ্যৎও উদ্ভাসিত হল, যে-ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়ে কম মনোহারী নয়। তিনি যেন অতীতের হয়েও ভবিষ্যতের। কেবলমাত্র অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়। যে ভবিষ্যৎ তিনি উদ্ভাসিত করেছেন তার মধ্যে অতীতের পরিচয় আছে কিন্তু তা কোনো-মতেই অতীতের সঙ্গে এক নয়—তাঁর সঙ্গস্পর্শে আমরা যেন সেই চিরন্তন অনন্ত ভারতে চলে গেলাম যে ভারতের পরিবর্তন নেই কিন্তু পরিবর্ধন আছে...তিনি কী বলছিলেন আমি শুনতে পাইনি, তাঁর সুন্দর সুসংস্কৃত কণ্ঠস্বর ছিল মৃদু, কারণ তিনি অসুস্থ ছিলেন, আর আমি ছিলাম এক প্রান্তে, কিন্তু তাতে এসে যায় না কিছুই—তিনি বসে রইলেন দূরে, আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে অ্যানি বেসান্ত তন্দগত উন্মুখী হয়ে রইলেন, আমি যেন মেঘের মধ্যে ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলাম।"[১]

কবির সমগ্র দৃষ্টিতে এই নূতনের ঘোষণা যা অতীতের সংবাদ দেয় কিন্তু অতীতে সমাদৃত হয় না, নূতনের প্রকাশ প্রবল বর্ণচ্ছটায় চিন্তার আকাশ নানা ভাবে রঙীন করে। ছবির জগতে সে কথা অতিস্পষ্ট হল।

ভাষা ও ছন্দ কবিতায় সংগীত সম্বন্ধে যে সত্য বলেছিলেন ছবিতে তা প্রকাশিত হল। মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে।

ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে।...
ধূলি ছাড়ি' একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভার-হীন।

সংগীতের সেই অর্থভারহীন পক্ষে কবি ভাবের সংযোগ ঘটিয়েছেন। বাক্যার্থকে সুরের সঙ্গে একীভূত করে নূতন সৃষ্টি লঘুপক্ষ হয়ে উধাও হয়েছে গূঢ়তম ভাবনার নিবিড়তম অনুভবের দরজা খুলে দিয়ে। গানে এই আশ্চর্য সাধনা করলেন কবি, বাক্য ও সুর মিশল ভাবের রসায়নে, কথা যে সুরের বাধা হল না তার কারণ সুরের সঙ্গে সঙ্গে জাগল ভাষা—কথা ও সুর একত্রে রূপ নিল সুরকারের অনুভবে, ভাব উন্মীলিত হল সুরবন্ধনে

---

[১] *Vienna Times*, 27 Jan., 1928.

অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে। বাক্য ও সুরের দুই পক্ষ আন্দোলনে ছন্দিত তার প্রাণগতি। রবীন্দ্রনাথের গান তাই একমাত্র তাঁরই সুরে ছাড়া সত্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে। একজনের কথা আর-একজনের সুরে বলিয়ে এ সৃষ্টি সম্ভব হতে পারত না। সুরের বেদনায় মিশেছে ভাবের বোধনা প্রাণের রসায়নে, রবীন্দ্রসংগীতের সেই বৈশিষ্ট্যেই তার পূর্ণ সার্থকতা। গীতশিল্পে যা করলেন চিত্রশিল্পে আনলেন তারই বিপরীত রীতি। গানের তরঙ্গে কবি মিশিয়েছিলেন বাণী, রঙের তরঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিলেন তাকে। রেখার জগৎ হল বাঙ্ময়। যেমনি বাক্যের অতীত বাণী বিশ্বের নানা লীলায় সৌন্দর্যরূপে নিরন্তর ব্যক্ত হয়ে উঠেছে, কবিচিত্তেও তেমনি ভাষাহারা ভাবনার খেলা রঙে রেখায় হয়ে উঠল বিচিত্র।

ষাট বছর বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করে প্রায় দু হাজার কি তারও কিছু বেশি ছবি আঁকলেন মহাশিল্পী। জগতের ইতিহাসে এ বিস্ময়কর অভূতপূর্ব ঘটনা। এ ছবি নিয়ে উপযুক্ত আলোচনা আজো এ দেশে হয়নি, এমনকি কতকগুলি ছবি আছে তারও সংখ্যা নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রায় ছিল না বললেই হয়। এ দেশের প্রসিদ্ধ চিত্রকররাও অনেকেই অনুমোদন করেন নি—যদিও ভিতরে ভিতরে এই বিশেষ শিল্পরীতির প্রভাব তাঁদের চিত্তভূমিকে অসতর্ক আক্রমণ করেছে। অনেকেরই অঙ্কনরীতির মোড় ফিরে গেছে। কারণ ভাবের তরঙ্গ রোধ করা অসম্ভব—আঠার অক্ষৌহিনীর চেয়ে তা প্রবলতর। রবীন্দ্রচিত্রকলা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে কিন্তু সে ক্ষেত্র এখানে নয়—আমরা শুধু বিদেশে রবীন্দ্রচিত্রের সমাদর প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলতে বাধ্য হলাম।

দেশের কারু ভাল লাগুক বা না লাগুক ছবির নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, এই নেশার তাগিদে আঁকার মিডিয়ামের হয়েছে বহু বৈচিত্র্য—হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই রেখার টানে রূপের অরূপ মূর্তি, আকারের জগতের অবাস্তব কত কথা বলতে লাগল।

শিল্পের অর্থই অন্যের সমর্থনে। কবি কবিতা শোনাতে চান—তা শ্রোতা যদি সমজদার নাও বা জোটে তবু তাগিদ থাকে না, এই বিপাকে পড়েই অশিক্ষিতা মালিনীকে কবি কালিদাসের কাব্য শুনতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন ছবি কাকে দেখাব—এদেশে তো লোক ছবি দেখতে জানে না, আগে দেখে মুখটা সুন্দর কিনা।

তাই দ্বিধা সন্দেহে বাধাগ্রস্ত মনে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ কলাবিশারদদের সামনে নিয়ে চললেন এই নূতন সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে পরে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন : "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে প্যারিসে ছবির প্রদর্শনী করবার

জন্য বারংবার অনুরোধ করায় আমি ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা শিল্পীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলাম। 'কখনই না, মিস্টার টেগোর, এমন হঠকারিতা কখনই করবেন না—কারণ আমাদের দেশের লোকের হাসবার নিষ্ঠুর শক্তি আছে। আপনি হঠাৎ আপনার ছবির প্রদর্শনী করে আপনার যশখ্যাতি বিপন্ন করবেন না। তাই তখনকার মত আমি নিবৃত্ত হলাম।"

পরে একজন ভদ্রমহিলা অনুগ্রহ করে আমার শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি প্যারিসে নিয়ে কলাবিশারদ কয়েকজনকে দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। ছবিগুলি তাঁদের দেখাবার জন্য একটি ঘরে টাঙানো হল, আমি অন্য ঘরে বসে রইলাম। তাঁদের সামনে যেতে সংকোচ হচ্ছিল। তারপর তাঁদের মধ্যে থেকে একজন ভদ্রলোক আমার ঘরে ছুটে এলেন—ফরাসী কায়দায় আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন, তারপর বললেন, 'আমি জানতাম তুমি মহৎ কিন্তু তোমার ছবি না দেখলে আমি কখনও জানতামই না যে তুমি কত বড়। এ ছবির প্রদর্শনী হোক আমাদেব শিল্পকলায় এর থেকে শিক্ষণীয় আছে। তাবপর তিনি রথচাইল্ড প্রেক্ষাগৃহে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন—আমার কাছে সবটা যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। কখনো ভাবতে পারিনি এমন হতে পারে।"[১]

এই বর্ণনাটি রোটেনস্টাইনের গৃহে প্রথম গীতাঞ্জলি পাঠের সঙ্গে মেলে, কিন্তু ফরাসী ও ইংরেজ মনের প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি একেবারে বিপরীত।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, আঁদ্রে কারপ্লেস ও কোঁমতেস্‌ আন্না দ্য নোয়াই এই রকম কয়েকজন শিল্পী ও শিল্পরসিকার সাহায্যে প্যারিসে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। এ সম্বন্ধে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর উৎসাহ ও সাহায্যের কথা কবি স্বয়ং বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন, এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর কোঁমতেস দ্য নোয়াই নিজেই প্রদর্শনীর পবে অতি অপূর্ব একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সে প্রবন্ধে এই নারীব গভীর কবিত্ব, সুদূরপ্রসারী আলোক-উদ্ভাসিত দৃষ্টি দেখা যায়। কোঁমতেস্‌ দ্য নোয়াই ফ্রান্সের প্রসিদ্ধা কবি, গ্রীকবংশোদ্ভবা, বিখ্যাত দ্য নোয়াই বংশে বিবাহিতা। তাঁর সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২১ সালে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *Edges of Time* গ্রন্থে সে কথা উল্লেখ করেছেন। সেই সময়ে, অর্থাৎ প্রথম যেদিন তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন সেখানে আঁদ্রে কারপ্লেসের কনিষ্ঠা ভগ্নী সুসান কারপ্লেস উপস্থিত ছিলেন। সুসান তখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত-ভাবে কবির সেক্রেটারির কাজ করছিলেন—তাঁর কাছে ঐ সাক্ষাতের বর্ণনা

---

[১] *Daily News*, 15 May, 1934, Colombo, Ceylon

যেমন শুনেছি তার যথাযথ বিবরণ এখানে লিখছি। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা রক্ষণীয়। "গ্রীকবংশোদ্ভবা কোঁমতেস্ দ্য নোয়াই অপূর্ব রূপসী, তাঁর গভীর কালো আয়ত চোখে পূর্বদেশের রহস্য—তরঙ্গায়িত কালো চুলে নিখুঁত সুগঠিত চমৎকারিণী মুখের প্রভায় তিনি ফ্রান্সের মনোহারিণী। তাঁর প্রেমের কবিতা ফ্রান্সের যুবকচিত্তকে চঞ্চল করে সকলের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হয়। তাঁর বঙ্কিম কটাক্ষে বহু বীর পরাভূত। একদিন নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তাঁর অনুরক্ত ভক্ত শ্রীযুক্ত কাহনের সঙ্গে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন।"

শ্রীমতী যুসান বলছিলেন, সেদিনের দৃশ্যটি তাঁর মনে ছবি হয়ে রয়েছে—"কোঁমতেস্ অপূর্ব ভূষণে সজ্জিতা হয়ে এসেছেন, মাথায় সোনার রঙের সিল্কের শিরাবরণ ঝলমল করছে, গাঢ় ভেলভেটের ঢিলা পরিচ্ছদের ভিতরের উজ্জ্বল সোনালী রং তাঁর চলনের প্রতি ভঙ্গীতে ঝলমল করে উঠছে—কবির সামনে বসে এই লাবণ্যময়ী হাস্যকৌতুকে লাস্যময়ী হয়ে উঠলেন। তার রূপেব ছটা মুখের হাসি ঝকমক করতে লাগল—মনোহারিণীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণা হলেন। কোঁমতেস যতই চঞ্চলা বিলাসলাবণ্যমুখরা হয়ে রূপচ্ছটা বিকীর্ণ করতে লাগলেন—কবি ততই গম্ভীর সুদূর অনালভ্য হয়ে গেলেন, তাঁর দুই হাত কোলের উপর সম্বদ্ধ, মূর্তি স্থির, চক্ষু নিম্নানিবদ্ধ, অর্ধমুদিত, দেবমূর্তির মত দুর্জ্ঞেয়। যতই তাঁর সামনে মোহের ছলনাজাল ছড়িয়ে পড়ছিল ততই তিনি যেন ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে চলে গেলেন, সমস্ত তুচ্ছতা অতিক্রম করে অনধিগম্য গভীরতায়। অবশেষে কিছু পরে কবি তাঁর ধ্যানবদ্ধ দৃষ্টি ঈষৎ উত্থিত করে, স্নিগ্ধ মৃদু হাস্যে বললেন—let us not forget that we are both poets—মুহূর্তে বুদ্ধিমতী রমণীর কাছে ধরা পড়ল ভ্রম, জাগ্রত হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাত্মায় আপন স্রষ্ঠারূপ, তিনিও কবি, নিঃশংসয়ে সেই তাঁরও সত্য রূপ, মোহময়ী নারীর ভূমিকা তুচ্ছ খেলা মাত্র। তাঁর মুখের ভাব গেল বদলে, নম্রস্বরে তিনি বললেন, 'আমার একটি কবিতা আপনাকে শোনাব?' তারপরে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে ঝরল কবিত্বের সুর-নির্ঝর। কবি বাংলায় কবিতা পড়লেন, আর কোঁমতেস ফরাসীতে—ফরাসী প্রেমের কবিতা; তাঁর কণ্ঠে দেহবন্ধ প্রেমের কামনা পুটপাক পাত্রে জ্বলছিল ধূপের মত—আর রবীন্দ্রনাথ পড়লেন গীতাঞ্জলি—ঊর্ধ্বগামী প্রেমের শিখা সেখানে মনকে উধাও করে নিয়ে চলেছে স্বর্গাভিমুখে। নারীর কণ্ঠে বাজছে ফ্রান্সের যা কিছু মোহন তারই মধুরতম সুর আর ভারতের মহাকবি অন্তরে ধ্বনিত করছেন যা সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাবনা, মহত্তম আশা, গভীরতম সৌন্দর্য। কিছুক্ষণ এই অপূর্ব আলাপের পর কোঁমতেস যখন বিদায় নিলেন তখন তাঁর মোহিনী-

মূর্তি অপহৃতা, পূজার সৌরভে নম্র, তাঁর সুন্দর মুখ ভক্তির মাধুর্যে অপরূপ।”

এই কোঁমতেস দ্য নোয়াই ১৯৩০ সালে ছবির প্রদর্শনীতে কবির স্বপ্ন চোখে দেখলেন।

“আজ ঠাকুর আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে তাঁর স্বপ্নের ঝুলি উজাড় করে দিয়েছেন—তিনি পূর্বেই বলেছিলেন : “আমি তারার ভাষার অর্থ জানি, তরুর নীরবতার বাণী বুঝতে পারি। একদিন আমি আমার দেহের বাহিরে আলোর যবনিকার ওপারে যে পরমানন্দ আছে তার সন্ধান পাব।”

তাঁর মুখের অগ্নিময়ী বাণী সমস্ত ভবিষ্যৎকে আলোকিত করে দেয়।... ধৈর্যের সঙ্গে তিনি আত্মপরিচয়ের চেষ্টা করেন—সহসা যেন চিনতে পারেন—আবার আসে সন্দেহ।...লোকে যখন প্রশংসা করে, দ্বিধা সন্দেহে তিনি স্মিতমুখে নীরবে থাকেন।

যখন তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন, যে কাব্যে তারার ভাষা এসে মিশেছে—তখন তাঁর কল্পনায় কত কল্পনার মূর্তি অগণ্য নৃত্যশীল আকৃতি এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, তাঁর যুক্তিবদ্ধ বুদ্ধি তাদের চেনে না। তারা বিশ্বের সর্বদিক থেকে এসে তাঁর নিভৃত চিত্তদ্বীপটিকে আক্রমণ করে। সক্রেটিস বলেছিলেন—‘আত্মনং বিদ্ধি’ আপনাকে জানো। এবং আমি গ্রীসের কন্যা হয়ে এই মহৎ উপদেশ অগ্রাহ্য করতে পারি না—যা বলে বুদ্ধি বিবেচনা করে নিজেকে দেখো—যুক্তিতে নিজেকে স্থির রাখো। সমস্ত ছায়ামূর্তি দূর করে দাও। কিন্তু আত্মার আরো নির্দেশ আছে। কবি স্বেচ্ছায় এই নিয়ম অগ্রাহ্য করেছেন, তিনি নিজেই নিজের নিয়ম। তিনি স্থির করেছেন তাঁর স্বপ্ন যা দিয়ে গড়া তাঁকেই বস্তুরূপ দেবেন—ফলে এক বিপুল কর্ম-কৌশল অসংখ্য বিচিত্ররূপে আজ আমাদের সামনে এসেছে, প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অন্তরচারী গোপন দৃশ্যমূর্তি—অসংখ্য অগণ্য অত্যাশ্চর্য। যে প্রেরণায় এই নিম্নমূলপ্রসারী বহু পুরাতন বনস্পতিতে এই অপ্রত্যাশিত ফল ফলেছে আমরা তার প্রশংসা করি। জানতে ঔৎসুক্য হয় কী করে ঠাকুরের মত মানুষ যাঁর কল্পনাও বুদ্ধিপ্রাণিত তিনি এই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি করলেন যা চোখকে মোহিত করে মনকে নিয়ে যায় অজ্ঞাত দেশে—যেখানে কল্পনার বস্তু বাস্তবের চেয়ে বেশী সত্য।...

পারাবতের মত নরম দারুবর্ণ সুন্দর হাতে তিনি কবিতা লিখছিলেন, সহসা সেই পুঁথির পাতায় যেন কোনো অনির্বচনীয় সুরার মত্ততায় তিনি কঠিন নির্দিষ্ট পরিশ্রমের পথ থেকে দুর্দমনীয় কল্পরাজ্যের মধ্যে মুক্তি পেলেন। এলোমেলো কত নকশা করলেন, তারপর তাকে পূর্ণতর করে নিখুঁত করে, যেন স্বর্গীয় প্রদর্শকের ইঙ্গিতে বাধ্য শিষ্যের মত তার উপরে

অবচেতনের ঐশ্বর্য ঢেলে দিতে লাগলেন।...এই জন্য যার অশ্রুর সম্পদ আছে, যে নিজের ব্যথার কারণ না জেনে কাঁদে (কে যে আমায় কাঁদায় আমি কি জানি তার নাম) সেই শুধু অনুভব করবে, দেখতে পাবে, যে-সূক্ষ্ম স্বপ্নজাল শুধু দেবতারা দেখতে পায়—তখন কোনো অনির্বচনীয় উৎস থেকে রহস্যময় বাষ্পাবরণ তার চোখের সামনে আসবে, তার চোখ জলে ভাসবে।...ঠাকুরের ছবি প্রথমে মনে হয় স্বপ্নময় কুহেলিকাবৃত—আত্মা যেন ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করছে—কিন্তু ক্রমেই এর উৎকর্ষ লক্ষ্য হয়। এই জ্ঞানময় সদ্যোজাত প্রতিভার সামনে, এর প্রাচুর্যে সূক্ষ্মতায় মন অভিভূত হয়ে যায়। ঘন ছায়ার টুকরো, হিমশুভ্রতা, লাল সবুজ বেগুনি নানা বর্ণ বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে পুনঃসৃষ্টি করে এক জীবন্ত বিশ্ব। যে-কবির মনোমোহিনী সংগীত আমাদের মনে কত সূক্ষ্ম সত্য গুঞ্জরণ করেছে আজ সেই কবি আমাদের নিয়ে এলেন অসংখ্যবিচিত্র মানবমূর্তির জগতে যারা ছায়ারূপে একত্রিত হয়ে দৈত্যের হাসি হাসছে।...

...তবু এও সত্য ঠাকুরের ছবির মধ্যে রঙে ও রেখায় সুন্দরের স্থান বেশী। কত মহিমান্বিত মুখচ্ছবি, উন্নত ভঙ্গী, জলের তরল লাবণ্য, আর গভীর নীল রাত্রি, সে রাত্রি যেন শেক্সপীয়ারের কাব্যের প্রণয়ী-যুগলের সুখে সুখী, সে যেন এমন স্বর্গে আমাদের নিয়ে যায় যেখানে মৃত্যুর চিন্তা দূর হয়ে যায়।...কিন্তু ঐ আসুরিক মুখ ঐ দানবীয় মুখোশ ঐ যে ছুরির মত শাণিত অবিশ্বাস রেখাঙ্কিত ঠোঁটের কোনায় ঝকঝক করছে—ওগুলোকে ভয় করে না কি? আর কী অপূর্ব বিস্ময়জড়ানো ঐ হরিণীর নিরালম্ব আকৃতি...”

অভিভূত চিত্তে এই নারী-কবি ভাবেন, এই কি তাঁর পরিচিত কবি রবীন্দ্রনাথ? তিনি তাঁকে যা চিনেছিলেন, জেনেছিলেন তার চেয়ে কত গূঢ়, অজ্ঞাত, ব্যাপক তাঁর মনোগহন,—যেখানকার রহস্য এই ছায়ালোকের মূর্তিরা বহন করে এনেছে। “আর কি তোমাকে সেই স্বর্গীয় শিশু সরল (naive angel) ভাবতে পারব, এত দিন যা ভেবেছি?”

স্থাপত্যশিল্পী আর এস মিলওয়ার্ড প্যারিসে পিগলী গ্যালারিতে প্রদর্শনী দেখে এসে লিখছেন: “আমি কী করে বর্ণনা করি আমি কী দেখলাম? কোনো ছবির নাম নেই—স্বপ্নকে কি নামে বাঁধা যায়? যে দেখবে সেই নাম চিনে নিক। নিষ্ঠুর কালো কালো আকৃতি আছে, তারা ভয় দেখাচ্ছে—তিনকোনা সুন্দর আকৃতি আছে যাদের দিকে চেয়ে থাকলে তারা নৃত্য করে ওঠে। হয়ত ঐ মাথার ভঙ্গী আমার মন আকর্ষণ করে কত আকারের মুখ, হয়ত বা শুধু দুটি চোখের দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে আমাকে অনুসরণ করে ফেরে।...হয়ত একটি পোট্রেট—একটি মুখের ভঙ্গিমা, ডিমাকৃতি মুখে

ঠোঁটের উপর ভেসে যাওয়া হাসি। স্বপ্ন? হাঁ স্বপ্নই বটে। অতিপ্রাকৃত, সুন্দর।...সব রকম প্রাগৈতিহাসিক জন্তু আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তারা কি অলৌকিক? কতকগুলি আলপনা মাত্র, কতকগুলি ভয়াবহ। একটি মনোমোহিনী ছবি সম্পূর্ণ নূতন, হরিণের ভঙ্গিমা। গাছের দিকে পাতার প্রতি উন্মুখ হয়ে আছে আর তার পিছনে নেমে এসেছে একটি আলোর ধারা—এর মধ্যে পশুজগতের সমস্ত কবিতা বিধৃত।...

"কখনো কোনো ছবির প্রদর্শনী আমাকে ইতিপূর্বে এমন বিচলিত করেনি।"

সাংবাদিক কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবির সঙ্গে চিত্রশিল্পীর যোগ কোথায়?"

"কোথাও নেই। যখন আমি লিখি আমার মনের সামনে একটা দৃশ্য, একটা মানসিক রূপ থাকে। আমার কবিতা সেই রূপকে সেই সৃষ্ট মূর্তিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন আঁকি আমি জানি না কী আঁকব। কোনো নির্দিষ্ট আকারের ধারণা নিয়ে আঁকতে শুরু করি না। কলম তুলে নিয়ে যেমনি শুরু করি সহসা হয়ত একটা মুখ, একটা ফুল বা একটুকরো মেঘের আভাস দেখতে পাই।..কখনো কখনো ভুল হয়ে যায়—ফুলের বোঁটাকে নামাতে গেলে যেমন অনেক সময় ডাঁটাটি ভেঙে যায়—তখন রেখাটি মরে যায়—আমি তাকে তার ধ্বংসের পথে নিয়ে ফেলেছি। এই অগণ্য আকারগুলি অগণ্য ছোট ছোট আত্মার মত, তারা আমার কাছ থেকে মুক্তি আশা করে।"

ড্রেসডেন, বার্লিন ও মিউনিকে প্রদর্শনী হল। ড্রেসডেনের আর্ট অ্যাসোসিয়েশন লিখলে—ঠাকুরের ছবি তাঁর কবিতা ও গানের মতই তাঁর আত্মার এক-একটি কণা।..এর মধ্যে অতি স্বাভাবিক ছন্দে মনের রূপ নিঃসৃত হয়ে এসেছে। তেষট্টি বছরের পরিণতবয়স্ক কবি নূতন আনন্দে রঙের কাব্য লিখছেন এ ঘটনা বিস্ময়কর। ভিক্টর হিউগোও শক্তিশালী চিত্রকর ছিলেন আর হারম্যান হেসও বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। কারু কারু দ্বিমুখী প্রতিভা দেখা যায়—(৩০শে জুলাই বার্লিন ১৯৩০)।

কিন্তু লেখকের স্মরণ ছিল না রবীন্দ্রপ্রতিভা দ্বিমুখী নয়, বহুমুখী।

মিউনিকে কবির এই দ্বিতীয়বার আগমনের একটি বিবরণ আছে :

"নয় বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম এ দেশে পদার্পণ করেছিলেন তখন এ নগরে জনতার মন যে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তা আজও আমাদের স্মরণ আছে। সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। ১৯২১ সালে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানির যে যন্ত্রণা ভোগ হচ্ছিল

এখন তা অপসৃত। সহস্র বাধা অতিক্রম করে নূতন উদ্যমে গড়ে তোলবার কঠিন আনন্দ জেগে উঠেছে। কিন্তু এই বিপুল পরিবর্তনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের আসন এ দেশের মর্মে যে তেমনি অবিচল আছে তা গত মাসের ঘটনায় বোঝা গেল।

...২৩শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ মিউনিকের জনসাধারণকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন। ক্যাসপ্রি গ্যালারিতে (Caspari Gallery) তাঁর ছবির প্রদর্শনীর সংবাদ মিউনিকের জনসাধারণকে আনন্দবিমূঢ় করেছিল। সঠিক সাড়ে এগারটায় মিউনিক সমাজের বিশিষ্ট নরনারীরা কবির প্রদর্শনী উন্মোচন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণ শুনতে এসেছিল—একটি সংক্ষিপ্ত সুন্দর বক্তৃতায় কবি বললেন যে, কবিতা কখনই অন্য ভাষায় যথাযথরূপে অনুবাদ করা যায় না। অনুবাদপ্রক্রিয়ার ফলে ভাল কবিতার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও কবিত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ছবির কোনো অনুবাদের প্রয়োজন নেই। তারা সকলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানগম্য। কবি বললেন,—“আমার কবিতা রইল আমার দেশবাসীর জন্য, আমার ছবি আমি পশ্চিমকে উপহার দিলাম।”[১]

এ ছবির ভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। এর বিন্যাসকৌশল ইয়োরোপীয়। কবির সেজন্য আনন্দ। তিনি বলেন, এতে তাঁর গর্ব হয়, কারণ প্রমাণ হয় যে তাহলে যথার্থ তাঁর অন্তরে পূর্ব ও পশ্চিমের অন্তত কিছুটা মিলন হয়েছে।

এরপরে রাশিয়া ইংল্যন্ড আমেরিকা সর্বত্রই প্রদর্শনী হল, বিশিষ্ট কলাবিশারদরা এই অভূতপূর্ব সৃষ্টিরহস্যে বিস্মিত আনন্দিত হয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্থান স্বীকার করলেন। কবির সমস্ত মন তখন এই নূতন সৃষ্টি অধিকার করে বসেছিল, খেলার নিষ্কারণ আনন্দে শিল্পের চরম সার্থকতা ঘটেছিল, তবু তাদের মূল্য সম্বন্ধে কবির মন স্বভাবনম্র বিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, বিদেশে যখন শিক্ষিতদৃষ্টি শিল্পরসিকরা দেখলে অনির্দিষ্ট রেখার গতিতে জন্মেছে কত অপূর্ব আকার, অজ্ঞাত ভাব—কোনো অসম্ভব জন্তু যা জন্মালে সম্ভব হত, কোনো মুক্তবিহঙ্গ যা শুধু স্বপ্নেই ডানা মেলে তা পেয়েছে রেখার আশ্রয়। কোথাও ক্রোধ, কোথাও সরল দাক্ষিণ্য। কোথাও এক আকস্মিক উদ্ভূত মুখে ফুটে ওঠা হাসি, আকারহীন ভাবপরিকল্পনাহীন তুলি ও কলমের মুখে রেখার জগতে জন্ম নিয়েছে। তারা কোনো বিশেষ দেশের বিশেষ মানুষের কাহিনী নয়, সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সূত্রচ্ছিন্ন, আলোছায়ার, রেখারঙের ভাষা যখন তাঁদের দৃষ্টিপথে মনকে অধিকার করে আপন অস্তিত্বের দাবি স্বীকার করিয়ে নিয়েছে তখনও কবিব সংশয় ঘোচেনি। রাশিয়ায় একজন আর্টক্রিটিক তাঁকে

---

[১] *M.R.*, Oct., 1930.

জিজ্ঞাসা করছেন :

"আপনি আগে কখনো ছবি আঁকেননি?"

"না।"

"আপনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এ ছবি দেখতে দেখতে ক্রমশ চিত্তে এর প্রভাব ঘনীভূত হয়ে আসে—দর্শক অভিভূত হয়ে পড়ে। আপনার কাজ অনেকটা Vrubel-এর মত। তাঁর ছবি কি কখনো দেখেছেন? হয়ত নয়?"

"মনে তো হয় না"—

"এ কি দান্তের পোর্ট্রেট্?"

"না। গত বছর জাপান থেকে ফেরবার পথে এ'কেছি, আমার কলম আপন খেয়ালে চলে এই ছবি এ'কে তুলেছে।"

"এ কিসের রং?"

"কিছুই না। নীল ফাউন্টেন পেনের কালি।"

"আপনি তেলের ছবি আঁকেন?"

"না।"

"এটা কি মস্কোর ছবি?"

"হবে। আমি কাল এ'কেছি হতেও পারে।"...

পরের দিন মস্কোর বৃহত্তম মিউজিয়ামে ছবির প্রদর্শনী হল। কবি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে অভিনন্দিত হলেন—এজন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। কবি বললেন, ছবির প্রত্যক্ষ ভাষায় রাশিয়ার মানুষের কাছে সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এখানে দোভাষীর সাহায্যে বেড়া ডিঙিয়ে চলতে হয় না।

"আপনাদের প্রশংসা পেয়ে আমার আনন্দের সীমা নেই—কারণ আমি জানি এ দেশের দক্ষ শিল্প-রসিকরাই আমার ছবির অনুমোদন করলেন। আমার প্রায় অহংকার হচ্ছে। আমার এ বিদ্যা নূতন বলে আমি এখনও এ সম্বন্ধে সহজ হতে পারিনি। তাই যখন ছবির প্রশংসা শুনি আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ হয়। কারণ এ সম্বন্ধে এখনও আমি ভরসা পাইনি। আমার মনের মধ্যে এর যথার্থ মান এখনও নির্দিষ্ট হয়নি যার উপর নির্ভর করে আমি নিজেই বিচার করতে পারি। তাই যাঁদের যথার্থ শিল্পদৃষ্টি আছে, অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের উপর নির্ভর করতে হয়। আপনাদের প্রশংসায় তাই আজ আমার এত আনন্দ।"

এই সহজ সরল স্বীকারোক্তি যে বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববন্দিত একজন পরিণত-প্রজ্ঞ মানুষের মুখে উচ্চারিত আজকের দিনে তা কতই বিস্ময়কর, যখন চতুর্দিকে জ্যেষ্ঠতাতবৃত্তি, বালখিল্যের মুখে বিজ্ঞের মুখোশ দেখে দেখে সরল সহজ ভাবনাগুলি একেবারেই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কারণে

বিশেষ করে আমেরিকায় প্রত্যেক কাগজ কবির সম্বন্ধে বার বার বলেছে যে নিজের প্রতিভা ও শক্তি সম্বন্ধে, নামখ্যাতি সম্বন্ধে, তাঁর উদাসীন অজ্ঞতা বড় মধুর।

—"ছাপ্পান্ন নম্বর রাস্তার ছবির গ্যালারিতে ছবির প্রদর্শনী খোলা হল। সেদিন মিসেস রুজভেল্ট ও জর্জ রাসেল উপস্থিত ছিলেন। উঁচুপিঠওলা একটি প্রকাণ্ড চেয়ারে গ্যালারির এক কোণে কবি বসেছিলেন। নরনারীর মিশ্রিত জনতায় ঘর পরিপূর্ণ। ঠাকুর বলছিলেন কী করে তিনি শিল্পী হলেন—"আমার এখনও এ সম্বন্ধে দ্বিধা সংকোচ রয়েছে...তোমরা যখন আমার ছবি দেখবে আমার কবিপরিচয়টা ভুলে যেও। একজন কবি এ ছবি এঁকেছে ভেবে একটুও মাপ কোরো না, ছেড়ে কথা বোলো না। এরাও তো এক স্বতন্ত্র শিল্পসৃষ্টি—কাজেই এরা এদের আপন যোগ্যতায় যেন নিজের স্থান পায়।"

প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "না, আমার ছবির কোনো গূঢ় তাৎপর্য নেই, আমার মনে কোনো দৃশ্যরূপ ছিল না—আমি কিছুই অনুকরণ করিনি...আমার অকুশলী আঙুল কলমের গতি নির্দেশ করেছিল...তারপর আমার চেতন মন তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে...আমার ছবি, রেখার কবিতা যদি এরা সমাদর পায় তবে আকারের ছন্দে যে আপন মূল্য আছে তারই জন্য পাবে, কোনো বস্তুর বা ভাবের প্রতিনিধিরূপে নয়।"

"গভীর রহস্যময় ধর্মভাব, আর সেই অনির্বচনীয় অধরা ভাবের প্রভাবে ভারতীয় কবিত্বের যে দীপ্তি তাঁর অন্তরে দীপ্যমান, তারই প্রকাশ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জলরঙের ছবিগুলিতে।...শ্রীযুক্ত ঠাকুর ভাবের ছবি আঁকেন—তাঁর গাঢ় রঙের খেলার মধ্যে কবিত্ব ও ধ্যানের প্রকাশ। তিনি যে রং ব্যবহার করেছেন তার ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তিতে তাঁর মনের নিষ্ঠা প্রকাশ পায় —এ ছবির প্রদর্শনী অসাধারণ। মনকে ঐশ্বর্যময়ী ভাবনায় আচ্ছন্ন করে দেয়—।...কিন্তু রেখার চিত্রগুলি রঙের মত সফল নয়।

"তাঁর শিল্পকৌশলের সঙ্গে তথাকথিত 'আধুনিক' শিল্পীদের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে—যদিও আধুনিক শিল্পীদের কাজে একটি বিশেষ রকম বিশেষত্ব ফোটাবার কৌশলের ভাব দেখা যায়—কবির ছবিগুলিতে তার বিপরীত ভাব মনে আসে, এখানে অবচেতনের সহজ প্রকাশ শিশুসুলভ সারল্যে খেলার মত সাবলীল। অথচ যেন তার মধ্যে কোনো ধূমায়িত অগ্নি প্রকাশস্পৃহ, ব্যাকুল।"[১]

১৯৩৪ সালে কলম্বোর একটি কাগজ কবির একটি মৌখিক ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করছে :

---

[১] *New York Times*, 19 Nov., 1930.

"আজ বার্লিন প্যারিস প্রভৃতি স্থানের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের আমার কাজের সম্বন্ধে সপ্রশংস অনুকূল মতামত পেয়েছি। বার্মিংহামে একজন শিল্পী যিনি ত্রিশ বৎসর এই কাজ করছেন তিনি আমায় বলেছিলেন, এরকম কাজ তিনি করতে পারলে সুখী হতেন। অনেক আর্টিস্ট আমায় বলেছেন ঠিক এইটিই তাঁদের লক্ষ্য ছিল।

"এ সব কথায় আপনারা আমায় অহংকৃত মনে করবেন কিন্তু কবিদের ও শিল্পীদের একটু অহংকার থাকা দরকার, নইলে নৈরাশ্যের বোঝায় তাদের মৃত্যু হত। আর আমার জীবনের এই শেষ কৃতিত্বের সম্বন্ধে একটু গর্ব তো আছেই কারণ এখনও আমার এটি অভ্যাস হয়ে যায়নি।...কবি কৌতুক-হাস্য করলেন—'সেইজন্যই তো এতক্ষণ আপনাদের শোনাচ্ছি অন্য দেশে কে কী বলেছে।'...

বিদেশে তাঁর চিত্রময়ী বাণী যে সংবর্ধনা পেয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে, এতদিনে পাশ্চাত্ত্য জগতকে তিনি তাঁর অন্তরের এমন কোনো রূপ দেখাতে পেবেছেন যা ঘোরা পথে বেশ বদল করে করে পৌঁছয়নি। তাই রাশিয়াতে তিনি বলছেন :

"আমি এদের বিশেষ করে এজন্য মূল্যবান মনে করি যে এদেরই সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য দেশের হৃদয়ে আমি প্রত্যক্ষ স্পর্শ করতে পেরেছি। বাক্য আমাকে বিফল করেছে, কথা সার্থক হয়নি—দোভাষীর সাহায্যে পরস্পরের মনের ভাব কেবলি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে—আশা করা যায় আমার ছবি আমাদের চিন্তার আদানপ্রদানেব উপযুক্ত দূত হয়ে আমাদের মনকে ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরকে চিন্তার সমভূমিতে নিয়ে যাবে।"

আজ শিল্পজগতে রবীন্দ্রনাথের স্থান সুনির্দিষ্ট। আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি অন্যতম এবং এদেশে নবশিল্পজাগরণের তিনি পথিকৃৎ। বহুবিধ প্রতিভা থাকা তত বিস্ময়কর নয় যত বিস্ময়কর ৬০ বছর বয়সে নূতনের পরীক্ষায় নিষ্ক্রমণ—নবদৃষ্টির উন্মেষ।

প্রত্যেক রূপের মধ্যে সকল অর্থের অতীত হয়ে যে অরূপ ব্যঞ্জনা থাকে—নিত্যব্যবহারের অভ্যাস তাকে আড়াল করে—সেই অভ্যাস অতিক্রম করে সে ভাল কি মন্দ, সুন্দর কি কুৎসিত চেনা কি অচেনা সেসব বিশেষ পরিচয় ছাড়াও তার অস্তিত্বের রূপটি শুধু কেবল শিল্পীই দেখতে পায়।

কবি বলেছিলেন—"সংক্ষেপে বলতে গেলে আমার কাব্যে একটিমাত্র পালা। সে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের পালা।" একথা তাঁর ছবি সম্বন্ধেও সত্য। প্রত্যেক বস্তু যে পদার্থ দিয়ে তৈরি, তার যে প্রয়োজন অপ্রয়োজন তার যে ব্যবহারিক অর্থ, এর কোনোটার মধ্যেই তার সমগ্র স্বরূপ নীরন্ধ্র হয়ে নেই। তার ভঙ্গিমার মধ্যে, তার জড়দেহের রেখায়

রেখায় তার আপন অস্তিত্বের মধ্যেই সে একটি আশ্চর্য সংবাদ বহন করে রেখেছে। যে আর্টিস্ট তাকে দেখতে পেয়েছে সেই দেখেছে বস্তুর ভিতরে ছবিকে। তুচ্ছর মধ্যে অনির্বচনীয়কে।”১

—“আর আছে আমার ছবি; কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল। আমার এই রেখানাট্যের নটী আর কারো চোখে ধরা দেয় কিনা তার সঠিক খবর পাইনি—ইংল্যান্ড থেকে দুই-একটা প্রেস নোটিশ বেরিয়েছে—নিন্দে করেনি, দুই-একটাতে আছে পেটভরা রকমের প্রশংসা। প্যারিসে একদা এর চেয়ে অনেক বেশী উঁচু গলায় বলেছিল—বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু এই প্রশংসা আমার মনকে আঁকড়ে ধরেনি, মুক্ত আছে মন। আমার ছবির প্রশংসা টেঁকসই কি না সে তর্ক বাজারে ওঠেনি, আমার মনেও না। আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদু-নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমার কাছে এই অদ্ভুত প্রকাশলীলার আনন্দই যথেষ্ট। ত্রিপুরার পর-লোকগত রাধাকিশোর মাণিক্যকে গবর্নমেন্ট যখন প্রথম মহারাজা উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তো আমার আপন প্রজার কাছে মহারাজাই, আমার এ পদ চিরস্থায়ী; কিন্তু সরকার বাহাদুর যে উপাধি দেবেন, সে তাঁরা দিতেও পারেন কেড়ে নিতেও পারেন, কী-ই বা তার দাম!’ আমার ছবির খ্যাতি সম্বন্ধেও সেই কথা। তার গায় ছাপ লাগায় যে মানুষ ছাপ মোছেও সে। তার চেয়ে অখ্যাতির গৌরবে আছে সে ভালো—আমিই তাকে মাঝে মাঝে দিচ্ছি বাহবা।”...(১৪/২/৩৯)

---

১ কবি সার্বভৌম।

পূর্ব ইয়োরোপে

১৯৫৫ সালে লৌহ যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় যাবার সুযোগ ঘটে। ১৯৫৪ সালে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী রাশিয়া ঘুরে এসে মেয়েদের একটি ঘরোয়া সভায় সেদেশে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন এবং সে প্রসঙ্গে বার-বার বিস্ময়ের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, রুশীয়রা মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল বা উৎসাহ প্রকাশ করে না। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী রাশিয়ায় জনপ্রিয় নন। সে সময় থেকেই মনে করেছি যে রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মনোরঞ্জনই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের দুজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বেছে নেবার সার্থকতা কোথায়? বিশেষত স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দিল্লীতে যে 'এশীয় সম্মেলনে' আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী মহা-সমারোহে ঘোষিত হয় তখন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম একবারও উল্লিখিত হয়নি এবং এই বিস্ময়কর বিস্মৃতিতে সারা ভাবতবর্ষই ছিল নীরব। একমাত্র ক্ষিতিমোহন সেন পরিতাপের সঙ্গে এ যুগে বিশ্বমৈত্রীর বাণীর প্রথম উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথের নামের উল্লেখ না হওয়ার কথা লিখেছিলেন, তাঁর সেই লিখিত প্রতিবাদের মারফত তখনই আমরা জেনেছিলাম যে, এশীয় সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না হওয়া ও দিল্লীতে কোনো পাঠযোগ্য বই না পাওয়া যাওয়া—এই দুটি ব্যাপারেই রুশ অভ্যাগতরা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে বর্তমান প্রবন্ধের লেখিকাও কাগজে একটি প্রতিবাদ ক'রে নানা বিদ্রূপভাজন হয়েছিল।

আজ সেই পুরানো কথার উল্লেখ করবার উদ্দেশ্য এই যে, রাজনৈতিক মতলবের জন্য রবীন্দ্রপ্রীতি দেখাবার প্রয়োজন কী? তার জন্য আবো উপযুক্ততর পন্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষের নন। এই সেদিনও শুনেছি অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্রনাথের তুল্য কবি আছেন বা ছিলেন। রবীন্দ্রকাব্য পড়বার জন্য অন্যপ্রদেশবাসী ভারতীয়রা বাংলা শিখতে উৎসাহিত হয়েছেন কজন? অপরপক্ষে মহাত্মা গান্ধী সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক নেতা নিশ্চয়ই। এবং বর্তমানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক দলের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মনোরঞ্জন বা কাজ হাসিলের জন্য তাঁকে বাদ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হতো। (বর্তমানে অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে এ মতের)

যাঁরা কেবলই বলেন যে, রাজনৈতিক মতলবে আজ বিশ্বজন রবীন্দ্রনাথের

সমাদর করছে তাঁদের মনের কোণে হয়ত এ বিশ্বাসও লুকিয়ে আছে যে, ঐ রকম একটা মোটা রকমের স্বার্থগত হেতু ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশ্বব্যাপী সমাদরের আর কোনো যোগ্যতর কারণ নেই। আরও একটা কথা এ'রা দল বেঁধে ক্রমাগতই বলে চলেছেন, রবীন্দ্রকাব্যের উপযুক্ত অনুবাদ হয়নি, অতএব তাঁর পরিচয় জগৎ পেল কী করে বা কোনো দিনও পাবে কী করে! এই কথার উত্তরে বর্তমানে সোস্যালিস্ট জগতে রবীন্দ্রনাথের সমাদরের যে প্রকাশ দেখেছি তার যতটা কারণ নির্ণয় আমার যুক্তিগত মনে হয়েছে তারই একটি ধারাবাহিক বর্ণনা করব। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজও ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রভাব, তাঁর মূর্তি, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়। এবং বিস্ময়ের কথা এই যে, ১৯২২ সালে জার্মানিতে যখন রবীন্দ্রনাথ সমাদৃত হয়েছেন তখন ক্ষুব্ধ ইংল্যন্ড বারে বারেই বলেছে—এসব পোলিটিক্যাল চাল কিংবা জার্মানি ভারতবর্ষের বাজার দখল করতে চায়। কাজেই আজ যে কথা স্বদেশে শোনা যাচ্ছে তেমনি অনুযোগ ৪০ বছর পূর্বে বিদেশেও শোনা গিয়েছিল। এ হয়ত রবীন্দ্রনাথেরই ভাগ্যলিপি।

সাহিত্য যে বিশ্বের জিনিস, এক দেশের মর্ম থেকে উদ্গত হলেও দূর-দূরান্তরে বিভিন্ন স্থান-কাল ও পাত্রের উদ্দেশে সে বিশ্ববার্তা বহন করে চলেছে, এ কথা আমরা জানি কিন্তু বিশ্বাস করি না, কারণ স্থানকালের সীমা-উত্তীর্ণ তেমন সত্যবস্তুর নাগাল পাবার মত মনের সীমানা আমাদের সর্বদা খোলা থাকে না। অনুবাদের যোগ্যতা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, কবিতা ভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে পারে কিনা তাও বিচার্য। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন গীতাঞ্জলির কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ঘেরা আছে তাহলে তা অবশ্যই ভুল হবে। এই সেদিন পর্যন্ত ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের কম বই-ই পাওয়া যেত, কিন্তু তাঁর উচ্চারিত কতকগুলি অমোঘ সত্য, যে সত্যের প্রতীকরূপে তাঁর আপন জীবন বিশ্বের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তার পরিচয় বিশ্বজনের সামনে বিধৃত আছে, যেমন আছে আমাদের সামনে বুদ্ধের মূর্তি। কজন ত্রিপিটক পড়েছে? কজনই বা শূন্যবাদের বিশ্লেষণ করেছে? আর কজনই বা শূন্যবাদে আস্থা রাখে? কিন্তু সাম্য মৈত্রী করুণা ও তিতিক্ষার প্রতীকরূপে সেই 'সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্' বুদ্ধের করুণাময় মূর্তি আমাদের পরিচিত। তেমনি যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পরস্পর-হননরত ইয়োরোপের মর্মে রবীন্দ্রনাথ আজ একটি বিশেষ আদর্শের প্রতীক, যাঁর সারা জীবনের কর্ম ও কবিতার ভাবে ও বাস্তবে বর্তমান যুগের মহত্তম বাণী ঘোষিত। বিশ্বমৈত্রীভাবনার একটি বিগ্রহরূপে তাঁর দিব্যমূর্তি ইয়োরোপের স্মৃতিতে বিধৃত। সেজন্য আমাদের রবীন্দ্রনাথের সবগুলো কবিতা পড়বার দরকার হয়নি। বস্তুত

যেসব পাঠক মাতৃভাষার সব কবিতা পড়বার আশ্চর্য সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন তাঁদের অনেকেরই মনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেই ব্যাপকরূপ বুঝবার উপযুক্ত পারিপ্রেক্ষিত নেই। সোস্যালিস্ট দেশে রবীন্দ্রনাথের সমাদরের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আগে সে দেশের অবস্থাটা আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথের মননা যে কত ব্যাপকভাবে, গভীরভাবে, সর্বকালের মানবের জন্য উচ্চারিত চিরসত্য তা বুঝতে হলে আমাদের অন্য দেশের মানুষদের সংস্পর্শে তাঁদের বিশেষ সমস্যাপীড়িত জীবনের ভিতর দিয়ে তাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তবেই পূর্ণরূপে বুঝতে পারি।

একথাও অনেকে অনুমান করে প্রচার করছেন যে, হয়ত সোস্যালিস্ট দেশে রবীন্দ্ররচনা বিকৃত করে অনুবাদ করা হচ্ছে। ‘হয়ত’ ছাড়া এঁদের অন্য পন্থা নেই। কারণ—অনুবাদ এঁরা কেউই পড়েননি। অনুবাদে ভুল থাকা অসম্ভব নয়—কিন্তু বক্তব্য বিকৃত করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের রচনায়, বক্তব্যে ও জীবনে এমন কিছুই নেই যা সোস্যালিস্ট মতবাদের পরিপন্থী। “রাশিয়ার চিঠি” নামে যে আশ্চর্য গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পরাধীন ভারতবর্ষে প্রকাশ হতে পারেনি ও স্বাধীনতার পরও ১০/১১ বছর চাপা ছিল তার প্রতি ছত্র এমনকি তৎকালীন রুশীয় সরকারের সমালোচনা পর্যন্ত আজকের সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সত্য। শুধু ঐ বই বা কেন, ছিন্নপত্র ও সাধনার যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তাধারাই নূতন যুগের এই নূতন বাণীর ঘোষণা বহন করে এসেছে। রাশিয়া থেকে ফিরে তিনি লিখেছিলেন “তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়।” শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছে শুনেছি, তখন তিনি বিশেষভাবে পুত্রকে সেই মতানুবর্তী করতে ও জমিদারীর স্বত্ব প্রজার স্বার্থে সম্পূর্ণ ত্যাগ করাতে চেষ্টা করছিলেন। কৃতকার্য হননি। জমিদারি চলে গেল কিন্তু এতবড় একটা সংকল্প পূরণ হল না। যদি হত তাহলে নাইটহুড ত্যাগের তুল্য ববীন্দ্র-জীবনে সেই কীর্তি একটি বিশেষ দিগ্‌দর্শন চিহ্ন হয়ে থাকত।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য, জীবন ধর্ম কর্ম, তাঁর প্রতিপাদ্য দর্শন “মানুষের ধর্ম”র ভিতর এমন কিছুই নেই যা সোস্যালিস্ট সমাজের অনুমোদনযোগ্য নয়। বলাই বাহুল্য, যে দেশের সরকার কোনো একটি বিশেষ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত তারা সে মতের বিরোধী কিছু প্রচারে উৎসাহী হবেন না। গান্ধীজীর জীবন-দর্শন বহুলাংশে তাদের বিরোধী, তাদের মতবাদের সঙ্গে অসংগত, রবীন্দ্রনাথের তা নয়। বস্তুত যে মতের কাঠামোর উপর তাদের কর্মকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে তারই বৃহত্তর ও পূর্ণতর মহিমার আস্বাদ পেয়েই তারা সে সম্বন্ধে আগ্রহী। অবশ্য সামান্য আস্বাদই তারা

পেয়েছে—তাদের পথের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কতখানি আশা তার পুরো সংবাদ তারা আজ পর্যন্ত জানে না। ধরা যাক, ৭/৩/১৯৩৫ তারিখে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা যে পত্রখানি 'কবিতা'র ১৩৪১-এর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, সে চিঠিখানি যদি আজ কোনো অল্পবয়সী রবীন্দ্রনাথ লিখতেন তবে তিনি যে কমিউনিস্ট বলে ভর্ৎসিত হতেন এতে কোনো সন্দেহই থাকে না, তাঁকে দেশদ্রোহী বলে একঘরে করা হত এবং কোনো কোনো প্রসিদ্ধ দৈনিক তাঁর লেখাই ছাপত না। নানা পরীক্ষা ও আত্মবিরোধের বন্ধুর পথে সোস্যালিস্ট মতবাদ প্রয়োগের যে কর্মযজ্ঞ তাতে ভুলত্রুটি ও দুর্ভোগ অনেক আছে। সেই যজ্ঞের ধূম ও অগ্নিদাহের প্রাত্যহিক নৈকট্যে তার তত্ত্বমহিমা বহু সময়ে বহুলোকের কাছে আবৃত হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা-দর্শন ও সাহিত্যের সুধানির্ঝরে তারই এক শুদ্ধ সত্যরূপ আজ সত্যসন্ধানী বিশ্বজনের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। একথা যে কত সত্য তা এবার বিদেশে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আকৃতি প্রকৃতি দেখে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

হাঙ্গেরির রাজধানী বুডাপেস্ট শহরে দানিউব নদীর তীরে হোটেল গালার্ড। দুধারে বাঁধানো তীরের শাসনের মধ্যে খালের মত স্থিরস্রোতা নদী দানিউব। আমি সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরের গঙ্গাতীরবাসী বাঙালীর মেয়ে। আমার কাছে সে যেন পাঠ্য বইয়ের ধারা বেয়ে সুদূর দেশকালের ইতিহাস থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। অপেক্ষা করে আছি নিয়ে যাবে বালাতন হ্রদের তীরে রবীন্দ্রোৎসবে। দোভাষীর সঙ্গে দুটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এলেন, বৃদ্ধার একদা সুন্দর মুখ বহু দুঃখ-কষ্টের বলিরেখাঙ্কিত। কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন—এই হোটেলের ১২৩নং ঘরে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে বাস করেছিলেন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হোটেলটি বিচূর্ণীকৃত হয়েছিল। আবার নূতন করে তৈরি হয়েছে। ১৯২৬ সালে এই বৃদ্ধা ছিলেন অষ্টাদশী তরুণী। তিনি ফুল নিয়ে কবির সংবর্ধনা করতে এসেছিলেন, যেমন এসেছিল আরো অনেকে। তবে এঁর বিশেষ আনন্দ এই যে, প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে তিনি কবির কাছে পেঁাছতে ও স্বহস্তে পুষ্পোপহার দিতে পেরেছিলেন। বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম ভদ্রমহিলার ভঙ্গুর শীর্ণ বৃদ্ধ দেহের দিকে, এত বৃদ্ধ হবার বয়স তো নয়। তখন মনে পড়ল ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ—কত বিপর্যয় ঘটে গেছে এঁদের জীবনে! "আপনার আজও মনে আছে, যে ঘরে তিনি ছিলেন তার নম্বর কত?"

"থাকবে না? সে কি সামান্য ঘটনা?"

"বালাতন হ্রদ বা বালাতন ফ্যুরেড্ বুডাপেস্ট থেকে বেশ কিছু দূর—প্রায় দেড়শ মাইল। সেখানে একটি স্বাস্থ্য-নিবাস। অনেকেই জানেন

১৯২৬ সালে ইয়োরোপ ভ্রমণ-ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করেন—সে সময়ে তাঁর নিরাময়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। যতদূর মনে হয় সেটি লিন্‌ডন্‌ গাছ, লেবুজাতীয় উদ্যান-শোভা ইয়োরোপের পথের দুধারে সাজানো থাকে। সেই ছোট চারা আজ সতেজ বৃক্ষ, শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে ঝলমল করছে। তারই নিচে স্থাপিত হয়েছে ব্রোঞ্জের একটি মূর্তি। মূর্তিটি কার তৈরি তা জানি না--শুনলাম কোনো ভারতীয় শিল্পীর। রবীন্দ্রনাথের সেই মূর্তির নিচে খোলা বাগানে স্মৃতি-উৎসব হল। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দলে দলে পুষ্পোপহার সাজিয়ে স্যালিউট করতে লাগল, অপরিচিত দুর্বোধ্য ভাষায় জয়ধ্বনি করতে লাগল. তখন সেই সুদূর দেশে ভিন্নভাষা-ভাষী লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে মন আনন্দে অশ্রুধৌত হতে লাগল। একজন অধ্যাপক হাঙ্গেরীয় ভাষায় কবির জীবনী পড়ছিলেন. দোভাষী অস্ফুট কণ্ঠে তারই অনুবাদ শোনাচ্ছিলেন। বক্তার একটি কথা আমার বড় ভাল লাগল—তিনি বলছিলেন একদিন এই উদ্যানে রবীন্দ্রনাথ যে ছোট চারাটি পুঁতেছিলেন তা আজ সতেজ সুন্দর সবল বৃক্ষ হয়েছে. তেমনি তিনি এ যুগে নূতন করে তাঁর দেশের মর্মে একটি শান্তির বীজ বপন করেছিলেন সেই বীজ আজ পরিপূর্ণ শোভায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তাই আজ এই দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ. যুদ্ধক্লান্ত, শাণিত হননবৃত্তি পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষ শান্তির বাণী. পঞ্চশীলের ধর্ম, সহ-অবস্থানের কথা এমন প্রবল শক্তিতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পারছে।—জানি না বিশ্বজনের এ প্রশংসা কতখানি আমাদের প্রাপ্য। তবে সেই দূরদেশে, অজানা পরিবেশে. অজ্ঞাত ভাষায় উচ্চারিত গুরুর প্রতি এ শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্বদেশের প্রতি অর্পিত এ বিশ্বাস সমস্ত সত্তাকে আবেগে মথিত করে তুলেছিল।

সেদিন উৎসবে একটি যুবক 'গোরা' থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট আবৃত্তি কবে আমায় চমৎকৃত করে দিলেন—আমরা সচরাচর কবিতা আবৃত্তি করে থাকি. তাও আজকাল বই দেখে পড়াই রেওয়াজ হয়েছে কিন্তু গোরার মত কঠিন বই যে এমন অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করা যেতে পারে তা আগে কখনো মনে করিনি। সোস্যালিস্ট জগতে গোবা অতি পরিচিত বই—সর্বত্র এর উল্লেখ এবং আবৃত্তি শুনেছি। বিস্ময়ের সঙ্গে ভেবেছি. বিদেশী এর মধ্যে কী পায়? এ তো একেবারে ভারতবর্ষের ঘরের বই—বলতে গেলে যুক্তিবাদের আলোকসম্পাতে বাঙালী জীবনের উন্মোচনের বই। বিবেকানন্দের মতবাদ ও ব্রাহ্মসমাজের ভাবনার মধ্যে কবির বিশ্লেষণপূর্ণ সৃজনশীল মনের সঞ্চরণ। শুনেছি. সত্য কিনা জানি না যে নিবেদিতাব হিন্দুধর্মের বহু সংস্কারের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা, তাঁর 'কালী দি মাদার'

বক্তৃতা, নিবেদিতার জীবন, কবির মনে গোরার চরিত্রের আভাস আনে। এও শুনেছি গোরার পরিশিষ্ট অংশটুকু—সাহিত্যের দিক থেকে যার প্রয়োজন ছিল না মনে হয়—সেটুকু নিবেদিতার পরামর্শেই লেখা। হাঙ্গেরিয়ান যুবকের আবৃত্তি চলছিল। নামগুলি লক্ষ্য করে বুঝতে পারছিলাম এটি বইয়ের শেষ অংশ যেখানে পিতার রোগশয্যার পাশে চরম অঙ্কের দৃশ্য চলেছে। একদা যে ইংরেজদের ঘৃণা করেছে সেই সাহেব ডাক্তারের দিকে চেয়ে গোরার মনে হল, তাহলে এই লোকটিই তার সবচেয়ে আপনার? সকলবন্ধনচ্যুত গোরার আর্ত প্রশ্ন : 'মা, তুমি আমার মা নও?' অপরিচিত ভাষার মধ্যে যেন প্রাণ পেয়ে উঠল. এ জিজ্ঞাসা যুদ্ধ-আর্ত মানুষের নারীসমাজের কাছে এক চিরপ্রশ্নের মত—মা যদি মা হয় তবে কি এই হননবৃত্তি এমন অবাধে চলতে পারে? যুদ্ধের পূর্বে ও পরে যেসব অবাধ হত্যালীলা চলেছে তার মধ্যে মেয়েদের করণীয় কি কিছু ছিল না?

জার্মানিতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের প্রদর্শনীতে সাজানো আছে ইহুদী মেয়ের চুলের তৈরী পা-পোশ আব মানুষের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। শুনেছি ইহুদীর চামড়ার তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ সে সময়ে মেয়েদের ফ্যাশান হয়েছিল। ইয়োরোপের বুকের উপর যুদ্ধের তান্ডবলীলা যে কী তা আমরা দূরে বসে কিছুতেই অনুমান করতে পারি না। এমন কোনো সংসার নেই যেখান থেকে কেউ না কেউ অত্যাচারিত বা যদ্ধে নিহত হয়েছে—উপযুক্ত বয়সের জোড় মেলানো নেই স্বামী-স্ত্রীর। মধ্যবয়সী মেয়েদের অনেকেরই অল্পবয়সী স্বামী—কারণ যুদ্ধে স্বামী মারা গেছে, তারপর নিঃসঙ্গ জীবনের দায়ে আবার কাউকে বিয়ে করেছে যারা অনেক সময়েই হয়ত বয়সে ছোট। বুলগেরিয়াতে একটি লেখিকা আমার সঙ্গে একসঙ্গে নানা স্থানে বেড়ালেন. সর্বদা সাহিত্য আলোচনা—ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অফুরান প্রশ্ন চলেছে। কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে বসে করেছি কবিতা আবৃত্তি বাংলায়. কখনো পাহাড়ের উপত্যকায় নদীর ধারে বসে বলেছি ভারতবর্ষের জীবনের নানা কথা। কখনো তাঁকে বিমর্ষ মনে হয়নি। পাঁচ-ছয় দিন নিরন্তর একত্র ভ্রমণের পর হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধে আপনার পরিবারের কোনো ক্ষতি হয়নি? ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন। তাঁর প্রসন্ন মুখের উপর শোকের ছায়া পড়ল—শুনলাম বুলগেরিয়াতে বোমাবর্ষণ কমই হয়েছিল, কারণ দু-চারবার বোমার পরই এদের তৎকালীন ফ্যাসিস্টপন্থী সরকার হিটলারের সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারই মধ্যে একদিন তাঁর পরিবারের পাঁচটি লোক একসঙ্গে মারা গেছে। ভদ্রমহিলা থেমে থেমে বলছিলেন, সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই বোমা পড়ল, সময় পেলাম না সেলটারে ঢুকবার; যেন একটা দমকা হাওয়ায়

আমি ও আমার স্বামী একটা ছোট্ট কোণের মধ্যে সজোরে ঢুকে গেলাম—যখন জ্ঞান হল দেখি ভাঙা বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অর্ধপ্রোথিত হয়ে গেছি। আমার স্বামীর মুখের নানাস্থান থেকে রক্তপাত হচ্ছিল। আমি চিৎকার করছিলাম আমাকে মুক্ত করবার জন্য, কিন্তু তিনি কোনো কথা না বলে আচ্ছন্নের মত চলে গেলেন—যখন ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এলেন তখন বুঝলাম ভীষণ কিছু ঘটেছে। আমার বাবা মা ভাই, তার স্ত্রী ও পাঁচ বছরের ভাইপো সব একসঙ্গে প্রোথিত—কেউ মৃত কেউ মুমূর্ষু -ভাইপো ছিল আমাদের পরিবারের একমাত্র শিশু, বড় আদরের—সে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবু ভাবলাম তাকে ভাল করে সৎকার করব—'we picked him up from bone to bone.'

সোফিয়াতে একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে আমার দোভাষীর কাজ করত। সে আমাকে বলেছিল, যুদ্ধে এসব পারিবারিক ক্ষতি বা বোমাবর্ষণে হত্যা ইত্যাদি মানবাত্মার তত অবমাননা নয় যত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অত্যাচার। তার বর্ণিত সব কথা আমার বিশ্বাস হত না—যদি না সে সময়ে আইখম্যানের বিচারের খবর শোনা থাকত। বিস্ময়ের কথা এই যে ইয়োরোপে অর্থাৎ সোস্যালিস্ট দেশেও ঐ বিচারের বর্ণনা এত প্রকাশিত হয়নি। সে মেয়েটি আমায় বলেছিল সোফিয়াতেই একজন ইহুদী ভদ্রলোক আছেন হিটলারের আক্রমণের সময়ে তাঁর বয়স ছিল উনিশ। একদিন জার্মান সৈন্যদল সদ্য চলে যাবার পর একটা নাপিতের দোকানে সে ক্ষৌরকর্ম করছিল, হঠাৎ তাকে একজন বললে তুমি ইহুদী হয়ে এই সাবান ব্যবহার করছ? তখন সে তাকিয়ে দেখে তাতে লেখা আছে—জে এস. জুডা সোপ, অর্থাৎ ইহুদীর চর্বির তৈরি সাবান। সে ছেলেটির মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে গেল। ইয়োরোপে ভ্রমণকালে একটু বয়স্ক লোকের কাছে কথা তুললে এমন কত যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায় তার শেষ নেই। অবশ্য কথা না তুললে কেউই কিছু বলে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্তমান বংশের মন থেকে হয়ত কিছু মুছে যাচ্ছে, তবু যারা সেই অগ্নিপরীক্ষা পার হয়ে এসেছে তারা যেখানে শান্তির আশ্বাস পায় সেখানে আশা ও বিশ্বাসে ছুটে না এসে পারে না। ইয়োরোপের এই দেশগুলিতে তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী এক বিশেষ তাৎপর্যে, এক বিশেষ অর্থে প্রকাশিত। জীবনে যেসব সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার মধ্যে বাঙালীর কাছে রবীন্দ্র-কাব্য ও মননা সত্য হয়েছে, ইয়োরোপের মানুষের কাছে তার চেয়ে ভিন্নতর অভিজ্ঞতার মধ্যে তা সত্যের অন্যমুখ প্রকাশ করেছে। এই 'গোরা' বই আমাদের কাছে জাতিভেদের অমূলকতা ও ভ্রম গোরার জীবনকাহিনীর অপ্রত্যাশিত ঘটনাসমাবেশের মধ্যে প্রকাশিত। ইয়োরোপে এই বই বিভিন্ন নেশনের সাদা-কালোর,

ইহুদী-খ্রিশ্চানের ভেদের অলীকতা প্রকাশ করেছে। আনন্দময়ী বলছেন, ছোট শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই—এই অনুভব সত্য হলে কি জুড়া সাবান তৈরি হতে পারে? আমাকে একটি বিদেশিনী বলেছিলেন—গোরা এক আশ্চর্য বই, এই বইতে আমরা গোটা ভারতবর্ষকে পাচ্ছি—পাচ্ছি সমস্ত বিশ্বের সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত। পাচ্ছি অতীত ভারতের সমস্ত চিন্তার ঐশ্বর্য, দেখছি অভ্যাসে আবদ্ধ অচলায়তনে ঘেরা সংস্কারবিমূঢ় ভারতীয় সমাজ, দেখছি নূতন যুগের উদয়, তার জিজ্ঞাসা ও যুক্তিবাদের মধ্যে অন্ধসংস্কারের মুক্তি। গল্পের প্লটের মধ্য দিয়েই কত সহজে চিরসত্যের প্রকাশ, যে মানুষ অন্তরে এক, তার জাতি সমাজ অভ্যাসের পার্থক্য এক বহিরঙ্গ ঘটনা মাত্র—একথা কত সত্য যে শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায়। মানুষের জাত নেই; ভালবাসলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই, অথচ এ সত্য কত অজ্ঞাত হয়ে ঢাকা পড়ে থাকে মানুষের জীবনেই—নইলে মানুষে মানুষে হানাহানি হয় কী করে? বোমাই বা ফেলা হয় কী করে? এই বই ভারতের সমস্যার গ্রন্থিছেদন করে জগতের সমস্যার মূলে এসে এক পরম সত্যকে প্রকাশ করে তুলেছে—এ তাই এক আশ্চর্য কাব্য।' যখন বিদেশীর মুখ থেকে এসব কথা শোনা যায় তখনই যথার্থ উপলব্ধি হয় যে সাহিত্য বিশ্বের জিনিস—এক স্থানে উদ্গীত হলেও তা উদ্ভিন্ন হয়ে উঠে সর্বতোমুখে। একথা নিতান্তই সত্য যে কেবল বাঙালীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। এই বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর বাণীর বহুধা শক্তি ও মহিমা যে নূতন চোখে নূতন অর্থে দেখতে পায় তার সবটাই আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখেছিলেন বলেই তাঁর উচ্চারিত চিরসত্যগুলি একমাত্র বঙ্গীয় নয়।

বুলগেরিয়াতে রবীন্দ্রশতাব্দী উৎসবের প্রথম সভায় সোফিয়ার প্রসিদ্ধ থিয়েটার-গৃহে ৯ই মে উপস্থিত হলাম। ১৯২৬ সালে ঐ গৃহে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হয়, সে স্মৃতি উল্লেখ করবার মত অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—বিখ্যাত লেখক স্তোয়েনভ তাঁর মধ্যে একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাত-আটখানি বই লিখেছেন—আড়াই ঘণ্টার উৎসবে যা আলোচনা হল তার কিছু কিছু পরের দিন খবরের কাগজের রিপোর্ট থেকে অনুবাদ করিয়ে বুঝতে পারলাম। বাংলা কবিতার ছন্দমাধুর্যের দেখলাম খুবই সমাদর। আমাকে অনেকেই বলেছেন বাংলা কবিতার আবৃত্তিতে তাঁরা এমন কিছু পান যে অর্থবোধ না হলেও তা ভাব উদ্বেলিত করে—সংগীতের মত তার এক অব্যবহিত বোধ জন্মায়। জানি না এ কথা সত্য কিনা, সত্য

হলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও তা শুনতে পাননি, নইলে এত বাংলা বিদ্বেষ হত না।

বুলগেরিয়ার ছোট ছোট শহরে—নানা জায়গায় রবীন্দ্রোৎসব হয়েছে। কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে স্বাস্থ্যনিবাস অতি সুন্দরী ভার্না—সেখানে উৎসব হল—উৎসবের প্রধান অঙ্গ রবীন্দ্রজীবনী পাঠ—তারপর নানা কাব্য থেকে আবৃত্তি—বিদেশী ভাষার মধ্যে কান পেতে আছি, হঠাৎ শুনলাম 'শেখরলাল', বুঝলাম দুরাশা গল্পটি আবৃত্তি করছে—ঐ গল্পের অর্থ সেদিন বিদেশীর কণ্ঠে গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশ পেল। যে জাত্যভিমানে ব্রাহ্মণ একদা নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিল, দেখা গেল সে শুধু অভ্যাস, আর কিছু নয়। রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে জাতিধর্মের শৃঙ্খলছিন্ন, সংস্কারবিমুক্ত, শুদ্ধ মানবতার বিশ্বাভিমুখী বাণী সোস্যালিস্ট জগৎ আজ জাতি-গর্বিত শ্বেত-কায়দের শোনাতে চায়। কাস্ট হিসাবে যে জাতির কথা একদা ব্রাহ্মণ গোরা মেনেছিল রেস্ হিসাবে তো সারা ইয়োরোপে তারই পুনরাবৃত্তি চলেছে—শেখরলাল যে জাত্যভিমানে যবনীর হাতের জল প্রত্যাখ্যান করল সেই অভিমানই তো আজও Little Rock-এ নিয়ে শিশুদের স্কুল-কলেজ থেকে খেদিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—ইয়োরোপীয় জীবনে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের বহু গল্প কবিতাই যে অর্থ প্রকাশ করছে, নানা মানুষের চিন্তায় ও অনুভূতিতে সত্য হয়ে উঠছে—তারা বাংলা জানে না বলে বা রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের ভাষা আধুনিক ইংরেজিসম্মত নয় বলে তার মূল্য ব্যর্থ হয়নি।

উৎসবান্তে ফিরে এলাম কৃষ্ণসাগরের 'স্বর্ণবালু'-তীরে আমাদের অতিথি-নিবাসে। তখন মধ্যরাত্রি; সমুদ্রের ছলছল শব্দ পুরীর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল, আর সবই পৃথক, এই আশ্চর্য সুন্দর স্বাস্থ্যনিকেতন মাত্র ছ-সাত বছর হয় গড়ে উঠেছে—বিভিন্ন ইউনিয়নের কর্মীদের জন্য—যেমন লেখক সংঘ, পাবলিশার্স, ইঞ্জিনীয়ার, রোড-বিল্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজ ইউনিয়ন এই বাড়িগুলি তৈরি করছে—সম্পূর্ণ নূতন স্থাপত্য, সুখ-সুবিধা ও সৌন্দর্যের সমাবেশ—শ্রেষ্ঠ হোটেলের মত গৃহসজ্জা, উদ্যানে পুষ্পশোভা, এখানকার সমুদ্রতীরে দেখলাম বাগান খুবই ভালো হয়েছে। এই সমস্ত সুশোভিত গৃহ থেকে বেরিয়ে মজুরশ্রেণীর লোককেও সমুদ্র-স্নানে যেতে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে বাড়ি এত পরিচ্ছন্ন রাখা কী করে সম্ভব হয়?—যে উত্তর পেয়েছিলাম তা উপযুক্ত উত্তর বলে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে ধারণা করা যায় না। ওরা বললে প্রথমে অপরিচ্ছন্ন হয়ে যেত, কিন্তু এত পরিষ্কার থাকলে আর কেউ অপরিষ্কার করতে পারে না। আমার স্বদেশের বড় বড় ইমারত ও

সাধারণের ব্যবহৃত স্থান, সভাগৃহ, সিঁড়ি প্রভৃতিগুলির দিকে দেখলে একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। তা সত্যিই তো বাগানে ফুলের শোভা—কেউ ছিঁড়ে নিচ্ছে না—আয়নার মত পালিশ করা স্বাস্থ্যনিবাস, অশোকা হোটেলের তুল্য ঝকঝক করছে। আর স্বচক্ষেই তো দেখলাম কালেক্টিভ ফার্মের চাষী রমণী সেখান থেকে ছুটে এসে আমার শাড়ির এক প্রান্ত তুলে চুম্বন করে সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে বললে 'ইন্দিস?' শুনলাম নানা কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক মানুষকেই বছরে এক মাস কি তিন সপ্তাহ ছুটি নিতে হয়, তখন তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসে স্থান পায়, সেখানে সব শ্রেণীর কর্মী একই সুবিধায় একই গৃহে বাস করে, তার মধ্যে উচ্চ নীচ নেই এবং টাকার অঙ্ক হিসাবে তিন সপ্তাহে একজনের খরচ পড়ে ১৯ টাকা। নিজের বাড়িতে থাকলে তার অন্তত চারগুণ ব্যয় হয়। এই বুলগাররা সেদিন পর্যন্ত তুর্কীদের অধীন ছিল। সর্বসমেত পাঁচশ বছরের অধীনতা ভোগ করে অল্পদিনই স্বাধীন হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্গ্রহ পার হয়েও এমন করে দেশকে গড়ে তুলতে চাইছে, ধনী-দরিদ্র প্রভেদ দূর করতে চাইছে। প্রমাণ করতে চায় যে, সব মানুষই এক সম্পদের উত্তরাধিকারী-কেনই বা এরা তার জন্য উপযুক্ত নির্দেশের সন্ধানে দেশদেশান্তরে খুঁজে বেড়াবে না? এইসব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি, গভীর রাত্রির ঠাণ্ডা সমুদ্রের বাতাস লাগছে চোখেমুখে, উপরে অজানা দেশের আকাশে চিরপরিচিত জ্যোতিষ্কের সভা—আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে একটু পিছিয়ে পড়েছেন হঠাৎ বাগানের লতা-গুল্মের পাশ থেকে মিলিটারি পোশাক পরা একটি মাতাল 'ইন্দিয়া ইন্দিয়া ইন্দিয়া' বলে এক সংগীত জুড়ে আমার সামনে এসে হাত নাড়তে শুরু করা মাত্র দ্রুতগতিতে সকলে এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দিলে...তারপর বহুক্ষণ পর্যন্ত বহুবার মার্জনা চেয়ে তিনজনই বলতে লাগলেন ও বুলগার নয়, চেক। যেন কোনো বুলগারের পক্ষে এমন অভদ্রতা করা অসম্ভব। আমার একটু মজা লাগল বৈকি। জাত্যভিমান কত মর্মগূঢ়—কত রকম ছদ্মবেশে অবচেতনায় মূল গেঁথে আছে তাকে কি সহজে স্খালন করা যায়? ভেদবুদ্ধি, অহং ও আত্মাভিমানকে বিশ্ববোধে পরিণত করা কি সোজা কাজ! তবু তো তার চেষ্টা করা চাই- যাঁরা সে পথের নির্দেশ করেন তাঁদের বাণীর জন্য কান পেতে থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ সোফিয়াতে এসেছিলেন ১৯২৬ সালে—সে সময়ে তাঁর রাজকীয় ও প্রীতিপূর্ণ সংবর্ধনা হয়েছিল বস্তুত সারা ইয়োরোপ মহাদেশেই, এই সংবর্ধনার প্রকৃতি ও সমারোহ একই রকম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বাণীর সত্যতাকে যাচাই করে নেবার সময় তখনও হয়নি। তাঁর

সম্বন্ধে জ্ঞান অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যে নবযুগের বাণী তাঁর কণ্ঠে সেই নূতন যুগের পূর্ণ উপলব্ধি কজনেরই বা ছিল? এ সম্বন্ধে বুলগেরিয়ায় প্রকাশিত ১৯২৬ সালের খবরের সঙ্গে বর্তমান শতাব্দী-উৎসবের প্রসঙ্গে ঐ দেশে আলোচিত বক্তব্যের তুলনা করা যেতে পারে। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ডাঃ এলেন স্লাটারক নামে ঐ দেশীয় একজন নামী সাহিত্য-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বই লেখেন, তার ভূমিকায় আছে : "ঠাকুর সোফিয়াতে আসছেন ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের ধর্মগুরু, (spiritual leader), সেই জ্ঞানী পুরুষ যিনি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে হিন্দুর ধ্যানমগ্ন আত্মা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন...তিনি যে আজ সোফিয়ায় আসছেন, এ কি বিস্ময়ের কথা নয়? হাউস অফ কালচারের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা সীমানার স্টেশনে প্রত্যুদ্গমন করতে গিয়েছিলাম সেখানে পেঁাছেই কবি ও মনীষীর সামনে উপস্থিত হলাম। তাঁর কালো চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি মর্মভেদী, তিনি মৃদু হাস্য করছেন, সে হাসি তাঁর মানবপ্রেমের দ্যোতক।...তাঁর সৎস্বভাব ও নম্রতা আমরা যেন অনুভব করলাম। আমাদের হৃদয় তাঁর দিকে উন্মুখ হলো...আমাদের অভিনন্দনপত্র পড়ে তাঁকে সংবর্ধনা করলাম। 'হে প্রিয় শিক্ষক, আমাদের এই দুঃখ-দুর্ভোগের দিনে এই অশান্তি, অসংযম, ক্ষুদ্র বিবেক সত্যের অনুসন্ধানে মহাভ্রমপূর্ণ পথে চলবার সময়, সুখের সন্ধানে প্রবল মত্ততার দিনে তোমার উপস্থিতিই মানুষের বিক্ষুব্ধ বিক্ষত মনে কোমলতাপূর্ণ কল্যাণের প্রভাব নিয়ে আসে। এই বালকানের পথ দিয়ে তুমি যখন যাবে তোমার স্পর্শে এই বহুজাতিবিশিষ্ট দেশে মানুষের চিত্ত আরো আলোকিত হবে আরো সৎ হবে, আরো প্রেমে পূর্ণ হবে। তাতে তাদের মঙ্গল হবে, মঙ্গল হবে মানবজাতির, আমাদের মধ্যে তোমার অল্পক্ষণের উপস্থিতি এদেশের মানুষের মনে ঊর্ধ্বমুখী ভাব জাগ্রত করবে, দুঃখদহন সহ্য করার শক্তি দেবে।

'স্বাগতম্ হে গুরু, হে পূর্বজগতের জ্ঞানী, হে প্রেমপ্রকাশের অগ্রদূত, তোমাকে স্বাগতম্—হে বিশ্বআত্মার প্রতিচ্ছায়া (reflection of the world soul), ঊর্ধ্ব হিমালয়ের ও ভারত উপত্যকার স্বচ্ছ বাতাস আমাদের দেশের উপর প্রবাহিত হও। তোমাকে স্বাগতম্।' ঠাকুর ধীরে ধীরে মৃদু স্বরে কথা বললেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পরস্পরের পরিচয় ঘটানো, মানুষের মনুষ্যত্ব উদ্বোধিত করা, বর্তমান সভ্যতার চেয়ে মহত্তর সভ্যতাকে মানুষের কাছে এগিয়ে আনা—এই তাঁর ভ্রমণের কারণ। তাঁর মুখের কথা ও সাধনা হতে লিখিত বক্তব্যের মর্মকথা একই কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর সাধনা বইয়ের বক্তব্যকে আরো পরিস্ফুট করে তোলে। কবি পরিশ্রান্ত,

কিন্তু সে কথা তাঁর ভাবে প্রকাশ পায় না। তিনি ছবি তুলতে বাধা দেন না, বই ও ছবিতে অনায়াসে অটোগ্রাফ সই করেন, এদেশে তাঁর এই প্রীতিপূর্ণ স্বাগত সংবর্ধনায় বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের মানুষের অন্তরে এখনো আধ্যাত্মিকতার মূল্য আছে। তাঁর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল কিন্তু কর্মকর্তারা ভুলে গিয়েছিলেন মাংসাহারের জন্য প্রাণিহত্যার নিয়ম নেই—(সেজন্য কবি মাংস খাননি তা অবশ্য নয়) তিনি কিছু মিষ্টান্ন নিলেন, মদ্য স্পর্শ করলেন না...ভোজের সময় ছাত্ররা সম্মিলিত সংগীত গাইছিল, তিনি খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। আমি 'সাধনা' বইখানি নিয়ে তার উপর কিছু লিখে দিতে বললাম, তিনি লিখলেন...কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই...।

"ঠাকুর চলে গেছেন কিন্তু তাঁর মূর্তি আমাদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত, আমাদের হৃদয় এখন সাধারণ ভাবের চেয়ে উচ্চতর ভাবনায় পূর্ণ—প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্য এসেছিল আমাদের অতিথি হয়ে, মনে করিয়ে দিয়ে যেতে যে আমরাও মানুষ।"

ইষ্টক বা ইষ্ট নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার ২৮শে নভেম্বর সংখ্যায় লিখছে :

"রবীন্দ্রনাথ সব বয়সের সব শ্রেণীর মানুষকে মোহিত করেছেন—এই তাঁর বিপুল ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রমাণ। এই বিজ্ঞ বাঙালী কবি আমাদের এই সহজ সত্য শেখালেন যে, মানুষে মানুষে মৈত্রীই আমাদের পথ—সরলতাই সেই চাবি যা দিয়ে জগতের ঐক্যসাধনের উপায় পাওয়া যায়...

"আমি তাঁকে দেখলাম...দেখলাম তাঁর করুণাবিকীর্ণ হাসি, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সে মুখ যেন কোনো পুরোনো মন্দিরের বিগ্রহের মত খোদিত দেবমূর্তি। তিনি ধর্মবান, আত্মস্থ। তাঁর সুদীর্ঘ পরিচ্ছদ তাঁর সঙ্গে মহিমার সংযোগ করে। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রয়াসে তিনি দরজায় দরজায় প্রেম ঐক্য ও মানবতার বাণী নিয়ে ফিরছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ সম্বন্ধে তাঁর কী মনে হয় (সে সময়ে পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা ফ্যাসিবাদের হুংকারের সঙ্গে ইয়োরোপে জেগে উঠেছিল)। তিনি বললেন, তাঁর মনে হচ্ছে ইয়োরোপ যেন একটা প্রকাণ্ড উন্মাদালয় যেখানে বিকৃতমস্তিষ্কেরা তাদের সন্তানের কবরের উপর নৃত্য করছে।...সোফিয়া স্টেশনে যখন প্রচুর জনতার সমাবেশ দেখলাম তখন পুলকিত চিত্তে মনে হল মানবধর্ম ফিরে এসেছে—".

এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতির নিচে লেখা

ছিল : "এঁকে দেখলে মনে হয় ইনি একজন তেমনি মানুষ যাঁর ঈশ্বরদর্শন ঘটেছে।"

ন্যাশনাল থিয়েটার গৃহে ২৮শে নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভাষণের কিছুটা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি। তারপর বর্তমান শতাব্দী-উৎসবের সঙ্গে তৎকালীন উৎসবের তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা যাবে।

"আপনাদের সামনে আজ আমি দাঁড়িয়েছি বাক্যহারা, মাতৃভাষার আশ্রয় আমার নেই। আমি আপনাদের সঙ্গে আজ যে ভাষায় কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, তা আপনাদেরও নয়, আমারও নয়। আপনাদের মুখে যে আনন্দ-অভিনন্দন দেখতে পাচ্ছি তাতে অভিভূতচিত্তে ভাবছি যদি ভাষার বদলে আমার তেমনি একটি সুরের যন্ত্র থাকত যাতে সুরধ্বনি তুলে মনের সঙ্গে মনে এক অব্যবহিত যোগ করতে পারতাম।...কিছুদিন পূর্বে যখন চীন দেশে গিয়েছিলাম তখন আমার জন্মদিনে তারা নিমন্ত্রণ করেছিল, বিদেশে এই নিমন্ত্রণের সম্মান পেয়ে মনে হয়েছিল যেন আমি স্বদেশেই আছি... তাদের মত পোশাক আমাকে পরাল, আমি চীনা পরিচ্ছদ পরে যেন তাদেরই একজন হয়ে গেলাম (পরিনু চীনের বাস)। আজ এদেশে এসেও মনে হচ্ছে আমি তোমাদেরই একজন। শিশু যখন মায়ের কোলে জন্মায় তখনই তার জন্ম সম্পূর্ণ হয় না, মানুষের মনে তার কর্ম ও স্বীকৃতির দ্বারা তার আবার নূতন জন্ম হয় (দ্বিজত্ব 'শান্তিনিকেতনে' জন্মদিন প্রবন্ধ তুলনীয়)। আজ আমার যেন আর এক জন্মদিন, তোমাদের হৃদয়ে আমার আর-একটি আবাস...আমার কাজ সমস্ত বিশ্বের মানুষের মধ্যে মিলন ঘটানো, একাজ আমার কবিতা, ভাষণ ও আমার স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা আমি করে চলেছি.. তবে তোমাদের ও আমার মধ্যে স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনের যথার্থ মাধ্যম আমার কবিতা. যদিও আমি দূরদেশের ও ভিন্নজাতির মানুষ এবং হয়ত আমার কবিতায় সেই দূরদেশের মানুষদের জীবনের প্রতিচ্ছবি তোমরা দেখতে পাবে, আনন্দ পাবে। যখন দক্ষিণ আমেরিকায গিয়েছিলাম, সেখানে হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার স্বদেশী অতি প্রিয় ফুল (জুঁই) ফুটে রয়েছে। প্রবাসে সেই পরিচিত ফুল যেন আমার হৃদয়ে স্বদেশ ও বিদেশের মধ্যে একটি সংযোগ করে দিল...কবিতাও ঐ ফুলের মত সহজ, ওর মধ্যেই সেই রহস্য গোপন আছে যাতে ভিন্ন দেশের বহু সাগরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে মিলনের সৃষ্টি করতে পারে, হৃদয়ের দরজা খোলাতে পারে। আমি প্রচারক নই...বক্তা নই, দার্শনিক নই, আমি কবি মাত্র...এই কবিতার ভিতর দিয়েই আমি বিশ্বের অনুভূতি, সার্বভৌম চিন্তা জাগ্রত করে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন ঘটাতে চাই।"

১৯২৬ সালের অভিনন্দন ও তার প্রত্যুত্তরের সঙ্গে বর্তমান শতাব্দী-

উৎসবে ঐ দেশের বক্তব্য ও চিন্তার তুলনা করলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও রচনার তখন যে অনুভব ও অর্থ ইয়োরোপে প্রচলিত হয়েছিল তার সঙ্গে পার্থক্য ঘটেছে আজকের রবীন্দ্র-গুণগ্রাহীর। সোফিয়াতে শতাব্দী-উৎসবে পঠিত কবির একটি সুদীর্ঘ জীবনী থেকে একটি ছোট্ট অংশ অনুবাদ করছি : "তিনি ইয়োরোপ আমেরিকার ও এশিয়ার বহু দেশে বক্তৃতা দিয়েছেন। ইয়োরোপে বণিক সভ্যতার মধ্যে প্রাণের অভাব, আত্মার মৃত্যুর কথা তিনি বলেছেন। আমেরিকায় তিনি cult of machine-এর প্রতিবাদ করেছেন, জাপানে cult of nationalismকে ধিক্কার দিয়েছেন, যে নেশন-তন্ত্রের প্রভাবে চীনের উপর সাম্রাজ্যবাদী হুমকি চলেছে তার কথা বলেছেন"...এমনি করে বর্তমান বুলগার লেখক বহু দেশের উল্লেখ করে সেই সেই দেশের সমস্যায় রবীন্দ্রনাথের বাণীর অমোঘতার বিচার করেছেন যাতে ফুটে উঠেছে বহুকাল পূর্বে উচ্চারিত ক্রান্তদর্শী কবিব প্রজ্ঞা। লেখক স্তোয়নেভ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছ-সাতখানি বই লিখেছেন। শতাব্দী-উৎসবে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : "সেই পরীর দেশ যেখানে হীরামুক্তা ছড়ানো, যেখানে গভীর অরণ্য ছায়াময়, যেখানে মহানদী খরস্রোতা, যেখানে কত গগনবিলম্বী ঐতিহাসিক মন্দির-চূড়া, যেখানে সোনালী লোমের বাঘ, সেই দেশে কবি মনীষী মানবপ্রেমিক ও ভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন। বহুদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে ভারতবর্ষ এক অজ্ঞাত রহস্যময় দুঃসাহসিক গল্পের দেশ ছিল।—সত্য ভারতকে জানতে আমাদের অনেক দেরি হয়েছে, অনেক দেরি হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বজ্রনির্ঘোষ শুনতে। সে দেশ যে বৃহৎ শক্তিমান মানুষের দেশ—যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্যত শক্তি, সে কথাও জানতে আমাদের দেরি হয়েছিল। ভারতবর্ষের সত্য ছবি যাঁরা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, প্রকাশ করেছেন তার ঐশ্বর্য, তার ইতিহাসের সৌন্দর্য, তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, এসব কথা যাঁদের কাছে আমরা জেনেছি কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। যদিও তিনি ধনী ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তবু ধন বিদ্যা সম্মান কিছুই তাঁকে মূঢ় অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি। তাঁর আশ্চর্য কবিতাগুলিতে তৃণাঙ্কুর থেকে দূর আকাশের জ্যোতিষ্ক পর্যন্ত সকলের প্রতি এক সর্বব্যাপী করুণা অনুভব করা যায়। সে সূক্ষ্ম মমত্ববোধের সৌন্দর্য যেন ভাবতীয় মিনিয়েচার ছবির উৎকর্ষের মত। আবার আর-একদিকে তাঁর কবিতার মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি ভারতের গভীর প্রজ্ঞা প্রকাশিত..সেই সঙ্গে অত্যাশ্চর্য মানবতা, মানুষের প্রতি সদ্য-জাগ্রত ভালবাসা, সুন্দর মুক্ত স্বাধীন ও পূর্ণ মানুষের

উদ্বোধন তাঁর কবিতায়। শেষ জীবনে বোলপুর গ্রামে গ্রামবাসীদের সান্নিধ্যে বাস করলেন, সেই দরিদ্র নির্যাতিত বাঙালী চাষীদের জীবন তিনি বহু গল্পে উপন্যাসে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনায় স্বদেশের সমস্ত সমস্যা, পরশাসনের দুঃখ, রায়তের অবস্থা, জাতিভেদের অন্যায় সমস্তই বিধৃত হয়েছে।”

১৯২৬ সালের অভিনন্দনের সঙ্গে বর্তমান আলোচনাটি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, পূর্বে তাঁকে যে প্রাচ্য-মিস্টিক, ধর্মগুরু, ইত্যাদি বিশেষণে বর্ণনা করবার প্রয়াস ছিল বর্তমানে তা নেই—তাঁর মানবপ্রেমের কথা, মানুষের জন্য তিনি যা করেছেন, যা ভেবেছেন তারই ভিতর দিয়ে তাঁর যথার্থ পরিচয় খুঁজে পাচ্ছে বর্তমানের ইয়োরোপ। সোফিয়াতে শতবার্ষিকী উৎসবের নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে কবির পরিণত জীবনের এই সার্থক আত্মবিশ্লেষণটি উদ্ধৃত ছিল : “আমি এসেচি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও আছি—” জার্মানিতে একজন প্রৌঢ় আমাকে বললেন ১৯২২ সালের কথা—রবীন্দ্রনাথ তখন কাউন্ট কাইসারলিং-এর অতিথি, তখন ডিউক অফ হেসের বাগানে যে সভা বসত সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতেন। তখন তাঁর বয়স আঠার বছর। সপ্তাহব্যাপী সে সভায় বহু লোক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে আসত ও নানা প্রশ্ন করত। কিন্তু কাউন্ট কাইসারলিং-এর বর্ণিত রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তাঁর যুবক চিত্ত সন্তুষ্ট হত না। মিস্টিক কবি, প্রাচ্য ধর্মগুরু ইত্যাদি বিশেষণের চেয়ে রবীন্দ্রকাব্যে মানুষের প্রতি ভালবাসাই সহজ সরল রূপে তাঁর কাছে প্রকাশ পাচ্ছিল। জার্মান ভদ্রলোক বললেন, অনেকের সঙ্গেই আমার তর্ক হচ্ছিল এ নিয়ে—যাঁর কাব্যে এমন মানবতার প্রকাশ তাঁকে মিস্টিক বলা ভুল। দুর্জ্ঞেয় তিনি নন, সেজন্য ভারতে স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর কী মত সে কথা আমি সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসা করব শুনে সেদিন অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ কবি দার্শনিক ও ভক্ত, আধ্যাত্মিকতাই তাঁর উপজীব্য, পলিটিক্সের চিন্তা তাঁর নেই। কিন্তু অবশেষে যখন কাউন্ট কাইসারলিং-এর কাছ থেকে দু মিনিটের সময় পেলাম তখন দুরু দুরু বুকে আমি এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, ‘ভারতবর্ষ কি স্বাধীন হবে?’ ‘নিশ্চয়ই হবে।’ ‘সে বিষয়ে অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন হবে, না সে একলাই এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে?’ ‘আমার তো মনে হয়, অন্যের সাহায্য ছাড়াই তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।’ আমি ভেবেছিলাম এ সব রাজনৈতিক প্রশ্নে তিনি বিরক্ত হবেন কিন্তু তিনি সুধা-

বিকীর্ণ মৃদু হাস্য করে যৌবনগর্বিত আঠার বছরের ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—'বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোকেরা যখন সত্যের অনুসন্ধান করে তখন তা সুন্দর কিন্তু বালকের পক্ষে তা আরো সুন্দর।' প্রথম যুদ্ধের পরে ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব রণক্লান্ত পরাভূত শোকাচ্ছন্ন মানুষের মনে শান্তির সুধা বর্ষণ করেছিল কিন্তু বর্তমানের ইয়োরোপ মনে করে সে অনুভূতি যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষিত হয়নি। মিস্টিক, প্রাচ্য জ্ঞানী, wise man of the east প্রভৃতি মোহময় বিশেষণের দ্বারা আবৃত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাণীতে রহস্যময় অলৌকিকতা কিছু নেই—তিনি এই পৃথিবীর সুখদুঃখকাতর মানুষের বন্ধু। তিনি দুর্বলের বল জোগান, অত্যাচারীর বুকে ঘৃণার শাণিত বান নিক্ষেপ করেন, দুঃখীর বন্ধু, অসহায়ের সহায় রূপে উচ্চারিত তাঁর বাণী সকল দেশের সকল মানুষের সান্ত্বনা। স্বদেশে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনে তাঁর সারা জীবনের বহুধা কর্মযোগে যে মানবপ্রেম প্রবাহিত, পৃথিবীর দূর দূরান্তে সকল মানুষের জন্য নিবেদিত সেই প্রেমই তাঁর কাব্যের প্রেরণা। দার্শনিকের উদারতা, বৈজ্ঞানিকের যুক্তি, পণ্ডিতের প্রজ্ঞা ও কবির সহৃদয় প্রেম নিয়ে তিনি সকল মানুষের দুঃখ দুর্দশা অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিরোধ করে চলেছেন দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি দিন। সেই কবিকে মিস্টিক আখ্যাদ্বারা দুর্বোধ্য করে তোলা ভ্রম মাত্র।

রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথের এই পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টায় যে অনুশীলন চলেছে তার ব্যাপকতা দূর থেকে অনুমান করা শক্ত। এটি শতাব্দী উৎসবের ডঙ্কা বাজিয়ে ভারতবর্ষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা মনে করা, শুধু একটি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়। বহু ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এই কার্যে তাঁদের সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, কষ্ট করে বাংলা ভাষা শিখেছেন এবং রবীন্দ্রচিন্তার গভীরতার মধ্যে প্রতিদিনের সান্ত্বনার পথ খুঁজে ফিরছেন। এবারে জুনের প্রথম সপ্তাহে যখন মস্কোর লেখক সংঘের আমন্ত্রণে গিয়ে পৌঁছলাম তখনও শতাব্দী উৎসবের শেষ পর্যায় চলেছে। লেখক সংঘের ছোট্ট একটি ঘরে বসে সেই উৎসবের বিবরণ শুনতে লাগলাম—এশিয়াটিক রাশিয়ার নানা দূরতম প্রান্তে পার্বত্য গ্রামেও হয়েছে উৎসব—এমন সব ভাষায় নৌকাডুবি অনূদিত হয়েছে যেগুলির নামও ভাষাবিদ ছাড়া কেউ শোনেননি এবং সে পার্বত্য ভাষা অল্পদিন পূর্বে পর্যন্ত ছাপার অক্ষরের গর্ব করতে পারত না। রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানের উৎসবের বিবরণগুলিও খবরের কাগজের কাটিং আমায় উপহার দিলে—সেটি একটি ডিক্সনারির মত ভারী। লেনিনগ্রাদে 'তাসের দেশ' বাংলা ভাষায় অভিনীত হয়েছে—রুশ ভাষায় অনূদিত গানে রবীন্দ্রসংগীতের অক্ষত সুর সংযুক্ত হয়ে অপরূপ সুরমাধুর্য তরঙ্গিত করেছে—

কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হলাম যখন রবীন্দ্ররচনার একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী ও তাঁর উপরে রচিত পুস্তকের তালিকাটি আমার হাতে এল। ক্ষণিক হুজুগে পড়ে উৎসবের আয়োজনে নৃত্যগীতাদি করা কিছু বিস্ময়কর নয়, কিন্তু দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করলে তবে গ্রন্থপঞ্জী তৈরি হয়। বাংলা ছাড়া আর কোনো ভারতীয় ভাষায় ও বাঙালীকৃত ছাড়া ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্ররচনার এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী হয়নি। দিনের পর দিন এই অক্লান্ত শ্রমদান যে রাজনৈতিক চালপ্রসূত একথা অশ্রদ্ধেয়। সেই সময়ে মস্কোতে ছোটদের থিয়েটারে রুশ নাট্যকারের নির্দেশে রামায়ণ অভিনয় হচ্ছিল। ঐ অভিনয় ছোট বড় সকলেরই মনোহরণ করেছিল, দীর্ঘকাল ধরে অভিনয় চলেছে, মস্কোর শিল্পপ্রিয় সকল লোকেরই একবার দেখা হয়ে গেছে। একটি ভদ্রমহিলা যিনি রবীন্দ্ররচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা করছেন, একদিন তাঁর ছোট তিনঘরের ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি, খাবার টেবিল ঘিরে বসেছে পরিবারের সবাই—দাদা বৌদি—অদূরে শুভ্রকেশা শ্বশ্রূমাতা তদারক করছেন। শুনলাম তিনিই সব রান্না করেছেন। কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলাম—'রামায়ণ দেখেছেন?'* ভদ্রমহিলা ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে শুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'না ভাই সময় হয়নি'—ঘরশুদ্ধ লোক হেসে উঠল, দাদা বললেন, "সময় কী করে হবে? এঁর সমস্ত সময়ই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিকার করে বসে আছেন।" দূর দেশের সেই সাততলা এক বিরাট বাড়ির ছোট ফ্ল্যাটটিতে বসে মাতৃভাষার এক বিজয়িনী মূর্তি মনকে অভিভূত করে দিলে।

ঐ সব দেশে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বড় জনপ্রিয়, প্রায়ই আবৃত্তি হয়—'কাগজের নৌকা'—

"ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ নৌকাখানি
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম
লিখি আমাদের বাড়ি কোন গ্রাম।
বড় বড় করে মোটা অক্ষরে
যতনে লাইন টানি
যদি সে নৌকা আর কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে

---

* মস্কোতে তখন মাদাম গুইসভা কর্তৃক পরিচালিত রামায়ণ নাটক অভিনীত হচ্ছিল।

আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ নৌকাখানি।

গঙ্গাতীরে একদা যে কাগজের নৌকা ভাসিয়েছিলেন তা সপ্তসাগর পার হয়ে চলেছে দানিয়ুব-রাইন ধরে, পাল তুলেছে ভল্‌গায়—বহন করে নিয়ে চলেছে সগৌরবে সেই বিজয়িনীকে, আ মরি বাংলা ভাষা...

সমাপ্তি

১৯৩০ সালের পর কবি আর একবার ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছিলেন—পারস্যে—সেই তাঁর শেষ পরিক্রমা। এখানে আমরা কেবল পাশ্চাত্ত্য জগতের বৃত্তান্তটুকুই সংগ্রহ করেছি। ভারতবর্ষেরও নানা দূরতম প্রান্তে বারে বারে নানা কর্মে গিয়েছেন—গিয়েছেন চীন জাপান যবদ্বীপ, পৃথিবীর মানুষকে দেখেছেন হৃদয়ে। সেসব কাহিনী বিবরণ সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। হলে পরে জানা যাবে শুধু কথ্য ভাষায় নয়, মানুষের মনের ভাষায় কথা বলবার কী আশ্চর্য ক্ষমতাই তাঁর ছিল।

একজন দক্ষিণ ভারতীয় কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি সুন্দর বিবরণ লিখেছিলেন—তার মধ্যে ইয়োরোপ ভ্রমণের প্রসঙ্গ কিছু আছে, তা ছাড়া কবির অতি অন্তরঙ্গ ও মনোজ্ঞ পরিচয় অল্প সময় মাত্র দেখেই ধারণা করবার অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় এই লেখায় তিনি দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে আমাদের অন্যত্র বর্ণিত ঘটনার উল্লেখও দেখা যায়—কবিপরিচয়ে এর আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য নিখুঁত। এসব কারণে প্রবন্ধটির কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করে সে সম্বন্ধে আমাদের সাধ্যমত বিচার করব।

“একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি আমাদের বলেছিলেন যে একদিন লন্ডনের ফটোগ্রাফের দোকানে রবীন্দ্রনাথের খুব বড় একটা ছবি একেবারে সামনেই টাঙানো ছিল। তিনি দোকানদারকে বললেন, “দেখছি আমাদের কবিকে আপনি খুব ভক্তি করেন”—“মশায় কবিতার আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু বড় চমৎকার মুখ মশায় এঁর, বড়ই সুন্দর মুখ!”

...মুশকিল এই যে যারা কবিকে শুধু সভামণ্ডে বা বক্তৃতাস্থলে দেখেছেন তাঁদের মনে হবে যেন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকার পাত্র হিসাবে বড় বেশী রকম নিখুঁত। জেনেভাতে একজন ছাত্র কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় সুযোগ না পেয়ে ভারি রেগে বলেছিল—‘হবে কী করে—ড্রেসিং টেবিলেই তো দুঘণ্টা কেটে যায় নিশ্চয়।’ যদিও একথা একেবারেই সত্য নয় তবু তাঁর তুষারধবল শ্মশ্রুতে কমলারঙের পরিচ্ছদে ঐ রকমই ধারণা জন্মায়।

...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন যাতায়াত করেন তখন ব্যাপারটা হয় রাজকীয়। যদি একটা ‘কুপে’ পাওয়া যায় তবে দুখান ফার্স্টক্লাস টিকিট কিনলেই চলে, তা নইলে ছয়টিই কিনতে হয়। সমুদ্রযাত্রার সময় জাহাজের শ্রেষ্ঠ ঘরে তিনি থাকেন, আর বিদেশে গেলে সে দেশের সবচেয়ে অভিজাত হোটেলে। বার্লিনের কাইসারহোফ হোটেল—যেখানে বড় বড় নামী

লোকদেরই যাতায়াত তারাও কবির নানা রকম অর্ডারে স্তম্ভিত হয়ে যেত। কিন্তু বাড়িতে, শান্তিনিকেতনে কবি মাটির ঘরে খড়ের চালের নিচে পরমানন্দে আপন কাজ করেন। ঘরের মধ্যে যা আসবাব দেখলাম তার মূল্য দশ টাকার বেশী হবে না, এমনকি ঠাকুরদের কলকাতার প্রাসাদেও তাঁর নিজের ঘরখানি তপস্বীর উপযুক্ত অনাড়ম্বরে সাজানো।

...তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তিনি এমন মধুর সহৃদয় হাসি হেসে অভ্যর্থনা করবেন, এমন খুশী হয়ে কথা বলবেন যে মনে হবে এই অতিপ্রিয় বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে তোমার আজন্ম পরিচয়।...একদা ট্রেনের কামরায় রেলের খানসামা তাঁর রুটি মাখন নিয়ে এলে কবি তাঁর সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করলেন : "এর দাম কত পড়বে?" "আট আনা।" "বল কী? তাহলে রুটি মাখন বাড়ি থেকে নিয়ে এলেই তো হত।" এই বিপরীত আচরণের অর্থ বোঝা যায় না—বিদেশে কেন তাঁর রাজকীয় জাঁকজমক? সে কি অভিজাতবংশের নিদর্শন? না ভারতের সংস্কৃতির দূতের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষার জন্য রাজকীয় সাজ? না কি তাঁর অভিনয়দক্ষ প্রতিভা শুধু কবিপ্রতিভার কাছেই হার মানে নইলে যখনই জনতার সামনে আসেন তখনই নিজের উপযুক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এবং কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর কাছে এলে তবেই তাঁর সরলতা, বাহুল্যশূন্যতা বোঝা যায়, তা না হলে দূরত্ব সৃষ্টি করে রাখেন? এই অনাড়ম্বর সরলতা তাঁর চেষ্টাকৃত আয়াসলব্ধ নয়, শিশুর সারল্যের মত এ তাঁব স্বভাবের অঙ্গ।"...

এখানে বিদেশ ভ্রমণের বাজকীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের দু-একটি কথা মনে আসে। কবির সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা যে কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছেন সকলেই জানেন। শান্তিনিকেতনের যে ঘরগুলিতে তাঁর জীবনের অধিকাংশ দিন কেটেছে সে উত্তরায়ণের উদয়ন প্রাসাদ নয়। তার অধিকাংশই কুটিরমাত্র। পর্ণকুটিরে বিনা ইলেক্ট্রিক পাখায় দারুণ গ্রীষ্মে পরমানন্দে তাঁর গানের উৎস হয়েছে গগনমুখী। তাঁর মুখের কথাই ছিল—মাটির ঘরে থাকায় কষ্ট কী, ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশের বেশি লোক মাটির ঘরেই তো বাস করে। কিন্তু স্বদেশেও ট্রেনে তিনি একাকী ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন। কবি মানুষের সঙ্গ পছন্দ করতেন, কিন্তু সর্বক্ষণ ঘনিষ্ঠ শারীরিক নৈকট্য তাঁর পীড়াদায়ক হত। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব রুচির বিশেষত্ব ছিল।

আমরা শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবীর কাছে শুনেছি, এদিকে, কবি যেবার প্রথম ইংল্যান্ড যান অর্থাৎ ১৯১২ সালে, তখন সম্পূর্ণ নিজের ব্যয়ে থাকতে হয়েছিল। খুব সাধারণভাবেই থাকতেন—কখনো 'পাবলিক বাথ'-এও স্নান করতে হয়েছে। এসবে তিনি অভ্যস্ত নন—কষ্ট অবশ্যই হয়ে থাকবে।

শারীরিক আরামের বিলাসপ্রিয়তা এক কথা, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য অন্য জিনিস। নিজের ঘরের ছোট জলের বালতিটিতে স্নানের নিভৃত আরাম আছে কিন্তু খুব সুসজ্জিত সাধারণের স্থানে তা নেই। বিদেশেও সম্ভব হলে নিজের ঘরে নিভৃতেই আহার করতে ভালবাসতেন। ভোজসভা ইত্যাদি সামাজিক উৎপাত যথাসাধ্য এড়িয়ে যেতেন। নানা খবরে বিশেষ সুধীন্দ্র-বাবুর লেখায় তা দেখেছি। ইংল্যন্ডে সাউথ কেনসিংটনে হোটেল রেজিনা (?) নামে একটি ছোট হোটেল ছিল। শ্রীযুক্ত মজুমদার নামে এক দরিদ্র ভদ্রলোক কবির সাহায্যে ঐ ব্যবসায়ে কৃতকার্য হয়েছিলেন। সে হোটেলে সর্বদাই তিনি ঘরোয়াভাবে থাকতে পারতেন—আমরা এরকম শুনেছি। দক্ষিণ ভারতীয় লেখক শ্রীযুক্ত রমন আরো লিখছেন : "দেশে বিদেশে যে শ্রদ্ধা, সমস্ত পৃথিবীর কাছে যে প্রভূত সম্মান তিনি পেয়েছেন তাতে তাঁর বিস্ময় কোনো দিন ফুরাতে চাইত না। তিনি জানেন না কেন তাঁর প্রতি এ ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। শিশুর মত সরল আনন্দ করে বলছিলেন, "কোপেনহেগেনে যখন ট্রেন ঢুকল—দেখি প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। আমি ভেবেছি নিশ্চয় মস্ত কেউ আসবেন, তাঁরই জন্য এ জনতা অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু জান ব্যাপারটা কী? তারা আমারই জন্য দাঁড়িয়েছিল!" একটি ঘটনা তাঁকে অভিভূত করেছিল, একজন সৈন্য বহুদূর থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল : "দেখুন আমার ছাড়া পেতে কিছু অসুবিধা হয়নি—আপনার সঙ্গে দেখা করব বলতেই ছুটি পেলাম। আমার যে আপনার কাছে আসতেই হত—আপনাকে একবার জানাতেই হবে আমার জীবনে আপনার কবিতা কতটা সাহায্য করেছে।" (বলে আসি, তোমার বাঁশি আমার প্রাণে বেজেছে।)

কবি বললেন, সেদিন এ কথায় তিনি তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন! আরও একটি ছাত্রের কথা বলছিলেন, দশ মাইল হেঁটে একটা ছোট স্টেশনের ধারে দু মিনিটের জন্য সে তাঁকে প্রণাম করতে এসেছিল, ততক্ষণে তার হাতের জুঁইফুলের মালা শুকিয়ে বিবর্ণ।

তাঁর কাব্যের বিষয়, রচনার বিষয় তিনি আলোচনাই করেন না। নিজের কথা কম বলাই তাঁর অভ্যাস। আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "তা হবে, প্রেরণা আসে নিশ্চয়ই।" কিন্তু শান্তিনিকেতনে শান্ত সৌন্দর্যের আদর্শধামেই যে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্ম, তা নয়। অনেক অপূর্ব সুন্দর কবিতা আছে সাউথ আমেরিকার হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় লেখা' কখনো বা একটুকরা কাগজে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে—ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দ আর ফেরিওলার উৎকট চিৎকারের মধ্যে বসে অপূর্ব গীতধারা রূপ নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ হয় একদা কবি তাঁর প্রসিদ্ধ গান, "সেদিন

দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা" গানটির উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঐ গান কোথায় ও কার সঙ্গসুখ অনুভব করতে করতে লিখেছিলেন আমরা অনুমান করতে পারি কিনা। সে সময় ঐ গানটি সকলের মুখে মুখে প্রচলিত হয়েছিল। আমরা স্থান কাল ও সঙ্গিনীর পরিচয় সম্বন্ধে অনুমান করতে সম্পূর্ণ অপারগ হলে তিনি জানিয়েছিলেন, স্থান ছিল ট্রেনের কামরা, এবং কোনো সঙ্গিনীর বেণীবন্ধনের চিহ্নটুকুও দেখা যায়নি। কোনো লোল-অঞ্চলার অঞ্চলের সবটাই ছিল অদৃশ্য। সঙ্গে ছিলেন প্যান্ট-পরিহিত আর্যনায়কম্‌!

শ্রীযুক্ত রমন লিখছেন, "আমি তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম—কী করে লেখার প্রেরণা আসে সেই বিশেষ মুহূর্ত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করে নেবার জন্য।" কবি মজা করে উত্তর দিলেন, "আমার লেখার ইচ্ছা বেড়ে ওঠে যখন তোমার মত কেউ এসে জ্বালাতন শুরু করে!" একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—আমি এতদিন ধরে লিখছি আজ আমার কলম বাধ্য ভৃত্যের মত ব্যবহার করে—তার পর সহাস্যে, "কিন্তু আমার ট্রেড সিক্রেট ফাঁকি দিয়ে জেনে নিতে চাও"? বলেই তিনি হেসে উঠলেন। রূপার ঝলকের মত আনন্দে উজ্জ্বল আলো-উদ্ভাসিত সে হাসি—ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সন্দর্শনে এই হাসির সম্মোহনই বিস্ময়াবহ।

"একজন প্রফেসর আমাকে বলেছেন লিরিক কবিদের হাস্যরস থাকা উচিত নয়। তিনি আবার সাবধান করে দিয়েছেন যেন ও পথে না যাই। কিন্তু মনে হয় তাঁকে আমি নিরাশ করবই।" একদা তাঁর সেক্রেটারি তাঁকে ক্রমাগত প্রশংসাপত্র লেখা থেকে বিরত কবতে চেয়েছিল—"এত সহজে সকলকেই প্রশংসাপত্র লিখে ফেলবেন না তাহলে সংসারে আর কোনো পদার্থই বাকি থাকবে না যার আপনি প্রশংসা করে ফেলেননি।"

"অসম্ভব। তা হতেই পারে না, একটি জিনিসের প্রশংসাপত্র আমি কখনো লিখতে পারবই না—ক্ষুর।"

এই অবিরাম কৌতুকধারা এমনই সহজ হাস্যে সর্বদা প্রবাহিত যে যাঁরা তাঁর কাছে থাকেন তাঁরা এর একটু ব্যতিক্রম দেখলে ভাবেন নিশ্চয় অঘটন কিছু ঘটেছে।...তাঁর আর একটি বিস্ময়কর কাজ বই পড়া...কী বই না তিনি পড়েন, জ্যোতিষ, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভ্রমণবৃত্তান্ত, সুইডেন-নিবাসী Sven Hedin-এর ভূ-আবিষ্কার বৃত্তান্ত তাঁর ভারি প্রিয়, সে সম্বন্ধে যা-কিছু প্রকাশিত হয়েছে পড়ে ফেলেছেন! (সেই সুখে পড়ি গ্রন্থ, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে যাহে, অক্ষয় উৎসাহে।) আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ঢুকলাম তাঁর হাতে ছিল অ্যাস্ট্রনমির বই—"কবির দৃষ্টিতে তারার যে রূপ সে কি অ্যাস্ট্রনমারের চেয়ে একেবারেই পৃথক নয়?"

"হতে পারে, তারা উভয়ে পৃথক ভাবে দেখে কিন্তু তাঁদের দর্শন পরস্পরের পরিপূরক। আমি যখন তারার কাহিনী পড়ি, আমার মন জগতের সীমা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আমাকে বিশ্বের গভীরতার দিকে নিয়ে চলে..."

শ্রীরমন তারপর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন প্রভৃতি কবির বহুবিধ বিচিত্র কর্মোদ্যমের বিশদ আলোচনা করে বলছেন—"তাঁর গান সকলের কণ্ঠে, কিন্তু তিনি তার চেয়ে বড়, তাঁর কাব্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ যা কিছু অমর তার চেয়েও তিনি অধিক। তিনি বাস্তব জ্ঞানী, দ্রষ্টা, কল্পনাশক্তিমান, ধৈর্যশীল কঠিন শ্রমে রত শ্রেষ্ঠ শ্রমিক—"

আমাদেরও অভিজ্ঞতা এই লেখকের অনুমোদন করে। তিনি স্বল্প সময়ে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে যা বুঝেছেন আমাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাও তার অনুবর্তী। "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

ইয়োরোপের বৃত্তান্ত শেষ হয়ে এল। তিনি এসেছিলেন মনে করিয়ে দিতে 'নূতন যুগের নূতন রাজা' এসেছেন—"এতদিন আমরা আমাদের জাতির বিশেষ দেবতার (tribal idol) পূজা করেছি—আমরা বুঝিনি যে জাতির অস্তিত্ব আর নেই, তার মন্দির চূর্ণ হয়েছে।...এখন আর নরবলি দিয়ে তার উপাসনা করে লাভ নেই। মানুষের দেবতা এসেছেন সেই ভাঙা মন্দিরের দরজায়, এখনো তিনি বেদীতে প্রতিষ্ঠা পাননি। আমি সমগ্র জনসাধারণকে বলছি তাঁর কাছে ত্যাগের অর্ঘ্য আনো।...মানুষের বন্ধু হও, শাসকের ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরো না, এই নূতন জগতে শাসকের স্থান নেই।...

"আমি তোমাদের আবার বলছি আমরা যারা পূর্ব ও পশ্চিমের ভাববাদী তারা, যে প্রাণ সৃষ্টি করে তারই উপর বিশ্বাস রাখব, যে যন্ত্র তৈরি করে তার উপর নয়—(life that creates and not on machine that constructs)—সেই শক্তি যে তার সমস্ত বল গোপন করে সৌন্দর্যে ফুটে ওঠে তারই উপর রাখব শ্রদ্ধা, যে মারণাস্ত্র তৈরি করে অপকীর্তিতে মজা পায় তার উপর নয়।...বিজ্ঞান মহৎ, যখন তা পাপ ধ্বংস করে, যখন পাপের সঙ্গে মিতালি করে, তখন নয়।

"—আমি আবার বলব যে পাশ্চাত্ত্য জগতে ব্যক্তিবিশেষের উপর আমার অসীম আস্থা—আমি কোনোমতেই মানুষের উপর বিশ্বাস হারাতে পারি না।...তাঁরাও স্বপ্ন দেখেন, ভালোবাসেন এবং বিশ্বের রক্তমোক্ষণ করে দানবপূজার জন্য যে সংঘবদ্ধ চেষ্টা চলেছে তাতে লজ্জা পান, গভীর বেদনা অনুভব করেন। তাঁরা তাঁদের মনের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির উপর বিশ্বাস রাখেন...ঘোর অবিশ্বাসের ঝঞ্ঝার মধ্যে যা গোপনে পূর্ণতার মূর্তি গড়ে তুলতে পারে। তাঁদের ত্যাগের দীপ জ্বলবে—মহা ভবিষ্যতের পথের উপর ঝঞ্ঝার অন্ধকারের বুকে চিরস্থির—যখন বড় বড় রাষ্ট্রনেতা যারা পরজাতির

গলায় ফাঁস টানছে আর মাথারখুলির স্তূপ জড় করে বিজয়ী হয়েছে সেই যুদ্ধোন্মাদদের নাম ধুলোয় মিলিয়ে যাবে।..."১

শেষ জীবনে দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ হিংসামত্ত পৃথিবীর দানবীয় মরণযজ্ঞ তাঁর মনকে দুঃখে পূর্ণ করত। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সম্ভাবনাও তখন সুদূর। তবু বিদেশীর পদানত হৃতসর্বস্ব ভারতবর্ষের মধ্যে ভাস্বরদীপ্তি জাগিয়ে তুলে সমগ্র শিক্ষিত জগতের মনকে করতে পেরেছিলেন রবি-কেন্দ্রিক। সেই আমাদের পরম সৌভাগ্যের কাহিনীর কিছু অংশ এখানে ইতিহাসরূপে রক্ষা করা গেল। এ কয় বছরের ইতিহাস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি বৃহত্তম অধ্যায়। যে স্বাধীনতা কারু কাছ থেকে হাত পেতে নেবার নয়—যা অন্তরে উদ্বুদ্ধ করবার। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন দেশের প্রত্যেক হিতে ও অহিতে সদাজাগ্রতবুদ্ধি, উদ্যত-শক্তি নিয়ে ন্যায়দণ্ড ধরে থাকতেন। ইয়োরোপে ভ্রমণকালে দেশের প্রত্যেক বিষয়, শাসনের প্রত্যেক ত্রুটি, শাসকের প্রকৃত রূপ, জগতের সামনে খুলে ফেলেছেন বারে বারে। অমৃতসর, শোলাপুর, ঢাকার দাঙ্গা থেকে শুরু করে, নগণ্যতম রাজবন্দীর প্রতি ব্যক্তিগত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার নীতিনিবদ্ধ যুক্তি মানুষের মনে অমোঘভাবে সত্যের প্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন: "আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তাই অন্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আকর্ষণ করতে পারে। দুর্বলতা তার চারিদিকে অত্যাচারের আবহাওয়া সৃষ্টি করে—বাতাস পাতলা হলে যেমন ঝড় ওঠে।"

যখন প্রতি কর্মে প্রতি ব্যাপারে বিদেশীর পরজাতিশাসনের অনধিকার অবিচলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন তখনো মুখরোচক বাক্যে জনমনের স্রোতমুখী হবার তাঁর ইচ্ছা নেই।

"জাতীয় পতাকা উড়িয়ে বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতা কেটেই স্বাধীনতা পাবার নয়—জনসাধারণের কাজে যথার্থ আত্মোৎসর্গ করতে হবে।"

"ভারতবর্ষে বিদেশী সরকার বহুরূপী। আজ ইংরেজের বেশে এসেছে, কাল অন্য বিদেশীর বেশে আসতে পারে, তারপরের দিন এতটুকুও এর উগ্রতা না কমিয়ে স্বদেশবাসীর রূপেও আসতে পারে। যতই না কেন এই বিদেশী শাসনের দৈত্যকে মারণাস্ত্র দিয়ে তাড়না করি, এ চামড়া বদল করে বা রং বদল করে বারেবারে আমাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আমাদের নিজেদের চরিত্রে দেশ বলতে যে-সত্যকে বোঝায় তা লাভ করতে পারি তাহলে বাহিরের মায়া মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে।"২

---

১ *New Age, M.R.*, Jan., 1926.

২ *The Call of Truth*, Oct., 1921.

দেশের এই সত্যরূপ নিজের অন্তরে অত্যন্ত স্পষ্ট, কল্পনায় প্রকাশিত, জীবনে অনুভূত ছিল বলেই বিশ্বের দৃষ্টির সামনে তা উদ্ভাসিত হল। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের ধারা বয়ে, নানা সাধকের সাধনায়, বহু কর্মীর কর্মে, ধ্যানীর ধ্যানে, বিভিন্ন জাতিতে, বর্ণে, শিল্পে, বিদ্যায়, সমাজে, বিচিত্র রসের রসায়নে ভারতবর্ষ কী হয়ে উঠেছে, কী বলেছে, কী চেয়েছে, সেই স্বদেশের সত্যরূপ জানা ও সৃষ্টি করাতেই কবির সমগ্র জীবনের কর্মযোগ। বিদেশের এই ইতিহাস, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। উদ্ধত বিমুখ গর্বিত সাম্রাজ্যবাদীর সামনে নিন্দিত দরিদ্র ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের পাত্র যখন খুলেছেন তখন তাঁর দিকে চেয়ে বিশ্ববাসীর "বিস্ময়ের সীমা" থাকেনি। তাঁর বাক্যে আচরণে, আকৃতিতে, প্রজ্ঞায়, সমভাবে উদ্ঘোষিত ভারতমহিমার সামনে বলেছে : "you are the reason why India should be free"—

"আজ আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলেছি"—আমি ডায়রি লিখি না কিন্তু সোমবার ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩০ তারিখের পাশে এই কথাটি শুধু লিখে রেখেছি যাতে আমার মনে পড়ে যে মাঝে মাঝে স্বপ্নও সত্য হয়।... কবির কণ্ঠস্বর সঙ্গীত, তাঁর হাসি আশীর্বাদ—আর তাঁর সঙ্গীতে অনন্তশান্তির অনুভব।

কবি নিজের দেশের কথা যা বললেন তা আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে—"ভারতবর্ষ কঠিন দুঃখ পাচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতার দাম দিতে হয়, সে দাম বিনা নালিশে দিতে তার প্রস্তুত থাকতে হবে।"[১]

"আমি চলে এলাম—কবির প্রার্থনা উচ্চারণ করে, যেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।

"স্বাধীন হয় এ বিশ্বে তার স্ব-কার্য সাধন করতে। স্বাধীন হয় জগৎসভায় তার নিজের স্থান নিতে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতেই হবে। এ কথা আজ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব—কারণ আজ আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের সঙ্গে কথা বলেছি।"

সে প্রার্থনা আজও পূর্ণ হয়নি। বহুরূপী অধীনতা তার কুশ্রীতম মুখ উদ্ঘাটন করেছে। 'দেশের দুর্দশা লয়ে' ব্যবসায়ী বণিকবৃত্তি চলেছে লোভের বিকট গ্রাস ব্যাদান করে। সেই মৃত্যুগহ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্যের দুর্ভিক্ষে বন্দিনী ভারতবর্ষ—হে বিশ্ববন্ধু, তোমার শেষ কথায় বিশ্বাস রাখে :

"মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল

---

[১] *Will Hay Quarterly Journal,* April, 1931.

আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।”…

হে পূর্ণ মানব, হে নরোত্তম, তুমি আবার এসো—আমাদের জীবনপাত্র তোমার অস্তিত্বের সুধায় পূর্ণ করে, দুর্ভাগিনীর হাতে ধরে, তুমি “কাঁটার পথে আঁধার রাতে” আবার যাত্রা করো।